নবম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।



সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

পেনাঙের পথে



১৯১২ সালে আমি একবার মালয় উপদ্বীপে পেনাঙে গিয়েছিলুম। তখন আমি এম্ এ পড়ি। যাবার সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হ'য়ে যাই, আস্‌বার সময় ফিরি তৃতীয় শ্রেণীর বা ডেকের যাত্রী হ'য়ে। যেতে আস্‌তে দিন পনেরো ষোলো ধ'রে বাইরের জগতের একটা অংশ বেশ একটু দেখা-শোনা গিয়েছিল, বিশেষতো আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার নানা জাতের যাতায়াত সম্বন্ধে স্বল্প একটু অভিজ্ঞতা লাভ ঘ'টেছিল। এখন এক যুগ কেটে গেলেও এই ভ্রমণের সব দৃশ্য আর ঘটনা আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে।

ক'ল্‌কাতা ঈডেন-গার্ডেনের সাম্‌নের ঘাট থেকে জাহাজ ছাড়্‌ল এক শুক্রবার বেলা তিনটে আন্দাজ। ক'ল্‌কাতা থেকে কালাপানী হ'চ্ছে আনুমানিক নব্বুই মাইল নদীপথ, কিন্তু কালাপানী পঁহুছুতে জাহাজ আমাদের নিয়ে ফেল্‌লে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টার উপর—রবিবার-দিন দশটা আন্দাজ আমরা সমুদ্রে প'ড়্‌লুম। শুক্রবার যাত্রা ক'রে জাহাজ খিদিরপুরের ডকের কাছে আট্‌কে রইল সারারাত। রাত্তে কিছু কিছু মাল নিলে, আর বিস্তর ছাগল ভেড়া তুল্‌লে। জাহাজের ব্যাপার, সব একেবারে নোতুন, তার উপরে আবার নানারকমের আওয়াজ, গোলমাল। এ সবে রাত্রে ঘুম হ'ল না। তার পরদিন ভোরে জাহাজ ছেড়ে ডায়মণ্ড-হার্‌বর পেরিয়ে বিকালের দিকে সাগ-

রের কাছে এসে আবার দাঁড়াল। শুন্‌লুম সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, তাই জাহাজ আর সেদিন এগোবে না। জাহাজ লঙ্গর ফেলে দিলে, আর সমস্ত বিকাল আর রাত্রিটা সাগরের মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কাটাতে হ'ল। গঙ্গার মোহানায় বিকালে নদীর বুকে ব'সে দূরে ডাঙ্গার সবুজ গাছপালার পিছনে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে-ঢাকা আকাশে সেদিন অতি চমৎকার সূর্য্যাস্ত দেখা গেল।

এই দেড়দিন তো ভাগীরথীর মধ্যেই আট্‌কা প'ড়ে গেলুম। সময়টার সদ্ব্যবহার করা গেল আমার সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ জ'মিয়ে। নানান্ জাতের লোক, আর তর-বেতরর। ক্যাবিনের যাত্রী বেশী ছিল না। যে কয়জন যাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালী হিঁদু আমি একাই ছিলুম। আর জাহাজের ডাক্তারটী ছিলেন একজন বাঙালী ব্রাহ্মণসন্তান।

প্রথমেই আলাপ জমানো গেল আমার ক্যাবিনের সহযাত্রী একটী বিহারী মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে। ইনি যাচ্ছিলেন জাপানে, সাবান না কি তৈরী করা শিখ্‌তে। বেশ সদালাপী প্রিয়ংবদ শিক্ষিত যুবক, ন্যাশানালিষ্ট, নানা দিকে খোঁজখবর রাখেন। সব বিষয়ে বেশ বুদ্ধিমান ব'লে মনে হ'ল। আরো দেখলুম যে ইনি একটু ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান। দেখতুম যে নমাজ-টমাজ নিয়মমত প'ড়তেন, আর মাঝে মাঝে বেশ মন দিয়ে কোরাণও প'ড়তেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম যে তিনি আরবী জানেন না, বা দু চার কথা যা জানেন তা কিছুই নয়, তবুও তিনি কোরাণ প'ড়ে মনে শান্তি পান। এ ভাবটী আমি আরও অনেক মুসলমানের দেখেছি—আরবী না বুঝেও ভক্তিভাবে কোরাণ প'ড়ে সহজেই পুণ্যের সঙ্গে আত্মপ্রসাদ

লাভ করেন, আর ঈশ্বরের অনুমোদিত ধর্ম্মকার্য্য করছেন জেনে বেশ একটু আধ্যাত্মিক আরাম পান। হিন্দুদের মধ্যেও এই ভাবটা বিরল নয়। বহু পূর্ব্বে ক'ল্‌কাতায় দেখেছিলুম, এক neo-ক্ষত্রিয় স্বর্ণকারের দোকানের ভোজপুরী দরওয়ান, সদর সড়কের উপরে টুলে ব'সে, ট্রামের ঘড়ঘড়, মোটরের ভেঁপু, পথচ'ল্‌তি লোকের কথাবার্ত্তা প্রভৃতি নানারকম আওয়াজের মধ্যে তারস্বরে সংস্কৃত গীতা প'ড়্‌ছে। দেখে মনে ভারী পুলক হ'ল। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে তার পাঠ শুনে, তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "মহারাজ, আপ গীতা পঢ়্‌তে হৈঁ, আচ্ছী বাত ; আপ সন্‌স্‌ক্রিৎ জানতে হৈঁ ?" তাতে সে একটু বিরক্ত-মতন হ'য়ে বল্‌লে, "আরে বাবু, সন্‌স্‌কিরিৎ জান্‌লা-সে কা হোই, খালি একরা পাঠসে জৌন্ পুন্ বায়, উ সমুঝ্‌লাসে কম নৈখে,—সংস্কৃত জেনে কি হবে, খালি এর পাঠে যে পুণ্য হয়, সে বোঝার চেয়ে কম নয়।" অর্থাৎ কিনা "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।" এই যে না বুঝে শাস্ত্র বা মন্ত্র আওড়ানো, এটা হচ্ছে যে জাতীয় culture অর্থাৎ মানসিক আর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধন কোনও মানুষ মেনে নিয়েছে, সেই culture-এর সঙ্গে যোগ রাখার একটা প্রয়াসের বিকার মাত্র। সমাজগত cultural জীবনে হয়তো এর একটা স্থান আছে। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনে এর স্থান কতটা, সে বিষয়ে তর্ক উঠ্‌তে পারে। আবার কোনো জাতির পক্ষে কোন্ ভাষায় মন্ত্র আওড়ানো বা কোন্ রকমের অনুষ্ঠান তার যথার্থ নিজস্ব culture-এর পরিপোষক হ'তে পারে, তা নিয়েও বিচার করা যেতে পারে। কিন্তু সে সব তর্ক, সে-সব বিচার এখন এক্ষেত্রে তুল্‌বো না। বিষয়টি বিশেষ জটিল। আপাততো, যাঁরা সংস্কৃত বা আরবী না বুঝেও খুব নিবিষ্ট

মনে বা ভক্তিভাবে গীতা বা কোরা পড়েন, তাঁরা aesthetes in sound, অর্থাৎ কেবল ধ্বনিবিশেষ থেকে আনন্দ-রস সংগ্রহ করবার শক্তি রাখেন ব'লে, তাঁরা শব্দের মোহ থেকে ধর্ম্মের ভাব-বিলাসে পঁউছুতে পারার যোগ্য সরল আর বিশ্বাসপূর্ণ মনোবৃত্তির অধিকারী ব'লে, আর তাঁদের একটা দিকে একাগ্রচিত্ততা আছে স্বীকার ক'রে, আমি তাঁদের অশ্রদ্ধা করি না।

অবান্তর কথা থাক্। আমাদের এই বিহারী সহযাত্রীটী নানা বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা ক'রতেন। এক ডাক্তার-বাবু ছাড়া শিক্ষিত লোক আর কেউ জাহাজে ছিলেন না, তাই এঁর সঙ্গে জাহাজে ক'দিনে একটু ঘনিষ্ঠতা ঘ'টেছিল। এখন কিন্তু এঁর নামটা মনে প'ড়ছে না, যদিও বারো তেরো বছরের পরেও ভদ্রলোকের মুখটা ও চেহারাটা স্পষ্টভাবে মনে আঁকা র'য়েছে। জাহাজের বন্ধুত্ব, আর কোনও শহরে এক বাসায় থাকার জন্য বন্ধুত্ব, এ দুটী বড়ো চমৎকার জিনিস। যতদিন জাহাজে আমরা একসঙ্গে ভাস্‌ছি, বা যতদিন একত্র এক বাড়ীতে বাস ক'রছি, এক ঘরে সকালসন্ধ্যা খাওয়াদাওয়া ক'রছি, এক বৈঠকখানায় ব'সে আড্ডা দিচ্ছি, ততদিন কী ঘনিষ্ঠতা, কী বন্ধুত্ব জমিয়ে তোলা, পরস্পরের সঙ্গে চিরদিন ধ'রে চিঠির আদানপ্রদান রাখবার কী প্রতিশ্রুতি! তারপর জাহাজ গন্তব্য স্থানে পঁউছে গেলেই, বা বাসা বদ্‌লালেই, সব ইতি। বেশ মনে আছে এই আট দিনের মধ্যেই পরম-অন্তরঙ্গ-হ'য়ে-ওঠা বিহারী বন্ধুটীর নামধাম সব লিখে নিয়েছিলুম, তিনিও আমার নামঠিকানা নিয়েছিলেন,—কিন্তু আট দিন পরে পেনাঙে যে ছাড়াছাড়ি, তারপর আর দেখা হয় নি, চিঠি লেখাও হয়

নি। বিহারী ভদ্রলোকটী জাহাজের কথা বেশ বড় একখানি উর্দূ চিঠিতে লিখ্‌ছিলেন। ব'ললেন যে "জমানা" ব'লে এক উর্দূ সাময়িক পত্রিকা বার হয়, তাতে প্রকাশ করবেন। এই "জমানা" কাগজ কয় খণ্ড এঁর কাছে ছিল। বানান ক'রে ক'রে তখন উর্দূ প'ড়তে শিখ্‌ছি। এই কাগজের উদ্দেশ্যসূচক বচন হিসেবে একটী ফারসী বয়েৎ তোলা র'য়েছে দেখ্‌লুম—"অগর্ জুমানহ্ বা-তূ ন-সাজ্বদ্, তূ বা-জ্বমানহ্ সাজ্ব" —যার ভাবার্থ হ'চ্ছে, "যদি যুগ তোকে না মানে, তুই যুগকে মেনে চল্।" বেশ জ্ঞানবানের মতো কথা; সকলেই এই কথা মেনে চল্‌লে দুনিয়া বড়ো শান্তির দুনিয়াই হ'ত!

আমাদের জাহাজের ডাক্তার বাবুটী বেশ লোক ছিলেন। ফর্সা চেহারা, গোঁফ ছাঁটা, চোখে সোনার চশমা, দোহারা গড়ন, একটু ভারিক্কে রকমের লোক। তাঁর নিজের পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে তাঁর বেশ একটী স্বাভাবিক বোধ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সৌজন্য ক'রে তাঁর ক্যাবিনে প্রবেশ ক'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার অধিকার আমায় দিয়েছিলেন। জাহাজে ডাক্তারী ক'রলে লোকে ডাক্তারী ভুলে যায়, এরকম একটী কথা শুনেছিলুম;—দেখেশুনে মনে হ'ল কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। জাহাজে শ'দুই যাত্রী চ'লেছে, আইন-মোতাবেক জাহাজওয়ালা কোম্পানীকে একজন ডাক্তার রাখা চাইই। দশ বারো বছর আগে, যখন আমি পেনাঙ যাই, তখন পূর্ব্ব এসিয়া অঞ্চলে যে-সব জাহাজের ক'লকাতা বন্দরের সঙ্গে যোগ ছিল, সে-সব জাহাজে ডাক্তারীর কাজ বেশীর ভাগ বাঙালী এল্-এম্-এস্ এম্-বি-রাই ক'রতেন। এখন কি অবস্থা জানি না। আমাদের ডাক্তার বাবু সকালে উঠে ডেক-যাত্রীদের মধ্যে গিয়ে একবার রোঁদ

ঘুরে আস্‌তেন। অসুখটসুখ তেমন তো কারু একদিনের জন্য দেখিনি। একদিন ডাক্তারের ঘরে ব'সে আছি, এমন সময়ে দেখি, একজন ইংরেজ অফিসার এসে হাজির। কলে আঙুল কেটে গিয়েছে, কি ওষুধ লাগাতে হবে তা নিজেই ব'লে চেয়ে নিয়ে গেল। পেনাঙের পথে মাঝে এক বিকাল এক রাত ধ'রে খুব ঝড়বৃষ্টি হ'য়েছিল, তাতে ঠাণ্ডায় হাওয়ায় পরিশ্রমে একজন খালাসীর নিউমোনিয়া হয়, ডাক্তার বাবুকে গিয়ে তাকে দেখ্‌তে হ'য়েছিল। যাই হোক্‌, প্রায়ই বেকার হ'য়ে ডাক্তার বাবুকে ব'সে থাক্‌তে হ'ত। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এটা ওটা কথা কইতুম। অনেক বিষয়ের সন্ধান চাইতুম, যা তাঁর প্রেমাণের অভিজ্ঞতায় পড়া উচিত ছিল ব'লে মনে হ'ত। ডাক্তার বাবুর কিন্তু বড়ো বেশী অনুসন্ধিৎসা দেখ্‌তুম না। তবে তিনি সাহিত্যানুরাগী লোক ছিলেন, সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রেই সময় কাটাতেন। সঙ্গে তিনি নিয়েছিলেন মাদ্রাজের কোন পাকা ব্যবসাদার প্রকাশক কর্ত্তৃক ছাপিয়ে প্রকাশিত, রেনল্ডসের "মিস্‌ট্রীজ্‌ অভ্‌ দি কোর্ট অভ্‌ লণ্ডন," বারো না ষোলো ভলুমে। জাহাজ খানা যাচ্ছিল জাপান অবধি—জাপান পর্য্যন্ত যাওয়া আর জাপান থেকে ফিরে আসা, এ কয় সুদীর্ঘ সপ্তাহ কাটাবার জন্য তিনি একমাত্র সম্বল ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন এই বইখানি, যতদূর মনে আছে আর কোনও বই তাঁর কাছে ছিল না। আর দেখতুম এটী তিনি বেশ তারিয়ে তারিয়ে প'ড়তেন।

ডাক্তারেরই স্বগোষ্ঠীর আর একটী লোক জাহাজে ছিল—একটী পাঞ্জাবী মুসলমান যাত্রী—সে নিজেকে ডাক্তার ব'লে পরিচয় দিলে, ব'ল্‌লে যে মালয় উপদ্বীপে কোন রবারের বাগানে ডাক্তারী করে—

সিঙ্গাপুরে বন্দরে। লোকটা নিজেকে ডাক্তার ব'লে পরিচয় দিলে বটে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় চালচলনে বুদ্ধিমত্তায় ভব্যতায় ৫।৬।৮ বছর ধ'রে কলেজে-পড়া ছেলের মতো কিছু দেখলুম না। আমাদের ডাক্তার বাবু একে অবিমিশ্র তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন—আর এও তাতে কোনরকম আপত্তির বা অপছন্দর ভাব দেখায় নি; বরং ডাক্তার এলে বেশী কথাটথা ব'ল্‌ত না, একটু সমীহ ক'রেই চ'ল্‌ত। ডাক্তার বাবু আমায় ব'ল্‌লেন যে, বিস্তর মাদ্রাজী আর পাঞ্জাবী শিশি-ধোওয়া বা কম্পাউণ্ডার মালয় দেশে গিয়ে ডাক্তার ব'নে বসে, আর কফি রবার বা নারকলের বাগানে গিয়ে চাকরী নিয়ে ভারতীয় আর চীনে কুলীদের মধ্যে সহস্রমারী হ'য়ে থাকে। আমাদের এই পাঞ্জাবীটী যাচ্ছিল তার কর্ম্মস্থলে, সস্ত্রীক। লোকটাকে দেখে ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর বয়সের ব'লে মনে হয়, কিন্তু মাথার চুল অনেক পাকা, থুঁতিতে একটু দাড়ী, রঙ কালো, খর্ব্বাকার, গালে মুখে না-কামানোর দরুণ খোঁচা খোঁচা দাড়ী, মাথায় একটা ময়লা কালো ভেড়ার চামড়ার আস্ত্রাকান টুপী, পরণে লাল ডুরে ছিটের ঢিলে ইজের, গায়ে গলা-খোলা ক্যানানোর চেক-কাপড়ের কোট, আর খুব বাহারে এক টাই গলায়, অতি ময়লা এক কলারকে অবলম্বন ক'রে। পাঞ্জাবী ব'ল্‌লে যে দীর্ঘকায় সৌষ্ঠবময় গৌরবর্ণ সুন্দর মুখশ্রী, তলোয়ারের মতো-নাক, শ্মশ্রুমান শিখ বা রাজপূত বা মুসলমানের ছবি আমাদের মানসচক্ষে এসে পড়ে, এ লোকটীর চেহারায় তার কিছুই নেই। নোতুন বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে কর্ম্মস্থানে যাচ্ছে; সঙ্গে একটি বৃদ্ধা, ঝীও হ'তে পারে, দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হ'তে পারে। বছর তেরো চোদ্দর গৌরবর্ণ একটি মেয়ে, অতি হ্রস্বকায়, পরণে গোলাপী

রঙের জাপানী বা ফরাসী রেশমের পাজামা, জরীদেও । নাগরা জুতা পায়ে, গায়ে সবুজ রঙের ছোবানো মল্‌মলের পিরিহান, তার উপরে সাদা সূতোর ফুলতোলা বিলিতি মল্‌মলের দু'পাট্টা বা চাদর—এই পোষাকে দু' একবার জাহাজের মধ্যে সরু পথে আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'য়েছিল। এই পোষাকের লাল সবুজ রঙের দুটো তুলির পোঁচ যেন জাহাজের ভিতরে বাইরে সুন্দর জগতের একটা স্বপ্ন জাগিয়ে তুল্‌ত। জাহাজের খোলের দুর্গন্ধের মধ্যে, কয়লার গুঁড়োর ছড়াছড়ির মধ্যে, এক পাশে জড়ো ক'রে রাখা চীনে বাবুর্চ্চীখানার আর গোয়ানীজ রান্নাঘরের এঁটোকাঁটা আলুর খোসা কপির পাতার মধ্যে, ইঞ্জিনের রকমারি বিকট ভীষণ কর্কশ ধ্বনির মধ্যে, হঠাৎ একবার আধবার দূর থেকে মেয়েটিকে দেখে মনে হ'ত যেন মোগল যুগের ছবি থেকে কোনও শাহজাদী নেমে এল,—যদিও মোগল শাহজাদীদের পোষাকটা ঠিক এরকম নয়, আর ছবিতে তাদের মুখ বোর্‌কা বা চাদরে ঢাকা থাকে না, খোলা ক'রেই আঁকা হয়। জাহাজে তুলে দিতে এদের সঙ্গে আত্মীয় কেউ আসে নি, দূর পাঞ্জাবেই এদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হ'য়েছিল বোঝা গেল। মেয়েটী আর তার সঙ্গের বৃদ্ধা দু'জনকেই বোর্‌কা বা ঘেরাটোপ পরিয়ে জাহাজে তোলা হয়; "মক্কা-বুড়ীর" সাজে এদের পা কাঁপতে কাঁপতে জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা, এই সব যখন দেখ্‌ছিলুম, তখন এক-গলা ঘোমটাদেওয়া বাঙালী মেয়েদের—ছেলেমেয়ে কোলে কাঁধে ফেলে, তাঁদের মাঝে মাঝে ঘাড়-ফিরিয়ে মুখ-খিঁচায়মান কর্ত্তাদের পিছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ট্রেণে ওঠবার সময়ের অবস্থা স্মরণ ক'রেও, এই ঘেরা-টোপ পরা, প্রতি মুহূর্ত্তে (না দেখতে পাওয়ার জন্য বোধহয়) প্রায়

হুমড়ী-খেয়ে-পড়া বেচারীদের জন্য একটু বেশীরকম দুঃখু হ'য়েছিল। জাহাজে ক্যাবিনের যাত্রী বেশী ছিল না, তাই এরা স্বামী স্ত্রীতে একটী ক্যাবিন পেয়েছিল। কিন্তু ক্যাবিনের ভিতরের গরম আর ভাপ্‌সা দুর্গন্ধের কথা স্মরণ ক'রলেও আমাদের উপর ডেকের খোলা বাতাসে ব'সে থেকে হৃৎকম্প হ'ত; আর সেখানে এই মেয়েটীকে সমস্ত দিন ব'সে থাকতে হ'ত—নিরুপায়, ভারতীয় আশ্‌রাফ বা ভদ্র মুসলমান ঘরের পর্দ্দানশীন মেয়ের আব্রু রাখতেই হবে—একি যে-সে কথা! তার স্বামীর সঙ্গে দূর দেশে ঘর ক'র্‌তে চ'লেছে—এটা ভেবে যে একটু আনন্দ হবে মনে, তার জো ছিল না — কারণ এই লোকটার মুখখানা আর ধরণ-ধারণ মনে প'ড়্‌ত, আর সঙ্গে সঙ্গে উপরে ডেকে এসে আমাদের কাছে তার রবার আর কফী বাগানের মাদ্রাজী কুলীমেয়েদের সম্বন্ধে দুটো রসিকতার কথা ব'লে আমাদের খুশী ক'রে দেবার চেষ্টার দৃশ্যটীও মনে আস্‌ত।

আমরা এই ক'জন তো হ'লুম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—বিহারী, জাপানযাত্রীটী, এই পাঞ্জাবওয়ালা, আর আমি। দু'জন কচ্ছী খোজা ব্যবসায়ী, বোম্বাইয়ে মুসলমান, প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হ'য়ে যাচ্ছিলেন। একজনের নাম হাজী মোমিন ভাই, আর একজনের নাম হাজী আব্দুল্লা ভাই—না ঐরকম একটা কিছু। দু'জনেই সুপুরুষ দেখতে—মুখে চাপদাড়ী, মুসলমানী কায়দায় গোঁফ খুব ছোট্ট ছোট্ট ক'রে ছাঁটা,—বেশ অভিজাত শ্রেণীর উপযুক্ত, রূপকারের উপযুক্ত লম্বা সরু সরু আঙুল, গায়ের রঙ্ বেশ ফর্সা,—আচারে ব্যবহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে, আঙুটীতে চেনেতে, আতরের খোশ-বো'তে ধনী ব'লে বুঝতে বেশী দেরী হ'ত না। একটু comfortable

bourgeois-সুলভ স্থূলোদর,—সঙ্গে চাকর ছিল, রোজই মুর্গী মেরে পোলাও কোর্ম্মা রেঁধে খেতেন। নেমাজ পড়তেন নিয়ম মতো, আর তসবীর মালা নিয়ে ঘুরুতেন। কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পালনের আর কোনও বালাই রাখেন নি। আমরা যে সময়ে যাত্রা করি, সেটা তখন হ'চ্ছে মুসলমানদের রমজান মাস, রোজার উপবাসের সময়। এঁরা তখন রোজা রাখেন নি। আর এদিকে আমি দেখেছি, জাহাজের বাঙালী মুসলমান খালাসী সারাদিন উপোস ক'রে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটছে, আর সন্ধ্যের সময় চাঁদ দেখে, বড়ো টিনের পরাতের উপর ছোলা ভিজানো আর পেঁয়াজরশুনের কুচী রেখে চার পাঁচ জনে মিলে চারদিকে ঘিরে ব'সে সমস্ত দিনের পর নাস্তা ক'রছে। আমি মোমিন ভাই আব্দুল্লা ভাইদের জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম,—"সাহেবান্, আপ্‌লোগ্ হাজী হোকর্ রোজা রখ্‌তে নেহীঁ কোঁ্যা ?" তার উত্তরে এঁরা বেশ ব'লেছিলেন, "বাবু সাহেব, মোসাফেরের আবার রোজা কি ?"—অর্থাৎ "পথি শূদ্রবৎ আচরেৎ।" মোমিন ভাই আব্দুল্লা-ভাইরা যাচ্ছেন যবদ্বীপে। এঁরা লাখো লাখো টাকার চিনি যবদ্বীপ থেকে ভারতবর্ষে আমদানী করেন প্রতি বৎসর, অনেক তল্লাটের ছোটোখাটো সহরের বাজার এঁদের মুঠোর মধ্যে,—বোম্বাইয়ে, ক'ল্‌কাতায়, পূর্ব্ববঙ্গে নানা জায়গায় এঁদের আড়ৎ আছে। যবদ্বীপে গিয়ে এঁদের চিনির কারবারের সম্বন্ধে কি সব ব্যবস্থা ক'রে আস্‌বেন ব'লে যাচ্ছেন। এই কোম্পানীর জাহাজেই এঁদের চিনি আসে। আমার মনে হ'ল, এঁরা বিনা খরচার টিকিটে যাচ্ছেন, কোম্পানী বড়ো খ'দ্দের ব'লে খাতির ক'রে স্থান দিয়েছে। জাহাজওয়ালারা যে সব মহাজনের মাল-টাল বেশী ক'রে বয়, মাঝে মাঝে প্যাসেঞ্জার-আস্‌টা

দিয়ে তাঁদের মান্য রাখে। আর স্বভাবতই এই সব মহাজন দরকার প'ড়লে নিজেদের প্রাপ্য এই সম্মানটুকুর অধিকার ছাড়েন না। পোন্নাবালাস্ বেঙ্কটাপ্পা পিল্লেই হ'চ্ছেন তামিল চেট্টী মহাজন, ক'লকাতা থেকে মাদ্রাজ, টুটিকোরিন, জাফ্না, কোলোম্বো তাঁর মস্ত আমদানী রপ্তানী কারবার আছে, অনেক লাখ টাকার ব্যবসা—তিনি কালীঘাটের চেট্টীদের মন্দিরে সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিক ঠাকুরের অনেক টাকার জহরতের গয়না ক'রে দিয়েছেন; তিনি তাঁর ছেলে আর ভাইপোকে কোলোম্বো পাঠাতে চান ক'লকাতা থেকে—তাঁর দুখানা প্যাসেজ টিকিটের দরকার। ক'লকাতার এক বড়ো ইংরেজ সওদাগর আর জাহাজওয়ালা কোম্পানী তাঁর মাল বয়—চেট্টীমশায় টিকিটের দরবার করবার জন্য একেবারে আপিসের বড়ো সাহেবের ঘরে এসে হাজির। কি? না, "চাব্, দোটো টিক্কিট্ দেও, জাট্টী নেই মাঙ্গতা, দোটো ফাস্ট্র কিলাচ, কোড়োম্বো।" কালো ভাতের হাঁড়ির মতো গায়ের রঙ্, মাথার আদ্ধেকটা কামিয়ে উড়ে খোঁপা বাঁধা, তার উপরে লাল জরীপাড় মাদ্রাজী পাগড়ী, সমস্ত কপাল জুড়ে সাদা বিভূতির চিহ্ন, গোঁফ-দাড়ী পরিষ্কার ক'রে কামানো, খালি গায়ে বুকে হাতে বিভূতির ছাপ, গলায় মস্ত চওড়া জরীপাড়ের ধব্ধ'বে সাদা মল্‌মলের চাদর জড়ানো, পরণে আধ হাত আল্‌তারঙের পাড়ওয়ালা কাপড়, তার কাছার একটা খুঁট্ ঝুল্‌ছে—নখের মতন বড়ো বড়ো হীরের দুই কানফুল কালো রঙের মধ্যে দুই কানে জ্বল্‌জ্বল্ ক'রছে, খালি পা—এ হেন দ্রাবিড় সভ্যতার মূর্ত্তিমান অবতার এসে আমাদের ক্ষীণকায় স্কচ্ বড়ো সাহেবকে জড়িয়ে ধরে আর কি! সাহেব চেয়ারে ব'সে তটস্থ, ন যযৌ ন তস্থৌ! পিল্লের কদর তিনি বেশ বোঝেন, তাকে

চটাতে চান না, অথচ দুখানা ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট দিতেও একটু ইতস্ততো ক'রছেন—এমন সময়ে, "চাব্, তুম্ দো টিকিট্ দেও, জাট্টি নেই" ব'লতে বলতে, মুখে চুমকুড়ি দিতে দিতে চেট্টি অনর্গল্ সাহেবের সাম্‌নে এসে, টেবিলের ওধারে সাহেব ব'সে আছে, ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে তার থুঁতী ধ'রে চুমু নিতে লাগ্‌ল! সাহেব তো তখন প্রমাদ গণে' চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—Roberrtson, Roberrtson, come quick, tak' this fellow awa', gie him twa firrst-class to Colombo—man, he is trryin' to kiss me! আপিসের যে বাবুটী ফ্রী প্যাসেজের টিকিটে নামটাম লিখে সাহেবের দস্তখত করিয়ে টিকিটটা পাস করিয়ে আন্‌লেন, চেট্টীমশায় খুসী হ'য়ে তাঁকে দুটী বাঁধা সিকি উপহার দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন, পাছে আর কেউ কিছু চেয়ে বসে, বা যাঁকে এই অর্থ তিনি দিলেন, তিনি ফিরিয়ে দেন।

ক্যাবিনের যাত্রী এই ক'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। জাহাজ কালাপানীতে পড়বার পরে ক্যাবিনের যাত্রী আর একটী হ'ল— একটী বাঙালী মুসলমান ছেলে। জাহাজে বিস্তর ভেড়া ছাগল যাচ্ছিল। কে পাঠাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনও খবর আমার জানা ছিল না। পরে সব জান্‌তে পারি। বেলিলিয়স্ ব'লে একজন ইহুদী এই জানোয়ার চালানের কাজ ক'রে এককালে খুব দু-পয়সা রোজগার করে। ছাগল, ভেড়া বাঙলা দেশে বা পশ্চিমে কিনে, জাহাজে ক'রে ক'ল্‌কাতা থেকে মালয় উপদ্বীপে পেনাঙ্, সিঙাপুর অঞ্চলে চালান হয়, সেখানে সব কেটে বিক্রী হয়। (গরু বোধহয় যায় না, কিন্তু ক'লকাতা থেকে নুন দিয়ে জারিয়ে গোমাংস

খুব যায় ওদেশে,—সম্প্রতি খবরের কাগজে পড়া গেল যে, এই রকম jerked beef বছরে কত লক্ষ মণ ক'রে ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানী হয়—নিখিল ভারত-গোরক্ষণী-সভার দৃষ্টিও নাকি এদিকে আকর্ষিত হ'য়েছে)। বেলিলিয়স্ এখন পরলোকে। বেলিলিয়সের বাড়ী ছিল হাওড়ায়, বেলিলিয়সের বংশে কেউ নেই, মাত্র তাঁর বিধবা স্ত্রী ছিলেন,—কিছুকাল হ'ল তিনিও মারা গিয়েছেন। তাঁর মস্ত বাড়ী, বাগান সব তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীকে দান ক'রে গিয়েছেন, কিছু টাকাও দিয়ে গিয়েছেন, সেই বাড়ীতে এখন হাওড়া বেলিলিয়স্ স্কুল স্থাপিত হ'য়েছে। বেলিলিয়সের ব্যবসা এখন চালাচ্ছেন—অর্থাৎ ১৯১২ সালে চালাচ্ছিলেন—হুগলী না বৰ্দ্ধমান জেলার কতকগুলি মুসলমান। শুনলুম অন্য রপ্তানী আর আমদানি কাজও এঁদের আছে। এঁরা বেশ ভদ্রলোক। পেনাঙে এঁদের এক আফিস আছে। পেনাঙে নেমে এঁদের আফিসেই আমায় ডেরা নিতে হ'য়েছিল, এঁদের বিশেষ সৌজন্যের পরিচয়ও পেয়েছিলুম। পেনাঙে এই তিন চারজন বাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ী, তাঁদের বাঙালী হিন্দু কেরাণী দু একজন নিয়ে একটা আড্ডা জমিয়ে রেখেছিলেন, সেখানে জাহাজের বা হাঁসপাতালের ডাক্তার আর অন্য অন্য ভ্রাম্যমাণ বা 'থিতু' বাঙালী ভদ্রলোকের সমাগম মাঝে মাঝে হ'ত। বেলিলিয়স্ কোম্পানীর নামে তখনও ব্যবসাটা ছিল। জানোয়ারগুলোকে জাহাজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়, তাদের ঘাস জল দেয় ৪।৫ জন ক'রে নীচ শ্রেণীর ক'লকাত্তাই মুসলমান—যারা বেশীর ভাগ পশ্চিম থেকে এসে ক'লকাতার অধিবাসী হ'য়ে গিয়েছে, বাঁকা বাঙলা বা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী যারা বলে, ক'লকাতার যত বাবুর্চ্চীখানা আর কাফীখানা যারা সরগরম

রাখে, যাদের মধ্যে থেকে গাড়োয়ান, কসাই, ইংরেজ আর ফিরিঙ্গি বাড়ীর চাকর-খানসামা, আর গাঁটকাটা গুণ্ডা প্রভৃতি হয়। এখন আমাদের জাহাজে এই বাঙালী মুসলমান ব্যাপারীদের একটী ছেলে যাচ্ছিল, ১৮।১৯ বছর বয়সের হবে, পেনাঙে তাদের আফিসে কাজকর্ম্ম শিখ্‌বে ব'লে। এদের ফার্ম্মের একজন বুড়ো চাকর, যে অনেকবার ছাগল-ভেড়ার তদারকে ক'লকাতা-পেনাঙ যাওয়া-আসা ক'রেছে, সে ছিল সঙ্গে, আর বুড়ো ছেলেটিকে খুব যত্ন করে' নিয়ে যাচ্ছিল। ভেড়া ছাগলের মধ্যে, ষ্টীমারের শামিয়ানা-ঢাকা খোলা ডেকের উপর, কল্‌-কব্‌জার আশেপাশে, জানোয়ারগুলির তদারক করবার জন্য লোক-গুলো যেখানে মাথাগোঁজ্‌বার জায়গা ক'রে নিয়েছিল, সেখানে এদেরই মধ্যে ছেলেটীও প্রথম ২।৪ রাত কাটিয়ে দেয়। কিন্তু কালাপানীতে জাহাজ প'ড়লে পর, ছেলেটীর চক্কর লাগে। তখন বুড়ো চাকরটী জাহাজের একজন সারেঙের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে, তার সুপারিশে জাহাজের সাহেব কেরাণীকে ব'লে ছেলেটীকে একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস ক্যাবিনে, যেখানে আমাদের আব্দুল্লা ভাই মোমিন ভাইরা ছিলেন, সেখানে এনে হাজির ক'র্‌লে। তখন জাহাজ নীল জল কেটে বেশ মৃদুমধুর দুল্‌তে দুল্‌তে চ'লেছে; সকালবেলা, প্রথম শরতের মিষ্টি রোদ্দুর, আমরা উপরের ডেকে ব'সে কজনে কথাবার্ত্তা আলাপ-সালাপ ক'রছি—বিহারী মুসলমান ভদ্রলোক, খোজা দুজন, আর আমি; মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবু এসে দু চারটী কথা কইছেন। এমন সময়ে আমাদের এই বাঙালী মুসলমান ছেলেটীকে সঙ্গে নিয়ে তার অনুচর old Adam তার মালপত্র ঘাড়ে ক'রে উপস্থিত হ'ল—সঙ্গে সারেংও ছিল,—আশ্বাস দিচ্ছিল ছেলেটীকে।—ক্যাবিনটা বড়ো;

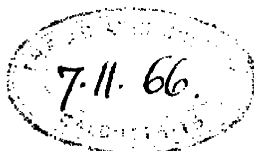
একটা খালি বাঙ্কের তলায় আসবাবগুলি রাখ্‌লে—একটা টিনের তোরং, আর একটা বিছানা। ছেলেটী অতি কাচুমাচু ভাবে এল। বুড়ো তাকে বেশ উৎসাহ দিয়ে ব'ল্‌লে—"এসো, ভিৎরে এস্‌তে ভয় ক'রো না—এই তো খোজারা র'য়েছে—এনারাও মোসলমান,—লাও, এক কাজ করো—তোমার তোরং থেকে কোরাণ-শরীফখানা বের করো—বেশ, এখন এক কাজ করো, ওইখানে ওই বাতীটার গায়ে ওখানা টেঙিয়ে রাখো।" তার কথামতো ছেলেটী রঙীন ছিটের আর লাল সালুর থ'লেয় ঢাকা, ফিতে দিয়ে বাঁধা মস্ত একখানা বই বার ক'রে বিজলী আলোর ডাঁটীতে ঝুলিয়ে দিলে। তাকে ঠিকঠাক করে' বসিয়ে দিয়ে বুড়ো চ'লে গেল। কোরাণ-শরীফখানা হঠাৎ বার ক'রে বাতীটার গায়ে "টেঙিয়ে" রাখবার উদ্দেশ্যটা বুঝ্‌লুম না—তবে বোধহয় ক্যাবিনের দখলদার খোজা-মিঞাদের কাছ থেকে স্বধর্ম্মী-হিসাবে বাঙালী মুসলমান ছেলেটি যাতে একটু সহানুভূতি পেতে পারে, সেই ইচ্ছেয় বুড়ো তার মনিবের বাড়ীর ছেলের ইস্‌লামীত্ব এই রূপে জাহির ক'রে গেল। খোজারা কিন্তু সে কারণে যে তার প্রতি বিশেষ "আর্ত্তি" দেখালে, তা মনে হ'ল না। যাক্—ছেলেটী অতি নিরীহ ভালোমানুষ ধরণের; ভদ্রঘরের বাঙালী হিন্দু ছেলের থেকে কোনও পার্থক্য চেহারায় চালচলনে কথাবার্ত্তায় ধরা যায় না। আমি এর সঙ্গে আলাপ জমালুম। তখন বেলিলিয়স্ কোম্পানীর খবর পেলুম। কিন্তু ছোকরা বড়ো লাজুক—বেশীক্ষণ সে তার ভেড়ার রাখালদের মধ্যে গিয়েই কাটাত, ক্যাবিনে বোধহয় রাত্তিরে খালি ঘুমোবার জন্য আসত। এর অনুমতি নিয়ে কোরাণ-খানা দেখলুম—চামড়ায় বাঁধা বড়ো বই, মোটা মোটা হরফে আরবী মূল, সঙ্গে সঙ্গে নীচে উর্দুতে

তরজমা, পাতার আশে-পাশে উদূতে টীকা। মূল বা তরজমা দুইয়ের একটীও বইয়ের মালিক প'ড়তে পারে না। বইখানি সঙ্গে আছে, ইস্‌লামীর নিশানা হিসাবে—আর বোধহয় potent charm হিসাবে;—রামায়ণ মহাভারতের মতন কোরাণ ঘরে রাখ্‌লে বা সঙ্গে থাক্‌লে বিপদ-আপদ হয় না, ভূত-প্রেত জীন-শয়তানের অদৃশ্য উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ছোকরা বছরখানেক, কি তার বেশীর জন্য পেনাঙে যাচ্ছে। সঙ্গে কিছু বাঙলা বই নিয়ে যাচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তার তোরং থেকে কতকগুলি বাঙলা বই বার ক'রে আমায় দেখালে। মীর মশার্‌রফ হোসেনের "বিষাদ-সিন্ধু" বোধহয় একখানা ছিল, আর ছিল "তজকিরাৎ-আল্‌-আওলিয়া"র বাঙলা অনুবাদ, গিরীশচন্দ্র সেন কৃত, নববিধান সমাজ থেকে প্রকাশিত। বইখানি হ'চ্ছে সূফী ভক্ত আর সাধকদের জীবন-চরিত নিয়ে, মূল বই ফারসী ভাষায়। অতি উপাদেয় বই, আগে আমার একটু আধটু পাতা-উলটানো ছিল, জাহাজে ব'সে বইখানা ছেলেটীর কাছ থেকে নিয়ে একবার ভালো ক'রে পড়ে ফেল্‌লুম। বইখানার নামপত্রে ইংরিজি অক্ষরে বইয়ের নাম লেখা ছিল—Tazkirat Al-Awliya। গুজরাটী খোজাদ্বয় ইংরিজি প'ড়তে পারেন দেখাবার জন্য বইখানা আমার কাছ থেকে নিয়ে বানান ক'রে ক'রে নামটী প'ড়লেন; তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—"ইয়ে ক্যা হৈ?" আমি তাদের ব'ল্‌লুম যে এই বিষয়ের বই। তখন তাঁরা বিষয়ের গুরুত্বটি উপলব্ধি ক'রলেন, তাঁরা বেশ ধর্ম্মপ্রাণভাবে খুশী হ'লেন, আর বাঙলা ভাষারও তারিফ ক'রলেন, যাতে এমন সব আধ্যাত্মিক বিষয়ের বইয়ের অনুবাদ হয়। আমিও সুযোগ পেয়ে দু চারটে আধ্যাত্মিক বচন—যেমন তাপসী রাবেয়ার জীবন-চরিত থেকে

—তাঁদের সমঝে দিতে লাগলুম ; তাঁরা শুনে ইস্‌লামের মধ্যে কতো সব ভালো ভালো কথা আছে তা হৃদয়ঙ্গম ক'রতে আমাকে উপদেশ দিলেন, নিজের ধর্ম্মের গৌরবে একটু গদ্‌গদ ভাবও হ'লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই গৌরবের একটু অংশ, উপস্থিত ক্ষেত্রে এই সব ভালো ভালো কথার বাহন-হিসাবে বাঙলা-ভাষাকে, আর সমঝদার-হিসেবে বাঙালী জাতকেও দিয়ে ফেল্‌লেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



পদ্মা ও রবীন্দ্রনাথ।



পদ্মার একটু বিশেষত্ব আছে—ইহা বিশেষ করিয়া বাংলার নদী। গঙ্গার সহিত ইহার নাড়ির যোগ আছে—কিন্তু পথের যোগ নাই। সমস্ত ভারতবর্ষের ধারাকে হঠাৎ অস্বীকার করিয়া কেমন যেন দুর্দ্দম গতিতে, ভগীরথের শঙ্খ-স্বনিত পথকে উপেক্ষা করিয়া, স্বৈর-শাসনে পাগ্‌লী কোন্ দিকে ছুটিয়া চলিল। এ যেন মণিপুর রাজকন্যা পুরুষাচারিনী গর্ব্বমত্তা চিত্রাঙ্গদা। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ পৌরাণিকতার গ্রানিট্‌স্তরের ভিত্তিতে সুদৃঢ়; বাংলার সমুদ্রমন্থন এখনো শেষ হয় নাই। সমুদ্রের অঙ্ক হইতে নূতন মাটি প্রতিদিনই এখানে আলোতে উদ্ভাসিত হইতেছে। বহু শাখানদীর সঞ্চিত পলিতে বাংলার জমি নিত্য নব-গঠিত, ও প্রতিমুহূর্ত্তেই সরস। ভারতের অন্যান্য নদীর একটি নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, কিন্তু পদ্মার মান-চিত্র কোনদিন প্রস্তুত হইবে না। এই পথভ্রষ্টা নদী পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া পাণ্ডববর্জ্জিত অনাচারী ব্যাধকিরাত অধ্যুষিত বাংলাদেশে হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। ইহা কবির মতই খামখেয়ালী। মেঘে ম্লান, শরতে স্বচ্ছ, শীতে শান্ত এই পদ্মা; কূলে শস্য, জলে নৌকা এই পদ্মা; বর্ষার প্রথম বারিসমাগমে সমাকুল; বৈশাখের মেঘপতাকার দূর সঙ্কেতে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিস্তব্ধ; উভয় তীরের ঝাউঝাড়গ্রাসী ঘনায়মান কলগর্জ্জিতা; স্নেহশীলা জননীর

ন্যায় কোলের নৌকাগুলিকে দোলাইয়া নত-নয়না; কখনো নৃত্যশীলা নটিনীর মত দ্রুত চরণচাঞ্চল্যে কলহাস্যময়ী; কখনো শবরীদুহিতা শ্যামা শর্ব্বরীর মত উচ্ছ্বসিত কৌতুকে ধনুনিবদ্ধপাণি মুগ্ধতীর-তূণীরা; শ্রান্ত-অঞ্চলা শরৎশেষের ক্ষীণশশিকলাটির প্রায় কখনো দিক্‌শয্যাপ্রান্তলগ্না। বর্ণবৈচিত্র্যহীন বাংলার সমুদায় প্রান্তরতল-শায়িনী, একাকারা, বিরাট, বিশাল, উদাস, উদার এই পদ্মা; জগতের সব চেয়ে পুরাতন, সব চেয়ে দীর্ঘ, সব চেয়ে করুণ, সব চেয়ে একঘেয়ে একখানি আদিঅন্তহীন কাহিনীর মত এই পদ্মা।

এ হেন পদ্মার তীরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিশু-কাব্যকলাকে লইয়া গিয়া বসিলেন। প্রত্যক্ষ সচলতার মত, পৃথিবীর স্পন্দমান নাড়ির মত বিরাট নদীটি বহিতেছে; উভয় তীরে মৌন লোকালয় চিরদিন নিশ্চল। পদ্মার ও পদ্মাতীরের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য অধিকাংশ লোককেই বিচলিত করে—আর ইনি তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ইহা কবির চিত্তে গভীর রেখা অঙ্কিত করিল। নদীর এই অপ্রতিহত অনবচ্ছিন্ন গতি একটি অখণ্ড সচলতা সমর্পন করিল তাঁহার হৃদয়ে ও কাব্যে।

"আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে' নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি, তাহলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষপশুর মধ্যে যে চলাচল, তাতে খানিকটা চলা খানিকটা না-চলা, কিন্তু নদীর আগা-গোড়াই চল্‌চে; সেই জন্যে আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিক ভাবে পদচালনা করে, অঙ্গ চালনা করে, আমাদের মনটার আগা-গোড়াই চলেছে। সেইজন্য এই ভাদ্র মাসের পদ্মাকে একটা প্রবল

মানস শক্তির মধ্যে বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মত ভাঙচে চুরচে এবং চলেছে—মনের ইচ্ছার মত সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসঙ্গীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মত, আর বিচিত্র শস্য-শালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মত।”

(ছিন্ন-পত্র)

বাংলার আব্‌হাওয়াতে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে অনায়াসে সংস্কারকে সে উত্তীর্ণ হইতে পারে। পদ্মাতে যেমন দেখিলাম—তেমনি দেখিতে পাই বাংলার সঙ্গীত-কলাতে। অন্যত্র যাহা ধ্রুপদ, এখানে আসিয়া তাহা খেয়াল হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মা যেমন বিশেষ করিয়া বাংলার—কীর্ত্তন তেমনি বিশেষভাবে বাঙালীর—তাহা কিছুতেই আর প্রাচীন রীতিকে না মানিয়া, খোলে করতালে উদ্দাম নৃত্যভঙ্গীতে উত্তাল হইয়া উঠিল।

প্রাচীনতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া যাইবার একটা নেশা বাঙ-লার সমাজ ও সাহিত্যকে নানা দিক হইতে স্পর্শ করিয়াছে।

এই সচলতা কবির আর্ট ও কাব্যকে জড়তা হইতে রক্ষা করিয়াছে। আর্টের পক্ষে জড়তার মত বালাই আর নাই; কোনো অবস্থাবিশেষে বদ্ধ হওয়াতেই তাহার সমাধি; গণ্ডি-বদ্ধ আর্ট সকল অবস্থার সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে পারে না—আর সকলেই জানেন একাত্ম-তার (Sympathy) অভাবই আর্টের মৃত্যুবাণ। এই সদাসচলতাই তাঁহার কাব্যকে চিরনূতন করিয়া রাখিয়াছে। যৌবনে পদ্মার তীরে এই গতির মন্ত্র তিনি লাভ করিয়া সমস্ত জীবন তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; অবশেষে জীবনের সায়াহ্নে একদিন শ্রীনগরে মানসোৎকণ্ঠবলাকার

পক্ষবিধূননে সেই গতিকেই প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিলেন
অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।” আর একদিন সেই পুরাতন পদ্মার গতিকেই মুর্ত্তিমতী দেখিলেন প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনায়। তিনি তাই বলিলেন “তাকাস্‌নে ফিরে, সম্মুখের বাণী নিক্‌ তোরে টানি মহাস্রোতে।”

এই চির-জাগ্রত গতিতেই তাঁহার কাব্যের নবীনতার বীজমন্ত্র। তাঁহার সমগ্র কাব্য-অধিকারের ভিতর কেহ এমন একটিও কবিতা বাহির করিতে পারিবেন না, যাহা গতিমন্ত্রচ্যুত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের পক্ষে এই গতির মুলমন্ত্রটি কতখানি তাহা মনে রাখিয়া, আমরা সোনার তরীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

প্রসাধন।

——:০:——

সৃষ্টির আদিযুগ থেকে স্বভাবসুন্দর রমণীমুখকে সুন্দরতর করবার জন্যে অজস্ররকম চেষ্টা চল্‌ছে। দেশে দেশে যুগে যুগে কত প্রসাধনদ্রব্যেরই যে আবিষ্কার হয়েছে, তার আর সংখ্যা করা যায় না; এবং এই আবিষ্কারকার্য্যে কবি থেকে বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীই সমানভাবে হাত মিলিয়ে আস্‌ছে।

প্রাণীজ, খনিজ, জলজ, উদ্ভিজ্জ—কোন বস্তুই এই প্রসাধন-তালিকা হ'তে বাদ পড়েনি। চন্দন চূয়া কুঙ্কুম কস্তুরী, লোধ্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল, সিন্দুর, কজ্জল, কাঁচপোকা, গুব্‌রেপোকা, রুজ পাউডার, রং, এমন কি গোবর পর্য্যন্ত ফেলা যায় না—এম্‌নি কপালের লেখা!

যুগে যুগে রুচি অনুযায়ী প্রসাধনদ্রব্যের বিভিন্নতা থাক্‌লেও ভিতরের ভাবটি কিন্তু চিরন্তন—রমণীমুখকে সুন্দর করতে হবে। চেষ্টা যত্নের প্রাবল্য দেখে এক এক সময় সন্দেহই হয় যে, রমণীমুখ আসলে বোধ করি সুন্দর নয়, আর রমণীরা তা জানেন বলেই আভরণ এবং আবরণের এত ঘটা!—এ প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্য অসম্ভব; কারণ পুরুষের চোখ রমণীমুখের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করবার জন্যে সৃষ্টি হয় নি, আর রমণীর মন পুরুষের কাছে ঠিক মনের কথাটা ভুলেও স্বীকার করবার জন্যে প্রস্তুত নয়। কিন্তু আসল জিনিষকে বাড়াবার নামে

নকল দিয়ে আসলকে ঢেকে ফেলাটা প্রসাধনের একটা গোপন উদ্দেশ্য, তাতে আর সন্দেহ নেই। সে হিসাবে গুণ্ঠনকে শ্রেষ্ঠ প্রসাধন বলা যেতে পারে, কেননা তা পূর্ণ-আবরণ; সুতরাং সৌন্দর্য্য বাড়াবার চরম উপায়। গুণ্ঠনমোচনে সৌন্দর্য্যের নানা ফাঁকি ধরা প'ড়ে যায়। প্রসাধন বাদ দিলেও রূপের অনেক ত্রুটি ধরা পড়বে, এই আশঙ্কা রমণীর প্রসাধনপ্রিয়তার একটা কারণ ধরা যেতে পারে।

কিন্তু পুরুষেরা এ বিষয়ে এত সাহায্য করবে কেন? চন্দন চয়ন, মুক্তা উত্তোলন, কস্তুরী অন্বেষণ থেকে আরম্ভ করে' কাঁচপোকা-শিকাররূপ দুঃসাহসিক কাজ সমস্তই পুরুষে সম্পাদন করেচে ও করচে। আমার মনে হয়, পুরুষের কর্ম্মপ্রিয়তার ন্যায় সৌন্দর্য্য-প্রিয়তাও মজ্জাগত; কিন্তু আশেপাশে সত্যিকারের সৌন্দর্য্যের অভাবও একান্ত পরিস্ফুট। সকলে কবি হ'লে হয়ত কোন অসুবিধা থাকৃত না; চাঁদের দিকে চেয়েই মাসে অন্ততঃ পঁচিশটা দিন কাটিয়ে দিতে পারত। তা যখন নয়, তখন যা কাছে আছে, তাকেই মেজে ঘসে' সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে জেনেশুনেও ঠক্‌বার পরিতৃপ্তি থেকে পুরুষ নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। সেই জন্যেই পুরুষ চিরদিন প্রসাধন-বস্তুর আবিষ্কার-নিরত, আর রমণী তারই প্রয়োগপটু; প্রকৃতির এই প্রধান দুটি পক্ষের প্রবল তাড়নায়, প্রসাধন-শিল্পটা প্রায় পাগ্‌লামি লোকের কাছাকাছি পৌঁছেচে।

প্রসাধন ব্যাপারটা যে নকলের সেরা, তা'তে আর সন্দেহমাত্র নেই; কিন্তু আসলের কাঠামো না পেলে নকলটা কি এতদিনকার পরমায়ু পেতে পারত? নাক,মুখ, চোখ, কান, গণ্ড, ভ্রূ ললাটের গঠন সম্বন্ধে দেশ ও কালভেদে রুচিভেদ অবশ্য চিরকালই রয়েচে ও

থাক্‌বে। এক দেশের নিন্দিত কটা চুল অন্য দেশে স্বর্ণালকরূপে বন্দিত। তথাপি রুচির এই পার্থক্য সত্ত্বেও মানবমনে নিশ্চিতই সৌন্দর্য্য-বোধের একটা কোন স্থির মাপকাটি আছে। সেই মাপকাটিতে আমরা যার পরিমাপ করি, তা রূপ নয়,—শ্রী। রূপ ও শ্রী দুটি ভিন্ন বস্তু। রূপের বিচার চোখে, শ্রীর পরখ মনে। রূপের রুচি পরিবর্ত্তনশীল, শ্রীর রুচি চিরন্তন। সেই জন্যই বোধ করি, প্রকৃত শিল্পীর হাতে আঁকা বিদেশী সাজে সজ্জিত, বিদেশী ভাবাপন্ন রমণীচিত্রেও মন মুগ্ধ হয়; যদিচ চোখ বলে, সে রূপ নিয়ে ঘর করা চলে না। রূপ শ্রীর সহায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক সময় শ্রী হচ্ছে রূপনিরপেক্ষ। এমনতর প্রায়ই দেখা যায়,—বর্ণ গৌর নয়, মুখচোখের ঢং মাপ ও ছন্দ কবিজনের উপমাবস্তু থেকে অনেক তফাতে,—তবু সেই মুখ দেখেই মন মুগ্ধ হচ্ছে। আবার নাক কান চোখ চুল রং সবই ভালো, অথচ মন ঠিক প্রসন্ন হচ্ছে না,—এর দৃষ্টান্তও বিরল নয়। মুখশ্রীর তারতম্যই এর কারণ। এমন-কিছু একটা তফাৎ দুখানি মুখের মধ্যে কোথাও আছে, যাতে সৌন্দর্য্যের উপকরণসত্ত্বেও একখানিকে মন সুশ্রী ব'লে উঠতে পারছে না, এবং অন্যখানিতে তার অভাব জেনেও আকৃষ্ট হচ্ছে। ঐ এমন-কিছু পদার্থটিকেই আমি শ্রী বলতে চাচ্ছি; স্বাস্থ্য হয়ত বা এর আংশিক উপকরণ, কিন্তু সে স্বাস্থ্য ঠিক দেহের স্বাস্থ্য বলতে যা বুঝায়, তা নয়। এই মুখশ্রীর স্বরূপ কি ভাবতে গিয়ে আমার মনে হয়, মুখের উপর মনের যে ছাপ পড়ে, তাই মুখশ্রী। সাপের ফণা সুন্দর কিন্তু সুশ্রী নয়, কারণ হিংস্রতার ছাপ তাতে মাখানো। বাঘের মুখ সুন্দর তা'তে সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কি একটা উগ্রতা তাতে আছে যে, প্রাণ তা দেখে প্রসন্ন হয়ে ওঠে না।

মুখের ত্বক কোমল না হলে'ও, মনের কোমলতা অনেক মুখে সুপরিস্ফুট থাকায় তাকে শ্রীসম্পন্ন মনে হয়। স্নেহ, প্রীতি, দয়া, উদারতা প্রভৃতি শান্ত পবিত্র সুমনোভাবের আশ্রয়ে কুরূপার মুখেও যে ক্ষণিকের শ্রী ফুটে ওঠে, তা অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। সেদিনও কয়লাখাদের এক কুলী রমণীকে দেখে কুরূপের দৃষ্টান্তস্থল মনে হবার পরক্ষণেই, সে যখন তার কোলের কচি ছেলেটিকে নতমুখে স্তন্যপান করাতে আরম্ভ করলে, আমি তার মুখের সৌন্দর্য্যশ্রী দেখে চম্‌কে উঠ্‌লাম। দেখ্‌লাম সেই মলিন দর্পণেও মাতৃস্নেহের অপরূপ আলোকের প্রতিবিম্ব পড়ে' তাকে প্রকৃতই সুন্দর করে' তুলেছে। মনে আছে, অশ্রুভারাক্রান্ত এক ভিখারিণীকে দেখে যেদিন সুন্দরী মনে হয়েছিল, ঠিক পরের দিনই তাকে হাস্‌তে দেখে মনের মধ্যে বিরোধ জেগে উঠেছিল,—ভেবেছিলাম, একটি দিনে এর চেহারা এমন খারাপ কি করে' হল! বেদনার বিষণ্ণ-মুখশ্রীকে হাসি কি এম্‌নি করেই হাল্‌কা করে দিয়েছে?—অনেকেই লক্ষ্য করে থাক্‌বেন, শ্রী ও ধীশক্তিতে যে রমণীকে আজ পরমাসুন্দরী বলে' মনে হয়েছে, কাল কলহ করতে দেখে তারি কুৎসিত মুখশ্রীতে মনটা কি পরিমাণ আঘাত পেয়েছে।

যে সুরূপা নয়, তার রূপের প্রসাধনচেষ্টায় সঙ্গতি আছে, কেননা ঘন রং পাউডারে ফিকে হয়, ছোট চোখ কজ্জলে টানা দেখায়, কোন কোন কেশতৈলে নাকি টাকের উপরও চুলের বন্যার ঢেউ খেলে। কিন্তু প্রকৃত সুরূপারও প্রসাধনচেষ্টার অর্থ কি? আমি অনুমান করি, রূপ স্থানে শ্রীই আসল, আর সেই জন্যে নিজেকে শ্রী বলে' চালিয়ে দেবার চেষ্টাতেই রূপ প্রথমে প্রসাধনের আশ্রয় নিয়েছিল।

লজ্জার আশ্রয়ে গণ্ডে যে অপূর্ব্ব রক্তশ্রী ফুটে ওঠে, তাকেই অনুকরণ করতে গিয়ে সাদা পাউডারের উপর লাল রঙের ছোপ; স্নেহপ্রীতির নিবিড়তায় নয়ন পল্লবে যে কোমল ছায়া পড়ে, তাকেই মূর্ত্ত করবার চেষ্টায় চোখের কোলে কজ্জল।

কিন্তু বাহিরের কোন প্রসাধনে শ্রী আজও ধরা দেয়নি; তার প্রসাধন স্বতন্ত্র। সদ্‌বৃত্তি, কোমলতা, উদারতা, উচ্চচিন্তার অনুশীলন ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানই শ্রীর প্রসাধন। নিত্যনিয়ত সৎচেষ্টার সাহায্যে শ্রী অধিকতর উন্নত হয় তা নয়,—কুৎসিৎও সুন্দর হ'তে পারে, যা রূপ-প্রসাধনের রাজ্যে অসম্ভব। বুদ্ধ চৈতন্য কৃষ্ণ খৃষ্টের শ্রী নাকি অনুপম ছিল। সে কথা যে অলীক নয়, তার প্রমাণের একান্ত অভাব জগতে আজও হয়নি। প্রচুর শ্বেত শ্মশ্রুতেও রবীন্দ্রনাথের মুখের চিররহস্যময় যৌবন-স্বপ্ন শ্রী ঢাকতে পারে নি; শীর্ণতা ও বার্দ্ধক্য সত্বেও মহাত্মার মুখ বিরাট কোমল বিশ্বপ্রেমে পরম শ্রীমান। আমার মনে হয়, ভারতের নারীসমাজ বহুদিন পূর্ব্বেই প্রসাধনের এই রহস্য-টুকু ধরতে পেরে সীতাসাবিত্রীকেই সৌন্দর্য্যেরও আদর্শ বলে' মেনে আস্‌ছেন, আর আজও রূপমতী না লিখে' শ্রীমতী বলেই সই করে থাকেন। প্রসাধনের এই দিক্‌টার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিলে তাঁরা যে সত্যসত্যই শ্রীমতী আখ্যার যোগ্যতর অধিকারিণী হবেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে; অন্ততঃ অভিভাবকের অর্থব্যয় বাঁচিয়ে তাঁরা যে তাঁদের সমধিক শ্রদ্ধাভাগিনী হবেন, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

বিদায়ে।



জীবন-ঘাটের আধেক সোপান প্রায় ত হলাম পার,
যে ক'টা ধাপ রয়েছে আর বাকী,—
ভাঙন-ধরা শেওলা-পিছল তাও যে চারিধার—
পার হ'তে আর পারব সে ক'টা কি ?
দিনের আলো নিবিয়ে আসে ক্লান্ত আঁখির পাতে,
আস্‌ছে কানে কালো জলের ডাক ;
তবু আমায় ফিরতে বলিস্‌ তোদের খেলাঘরে,
ওরে পাগল, হাতছানি তোর রাখ্‌ !

(২)

প্রথম যেদিন তরুণ প্রাণের যাত্রা হ'ল সুরু,
সঙ্গে সেদিন কেউ ছিলনা আর ;
নূতন চলার আবেগভরে বক্ষ দুরু দুরু,
চক্ষে তরল দৃষ্টি সুষমার ;
কানের কাছে কোকিল ডাকে আকুল কলতানে,
ব্যাকুলতায় এগিয়ে চলে পা ;
দখিন বায়ু বুনো ফুলের গন্ধ বয়ে আনে,
কিছুই যেন নিষেধ মানে না।

(৩)

পথের মাঝে জুট্‌ল সাথী, কেউবা খানিক চলে'
সঙ্গ ছেড়ে এগিয়ে গেল আগে,
কেউ-বা কোথাও পড়্‌ল বসে' কিছুই নাহি বলে',
জানিনা কোন্ গোপন অনুরাগে !
কেউ বা চলে, কেউ-বা আসে, কেউ-বা ফেলে যায়,
সঙ্গী বলে' কারেও নাহি পাই ;
আপন বেগে চল্‌ছে চরণ চলার আকাঙ্ক্ষায়,
ফিরে' দেখি—সময় তারো নাই !

(৪)

প্রথম কুড়ির চাতাল পরে লাগ্‌ল নূতন নেশা,
পথের চেয়ে পথের সাথী পরে,
ফুলের গন্ধ যেন বা কার কেশের গন্ধে মেশা—
জড়িয়ে ধরে গভীর আবেশ ভরে।
চল্‌তে গিয়ে বসে' পড়ি, বস্‌তে গিয়ে চলি,
ভুল হয়ে যায় চলায় না-চলায়,
কানের কাছে বউ-কথা-কও প্রথম কথা বলি',
বলাতে চায় কোন্ সে অ-বলায় !

(৫)

এম্‌নিতর নেশার ঝোঁকে কাট্‌ল কতদিন,
হাতের সাথে হাতটি দিয়ে বাঁধা,

দুই কুড়ি ধাপ পেরিয়ে এলাম, দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ,
পায়ে পায়ে পাই যে শেষে বাধা !
পাখীর কণ্ঠ মিলিয়ে আসে ঝোড়ো হাওয়ার হাঁকে,
ফুলের গন্ধ মিলায় সে যে ধীরে ;
সঙ্গীজনের টুট্‌ল নেশা কালো জলের ডাকে,
চোখের দৃষ্টি মিলায় নদীনীরে।

(৬)

সম্মুখের ঐ চাতাল ভরি' নানা লোকের ভিড়—
মন্দিরেতে উঠ্‌ছে কলরব ;
চলার গতি সবার যেন আস্‌ছে হয়ে থির,
আসন নিতে ব্যস্ত দেখি সব ;
ঠেলাঠেলির কলধ্বনি উঠ্‌ছে চারিভিতে,
তারি মাঝে নদীর গরজন ;
নিরুৎসাহ মুর্ত্তিগুলি জাগায় শুধু চিতে
অর্দ্ধমৃতের চিত্র সুভীষণ।

(৭)

ঐ যেখানে ঢেউএর শেষে নদীর পরপারে—
ঝাপ্‌সা আঁখির দৃষ্টি-অন্তরালে,
অজানা ঐ আঁধার-ঘেরা অচিন বেড়ার ধারে
সন্ধ্যাবধূ তারার বাতি জ্বালে,—
ঐখানে ঐ সুদূর পারের নূতন পথের শেষে
মোর তরে কি বাজ্‌ছে সাঁঝের শাঁক !

এ পার—সে ত দেখাই গেল—যাব যে ঐ পারে—
যেখানে ঐ নীল মোহানার বাঁক!

(৮)

লাগ্‌ছে গায়ে শীতের হাওয়া, জাগ্‌ছে শিহরণ,
ভাব্‌ছি আজ এ জীবন-সীমানাতে—
নূতন সাথীর নূতন রূপটি কি মনোহরণ,
কি পরিচয় হবে বা তার সাথে!
যে ক'টা ধাপ রইল বাকী, হোক্ বা না হোক্ সারা,
পার পাব ত—যতই বাধা থাক্;
তোরা আমায় করিস্ ক্ষমা, ভালোবাসিস্ যারা,
পেছন থেকে দিস্‌নে আজ আর ডাক।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

অবাধ্য।

(গোড়ার কথা।)

সুশীল যখন আট বছরের ছেলে, তখন বাপ ম'য়ের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়।

দশমাসের সুশীলকে দাদামশাই ও দিদিমার কাছে রেখে আশুবাবু দূরদেশে চলে যান। সঙ্গে গিয়েছিল সুশীলের মা ও বড় ভাই। কি কারণে হঠাৎ তিনি বিদেশবাসী হলেন, তা' ভদ্রসমাজে প্রকাশ না করাই ভাল।

সুশীলের দাদামশাই ও দিদিমা অপুত্রক। কাজেই সুশীলকে পেয়ে তাঁদের হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খুলে গেল। সুশীল সেই স্নেহের নীড়ে আশ্রয় পেলে। সেখানে সে আদরযত্নের কোলে মানুষ হতে লাগ্‌ল।

বছরের পর বছর কেটে চল্‌ল। ক্রমেই আশুবাবু ও তাঁর স্ত্রীর দেশে ফের্‌বার দিন যতই ঘনিয়ে আস্‌ছিল, দিদিমার মন ততই একদিকে যেমন আনন্দে ভ'রে যাচ্ছিল, অপর দিকে তেমনি কিসের আতঙ্কে তাঁর বুকখানা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল—প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছিল। গভীর রাতে ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে চেপে ধরে চুমোর পর চুমো দিয়ে তাকে কাতর করে তুল্‌তেন; সুশীল কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ত কিনা জানিনা, কিন্তু এ স্নেহের পীড়ন সে অবাধে সহ্য কর্‌ত।

শেষে সুশীলের মা বাপ দেশে ফিরে এলেন। সুশীলকে তাঁরা সহর থেকে দিদিমার কাছ হ'তে গ্রামে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে

গেলেন। সুশীল অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল নিছক কৌতূহলের বশে মা বাপের সঙ্গে গেল। দিদিমার স্নেহাতুর মাতৃহৃদয় গোপন বেদনার ভারে নুয়ে পড়ল, বুকফাটা কান্নার চাপে কণ্ঠে স্বর ফুট্‌ল না, মুখ থেকে কথাটী পর্য্যন্ত বের হ'ল না; নীরবে নতমুখে ছেলেকে বিদায় দিলেন। সুশীল জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে দেখ্‌লে—তাদের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী, সদরমহল অন্দরমহল, বড় বড় বাগান—শান-বাঁধানো পুকুর। এ সবেতে কিন্তু তার মন বস্‌ছিল না। সুশীলের নতুন নতুন খেলার সাথী জুট্‌তে লাগ্‌ল—তার নিজের দুই ভাই এক বোন—পাড়ার কত ছেলে, তাদের কতরকমের খেলাধূলা হাসিগল্প। এতেও সুশীলের মন পাওয়া গেল না। সে সহরে দিদিমার সেই ছোট্ট বাড়ীখানিতেই ফিরে যেতে চায়। বাপ মা কত ক'রে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লে—সে বৃথা চেষ্টা। সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"হ্যাঁরে সুশীল, তুই নাকি চলে যাবি?" সুশীল উত্তর কর্‌লে "হাঁ, কল্‌কাতায় মায়ের কাছে যাব।" "আবার কবে আস্‌বি?" "আর আস্‌ব না।" "সে কিরে, তোর ভাইবোনের জন্যে, বাপমায়ের জন্যে মন কেমন কর্‌বেনা?" সুশীল এর কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে যেন কত অপ্রতিভ হ'য়েই চুপ ক'রে রইল।

সেদিন দিদিমার কি আনন্দ, যেদিন স্থির হ'য়ে গেল যে সুশীল দিদিমার কাছে থেকেই কলকাতায় স্কুলে পড়াশুনা কর্‌বে। আশু-বাবুর স্ত্রী স্বামীকে বল্লেন, "বেশ ত, ছেলেটাকে পর ক'রে দিলে?" "পর ক'রে দেব কেন? সুশীল এখনও ছেলেমানুষ, যার কাছে শিশুকাল থেকে মানুষ, তাকে ছাড়া কি থাক্‌তে পারে? বড় হ'লে জ্ঞান হ'লে কি আর অমনটা থাক্‌বে?" "কি জানি আমার কেমন

ভয় করে।" পাড়ার লোকেরা কানাকানি করলে—"আচ্ছা ভাই, বাপের পয়সাটাই বড় হ'ল, ছেলেটাকে পর ক'রে দিলে ?" "তোমরা মনে করছ ছেলেটা পর হ'য়ে যাবে—ভুলেও তা মনে স্থান দিও না। এ হ'ল বুদ্ধিমান লোকের 'পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙা'। ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'য়ে উপায় করতে শিখলে, তখন দেখবে বাপমায়ের কেমন আপনার হ'য়ে যাবে; দাদামশাই দিদিমার দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না।"

সুশীল স্কুলে লেখাপড়া শিখতে লাগল। লম্বা ছুটী পেলে সে বাপমায়ের কাছে এক একবার গিয়ে বেড়িয়ে আসত। ক্রমেই সে উচ্চ শ্রেণীতে প্রমোশ'ন পেলে। দাদামশাই ভাল private tutor খুঁজতে লাগলেন। দিদিমার এক ভাইপো এসে সুশীলের পড়াশোনা দেখবার ভার নিলে—অবশ্য বিনা বেতনে। নিকটেই কোন্ লেনে তাদের বাড়ী। সে একজন graduate। এখনকার দিনে graduate বলতে যা বোঝায়, হরেন মোটেই তা' নয়। যে বিশ্ববিদ্যালয়-কারখানা থেকে বৎসর বৎসর ছাপমারা graduate কাতারে কাতারে বেরিয়ে আসছে, graduate হরেনের জন্মস্থান অবশ্য সেইখানেই, কিন্তু তা'হ'লেও সাধারণ B. A. M. A.-দের সঙ্গে হরেনের আকাশপাতাল তফাৎ—সে সত্য সত্যই শিক্ষিত। তার ভাগ্যে জুটেছিল সেই সত্য শিক্ষা, যাতে স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়, এবং মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটে ওঠে। এই শিক্ষিত যুবক সুশীলের guardian tutor-এর মত তাকে দেখাশোনা করতে লাগল। এমন সময় দাদামশাই মারা গেলেন।

সুশীলের মা আশুবাবুকে বল্লেন—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম

কি যে, সুশীলকে এইবারে এইখানে নিয়ে এলে ভাল হয় না?” “কেন?” “সেখানে মা ত একা—বাড়ীতে কোন পুরুষ অভিভাবক নেই—সুশীল যদি লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয়, বদ্‌ছেলের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যায়?” “না গো না, সে ভয় করবার কোন কারণ নেই, সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে।” “তাহলেই হল। দেখ্‌ছ ত বড় ছেলেটা লেখাপড়া শিখলে না, আর তুমিও চেষ্টা করলে না; তা' নাহ'লে কি আর শিখ্‌ত না? কিছু না কিছু শিখ্‌ত বই কি? একটা পাশও নিদেন পক্ষে কর্‌তে পার্‌ত।” আশুবাবু এবার একটু গরম হয়েই বল্লেন—“পাশ ক'রে কি হবে? আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হবে?” সুশীলের মা বেশ একটু বিস্মিত হ'য়েই উত্তর কল্লেন—“কি বল্‌ছ তুমি?” “বল্‌ব আমার মাথামুণ্ডু—বল্‌তে কিছুই চাইনা আমি। দেখে নিয়ো পরে তোমার কোন্ ছেলে মানুষের মত হয়। লেখাপড়াই বল আর যা'ই বল, পয়সা উপায়ের জন্যেই ত সব? দেখে নিয়ো তোমার কোন্ ছেলে পয়সা উপায় ক'রে দশজনের একজন হয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে—তোমার বিদ্বান ছেলে কি মূর্খ ছেলে—সেটা দেখে নিয়ো।”

সুশীল যখন Matriculation পড়ে, তখন একদিন এমন একটী ঘটনা ঘট্‌ল, যা' যাদুদণ্ডের স্পর্শের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে হরেনের পুনঃ পুনঃ-বলা একটা কথাকে জীবন্ত ক'রে তুলে সুশীলের চক্ষের সাম্‌নে খাড়া করে ধর্‌লে। হরেন তার সঙ্গীদের প্রায়ই বল্‌ত—অনেক কিছুর অভাবে আমাদের জাতি আজ পতিত, তার মধ্যে সকলের চাইতে বড় এবং বেশী অভাব হচ্ছে—স্বাধীন চিন্তার অভাব। বর্ত্তমানে দেশের প্রতিভাবান ও ভাবুক পুরুষেরা এই কথাটাই

আমাদের বারবার বোঝাবার চেষ্টা ক'রছেন। সত্যই আমরা ভাবতে ভুলে গিয়েছি—নতুন কিছু চিন্তা ক'রতে হ'লেই আমরা শিউরে উঠি।

শনিবার দিন স্কুলে Debating Club-এ সুশীলের কোন সহপাঠী সীতাকে বনবাস দেওয়ার জন্যে রামচন্দ্রকে খুব বাহাদুরী দিচ্ছিল, নিজেও ছাত্র এবং শিক্ষকমণ্ডলী উভয়ের কাছ থেকেই বাহবা পাচ্ছিল। এমন সময় সুশীল উঠে প্রতিবাদ করলে। শিক্ষকেরা এর পূর্ব্বেও লক্ষ্য করেছিল সুশীলের নির্ভীক স্বভাব এবং কোন কোন বিষয়ে তার স্বাধীন উক্তি। তাহলেও বিশেষ কোন তিরস্কার তা'কে সহ্য করতে হয়নি, কেননা সে 'ভাল ছেলে'। কিন্তু আজ আর রক্ষা নেই—দেব-চরিত্রে দোষারোপ! ভগবানের লীলাখেলার নিন্দাবাদ! হেড্ মাষ্টার বিষম ক্রোধে চোখমুখ রক্তবর্ণ ক'রে, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে কর্কশ কণ্ঠে—"থাম থাম জ্যাঠা, ফাজিল over-ac ive কোথাকার" ইত্যাদি ব'লে তিরস্কার ক'রে তাকে বসিয়ে দিলেন। সুশীল তৎক্ষণাৎ Club হতে বেরিয়ে এল—আর কখনও ঢোকে নি।

সন্ধ্যাবেলা সুশীল হরেনকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা মামা, পাঁচ জনের কল্যাণের খাতিরে একজনের কল্যাণকে বিসর্জ্জন দেওয়া যেতে পারে কিনা? "যেতে পারেও বটে, আবার না পারেও বটে। কেন, কি হয়েছে?" "আজ Debating Club-এ রামচরিত্র আলোচনা হচ্ছিল"—ব'লে সুশীল সব কথা আগাগোড়া খুলে প্রকাশ করলে। হরেন মুচ্‌কে হাসলে—সে হাসিতে রাগেরও আমেজ ছিল। তারপরে বল্লে— "যাক্, ওরকম graduate"—সুশীল বাধা দিয়ে বল্লে "তিনি M A., B. L." "ত.ইত, ভদ্রলোক ওকালতি কল্লেই ভাল করতেন না? শিক্ষক সাজবার কি দরকার ছিল? আর ওঁর একারই বা দোষ দিই

কেন? পেটের দায়ে কত ভদ্রলোক ঐরকম শিক্ষকতার অভিনয় করছেন। যাক্‌গে ও কথা, এখন আসল কথা শোন। তুমি যদি দিদিমার শত বারণ না মেনে, আদৌ তাঁর মুখ না চেয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়, আর সেই অপরাধে তোমার নির্ব্বাসন-দণ্ড হয়, এবং তোমার বিরহ সহ্য করতে না পেরে দিদিমা মারাও যান—তাহ'লেও তোমার এতটুকুও অপরাধ নেই। কিন্তু তাই বলে রামের সীতা নির্ব্বাসন কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। প্রজারা সীতার চরিত্রে যে সন্দেহ ক'রেছিল, রামচন্দ্র ভালরূপেই জান্‌তেন সীতাচরিত্র তার কত উপরে; তবুও তিনি প্রজার সন্তোষের খাতিরে, রাজ্যে শান্তিরক্ষার জন্যে সত্যের অপমান করলেন। কিন্তু Victor Hugo-র Jean Valjean কি করেছিলেন? যখন তাঁর কানে গেল যে তাঁরই গা-ঢাকা দিয়ে থাকার ফলে একজন নিরীহ লোকের প্রাণদণ্ড হবার উপক্রম হ'য়েছে, তিনি তখনই মরণের মুখে ছুটে গেলেন সেই নিরপরাধীকে বাঁচাতে। তিনিও বেশ বুঝেছিলেন যে, তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে-তোলা যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান—যার উপর নির্ভর করছিল কত নরনারীর জীবিকা—তাঁর অবর্ত্তমানে তা' অচিরে ভেঙে পড়বে, এবং কত নরনারীকে অনশনে শুকিয়ে মরতে হবে। তবুও তিনি সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণই রেখেছিলেন। মাত্র একটী লোকের দাবী এতগুলা লোকের দাবীর চাপে মারা পড়েনি। তাইত বিচার কল্লেই বল্‌তে হয় যে, বাল্মীকীর রামচন্দ্রের চাইতে Victor Hugo-র Jean Valjean জীবনের ওই জায়গাটাতে বড় আদর্শের অনুসরণ ক'রেছিলেন।"

বিদ্যুৎগতিতে স্কুলের এই সংবাদ অতিরঞ্জিত হ'য়ে সুশীলের মা

বাপের কানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তাঁরা শুনলেন—সুশীলকে যে পড়ায়, যার সঙ্গে সে দিবারাত্র মেলামেশা করে, সেই যুবকটী ধর্ম্ম মানেনা, সমাজ মানেনা, মা বাপের অবাধ্য, একেবারে স্বেচ্ছাচারী। কাজেই সুশীল যে অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্‌বে, এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আশুবাবু তখনই কল্‌কাতায় এসে শাশুড়ীকে বোঝালেন—"আমরা স্বামী-স্ত্রীতে যা ভয় ক'রেছিলুম তাই হয়েছে—ছেলেটা অধঃপাতে যেতে বসেছে। আর একদণ্ডও ওকে এখানে রাখা উচিত নয়। তবে ওর পরীক্ষা নিকটেই, এখন স্কুল পরিবর্ত্তন করায় ওর নিজেরই ক্ষতি হবে। পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলেই ওকে এখান থেকে সরাব।" তারপরে সুশীলকে ডেকে কড়া সুরে তিরস্কার ক'রে, তাকে হরেনের সঙ্গে মেলামেশা করতে বিশেষ ক'রে বারণ ক'ল্লেন, এবং হরেনকেও দু একটা মৃদু শ্লেষোক্তি ক'রে বিদায় দিলেন। সুশীল 'হ্যাঁ' কি 'না' কোন উত্তর না দিয়ে, বাপ যা যা ব'লে গেলেন, নীরবে নতমুখে সব শুনে গেল।

শেষ কথা।

আশুবাবু অনেক টাকার মালিক হলেও, বিশেষ দায়ে না পড়লে খাওয়াপরা ছাড়া কোন কিছুতে এক পয়সাও ব্যয় করতে কেউ কখনও তাঁকে দেখে নি। ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে যাওয়া তাঁর মতে একটা বাজে খরচ। হিসেব করতে পারা আর চিঠি লিখতে পারা—এই হলেই যথেষ্ট হ'ল, কেননা তাহলেই তাঁর ব্যবসার কার্য্য বেশ চলে যাবে। কল্‌কাতা সহরে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি দেখে, তাদের মত দোকানদার হ'য়ে যাওয়াটাই জাতীয় উন্নতির একটা প্রশস্ত

পথ ব'লে যাঁরা গলাবাজী করে থাকেন, আশুবাবু তাঁদেরই শিষ্য। বড় ছেলেকে ব্যবসায় শেখাচ্ছেন। মেজ ছেলেটার পরীক্ষা হয়ে গেলেই তাকেও ঐ কার্য্যে ভর্ত্তি ক'রে দেবেন— এই তাঁর মতলব।

সুশীলের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আশুবাবু তাঁর মতলব খুলে বল্লেন। এ জায়গা ত্যাগ কিম্বা ব্যবসায় শিক্ষা কোনটাই তার দ্বারা হবে না; সে চায় লেখাপড়া শিখতে—সুশীল ধীর নম্রভাবে এই কথা বাপকে জানালে। আশুবাবু রেগে আগুন হ'য়ে, এই অবাধ্যতার জন্যে দিদিমা ও হরেনকে দায়ী ক'রে তাঁদের দুজনকেই শ্লেষোক্তি করতে লাগলেন। এর প্রতিবাদ করতে গেলে পাছে রাগের বশে পিতার অপমান ক'রে ফেলে, এই ভয়ে সুশীল কথাটা না ক'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

আশুবাবু বুঝলেন ছেলে তাঁর বাধ্য নয়। তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর স্ত্রী বল্লেন,—"তা বেশ ত, ছেলে যদি লেখাপড়া শিখতেই চায়, শিখুক না।" "দেখ তুমি মেয়ে-মানুষ, যা বোঝনা তাই নিয়ে কথা কইতে এস না।" বকুনি খেয়ে তিনি চুপ করলেন। আশুবাবু তাঁর এই দুঃখের ইতিহাস পরিচিত মাত্রকেই জানালেন। একদিন তাঁর অনুরোধে হেড্-মাষ্টার মশাই হরেনকে বেশ দু' কথা শুনিয়ে দেবার জন্যে তার বাড়ীতে এলেন। দুজনে কিছুক্ষণ এ কথা সে কথা হওয়ার পর, মাষ্টার মশাই হঠাৎ আজকালকার ছেলেদের অবাধ্যতার কথা তুললেন, তুলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বল্লেন,— "আপনার সুশীল যে পিতৃদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে।" হরেন মাষ্টারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। তাই সে এ অভিযোগের সরল উত্তর না দিয়ে বল্লে—"কি করব বলুন, এটা যে বিদ্রোহেরই যুগ। সুশীল সেই

যুগধর্ম্মেরই মানরক্ষা ক'রেছে।" "তাই বলে কি বিদ্রোহের দমন করতে হবে না?" "কি উপায়ে?" "সমাজের বাঁধন এখন আল্‌গা হ'য়ে গেছে। আবার কঠোর আইনে সমাজকে শক্ত ক'রে বাঁধুন দেখি, ছেলেরা কেমন অবাধ্য হ'তে পারে।" "অর্থাৎ আপনি চান ছেলেদের মানুষ না গ'ড়ে তুলে পোষা জানোয়ার বানিয়ে তুল্‌তে। তা' ত পারবেন না, মাষ্টার মশাই। অসম্ভব! যে বান ডেকেছে! আপনাদের 'সামাল' 'সামাল' চীৎকারই সার হবে। সাম্‌লাতে পারবেন না কিছুতেই—ভেসে যাবেই যাবে।" "আপনি তাহলে দেখছি বিপ্লব চান?" "হ্যাঁ, তাই চাই। আপনিই বা বিপ্লবের নামে আঁৎকে উঠচেন কেন? বিশ্ব-সভ্যতার বিকাশ ত বিপ্লবেরই মধ্য দিয়ে।"

এ সব কথা হেড-মাষ্টারের মনের মত না হ'লেও, প্রতিবাদ করার মত তাঁর পুঁজি না থাকায় তিনি চুপ ক'রেই রইলেন। যে উদ্দেশ্যে এলেন তা' যখন সফল হ'ল না, তখন তাঁর গলার চড়া সুর কোমল পর্দ্দায় নেমে এল। তিনি বেশ শান্ত সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন —"আচ্ছা হরেন বাবু, ও সব কথা ছেড়ে দিন; আমি বলি কি, পিতার প্রতি পুত্রের ত একটা কর্ত্তব্য আছে?" নিশ্চয় আছে"। "কিন্তু আমি যা শুনেছি তাতে মনে হয় সুশীল সে কর্ত্তব্য পালন করছে না।" "আপনি কি শুনেছেন?" "আমি শুনেছি আশুবাবু সুশীলকে যা করতে বলেছিলেন, তাতে তা'র ভালই হ'ত। অথচ"—হরেন বাধা দিয়ে বল্‌লে—"ভাল হ'ত? তার সর্ব্বনাশ হ'ত! ছেলের যে কিসে ভাল হয়, তা' এ সমাজের ক'জন বাপ জানেন? পয়সা উপায়, বিবাহ আর পরিবার পালন কল্লেই ত ছেলে একটা মানুষ হ'য়ে উঠেছে বলে

তাঁদের ধারণা। সুশীল চায় লেখা পড়া শিখ্‌তে, তার বাপ তাতে বাধা দিয়ে চান তাকে দোকানদার বানাতে। সুশীল তাতে কিছুতেই মত দেয়নি—এই তার অপরাধ। তার কর্ত্তব্যের ত্রুটি যে কোথায়, আমি ত খুঁজে পাই না। বাপের অর্থপিপাসার শান্তি কর্‌তে গিয়ে নিজের জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তি না ক'রে চিরকাল মূর্খ থাকাটা কারুর কোনমতেই কর্ত্তব্য হ'তে পারে না। বরং নিজেকে ও-ভাবে বঞ্চিত করা—পাপ। বাপের আদেশ—দিদিমাকে ত্যাগ কর্‌তে হবে। তাঁর ধারণা তাহ'লেই ও বাধ্য হবে। সুশীল তাতেও নারাজ। অতএব সুশীলের ভারী অন্যায়। বলে দিতে পারেন মাষ্টার মশাই, পিতা হ'লেই তার এত বড় অধিকার কোথা হ'তে আসে যে, পুত্রকে তার বিচারশক্তি, তার স্বাধীনতা, তার ভালমন্দ জ্ঞান, ন্যায়-অন্যায়বোধ সমস্তই পিতার খেয়ালের অথবা স্বার্থের পায়ে বলি দিতে হবে? যিনি সুশীলকে মানুষ ক'রেছেন—যিনি তার যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী—তাঁকে যদি সুশীল পিতার আদেশে সত্য সত্যই ত্যাগ ক'রে যায়, তবে সে যার পরিচয় দেবে তা কখনই পিতৃভক্তি নয়—তা' নিছক কৃতঘ্নতা। এ কথা স্বীকার কর্‌তে চান্ না তাঁরাই, যাঁদের পিতৃভক্তির মূলমন্ত্র হচ্ছে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্মা', যাঁরা পিতৃভক্তির আদর্শ রাখ্‌তে জঘন্য বর্ব্বরোচিত মাতৃহত্যারও অনুমোদন ক'রে থাকেন।" "আপনি কি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছেন, না নেবেন?" "কেন বলুন দেখি? সত্যি কথা বল্‌তে গেলেই বুঝি হয় ব্রাহ্ম না হয় খৃষ্টান হ'তে হবে?" "খৃষ্টানদের কথা আর কইবেন না। তারা আবার সত্যি কথা কয়? এত বড় ভুল বিশ্বাস আপনার কি ক'রে হ'ল জানি না। খৃষ্টানদের কাগজখানা পড়ে দেখবেন দেখি, তাতে হিন্দুদের কিরকম মিছামিছি

গালাগালি করে?" "তা করে বটে। কিন্তু সময় সময় আবার সত্যি কথাও বলে। যেমন একদিন একজন লিখেছিল মনে আছে—সে দেশ রসাতলে যাবে, যেখানে নারীজাতি ছেলেমেয়ে স্থষ্টির যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। শুন্‌তে কটু হ'লেও কথাটা বড় বেশী সত্যি না মাষ্টারমশাই?" হেড্-মাষ্টার জবাব না খুঁজে পেয়েও কথা চাপা দেবার জন্যে বল্লেন—"শুনেছিলুম আপনি নাকি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নেবেন?" "যা শুনেছিলেন সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর দীক্ষা নেবার আমার কি প্রয়োজন হ'ল, আমি নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।" "ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে গেলে"—হরেন বাধা দিয়ে বল্লে—"ধর্ম্মান্তর আবার কি? ধর্ম্ম ত এক। আমারও যা', আপনারও তা', মুসলমানেরও তা', খৃষ্টানেরও তা'—সকল দেশে সকল যুগে সকল মানুষের সেই একই ধর্ম্ম। তা' ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না।" "আপনি কোন্ ধর্ম্মের কথা বল্‌ছেন?" "আমি বল্‌ছি সত্যের পথে চলা আর মানবের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করাই ত ধর্ম্ম। আমরা ভিতরের এই সার তত্ত্বকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের খোসাকে নিয়েই হুড়োহুড়ি কোলাহল ক'রে মরছি। তাইতেই ত এতরকমের ধর্ম্মমত গড়ে উঠেছে। আর তারই ফলে ত কত না বাদবিসম্বাদ, কত না কাটাকাটি রক্তারক্তি। তবে এমন দিন আস্‌ছে—সেদিনের হাওয়া বইতে সুরু হ'য়েছে—যেদিন মানুষ সত্য-ধর্ম্মকে চিন্‌বে—ধর্ম্মান্তর ব'লে আর কিছু থাক্‌বে না।" হেড্-মাষ্টার দেখলেন গতিক ভাল নয়—তিনি যা শুনেছিলেন তা' বর্ণে বর্ণে সত্য। সত্যই এ যুবক ভগবান মানে না, ধর্ম্ম মানে না, সমাজ মানে না, শিক্ষা দীক্ষা কিছুই মানে না।

এত বড় নাস্তিক উচ্ছৃঙ্খল যুবক কখনও তাঁর চোখে পড়ে নি। তিনি আর বিশেষ কিছু না বলে বিদায় নিলেন।

সুশীলের বাপ হেড্‌মাষ্টারের মুখে সব কথা শুনে ত স্তম্ভিত! ছেলেটাকে এই বেলা বশে না আন্‌তে পার্‌লে ভবিষ্যতে ছেলেটাও ত ঐরকম কিম্ভূত কিমাকার জীব হ'য়ে উঠ্‌বে। আরও দু'একবার সুশীলকে ফেরাবার চেষ্টা কর্‌লেন। সুশীলের সেই একই উত্তর। আশুবাবু তখন নিরুপায় হ'য়ে গুরুদেবের শরণাপন্ন হ'লেন! গুরুদেব নাকি বড় বুদ্ধিমান। তাঁরই যুক্তিতে আশুবাবু কতবার কত মুস্কিলের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। শিষ্যবর্গকে উপদেশ দেবার খাতিরে তিনি সারাদিন আদালতে ঘুরে বেড়ান। কেননা মোকদ্দমা মামলায় তিনি পাকা ওস্তাদ। আপনার লোককে পর ক'রে দিয়ে পরকে আপনার করতে তাঁর মত মাথা ঘামাতে কাউকে দেখা যায় না। তিনি আশুবাবুকে যুক্তি দিলেন ছেলের বিবাহ দিতে। তিনি নিজেই ঘটকালী করে তাঁর এক ধনী শিষ্যের মেয়ের সঙ্গে সুশীলের বিবাহ স্থির কর্‌লেন। পাশ্‌করা ছেলে—দর অনেক টাকা, আশুবাবু দাঁও মার্‌বার আশায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলেন। কিন্তু যে বিয়ে কর্‌বে তার মত করাবে কে?—গুরুদেব নিজেই গেলেন। গুরুদেব কত শাস্ত্রবচন আওড়াতে লাগ্‌লেন—সুশীলকে সম্মত করাবার জন্যে। কিন্তু যা' উত্তর পেলেন, তাতে তাঁর পিত্তি অবধি জ্বলে উঠ্‌ল। অথচ রাগ প্রকাশ কর্‌লে ত চল্‌বে না। কাজেই ভিতরের রাগ সাবধানে ভিতরে চেপে রেখে বেশ প্রসন্ন মুখেই বল্লেন —"দেখ বাবা, তুমি শিক্ষিত; তোমাকে এ সব কথা বলাই বাহুল্য। পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের জীবনে একটা প্রধান কর্ত্তব্য। জানত

ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র, দ্বাপরে ভীষ্মদেব,—" "দেখুন ভীষ্মের ত্যাগস্বীকার খুবই বড়; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যকে সমর্থন করা যায় না। তাঁর অতবড় ত্যাগস্বীকারের কাছে তাঁর উদ্দেশ্যটা যেন লজ্জায় মুখ ঢেকে আছে। হলেনই বা বাপ—তাই ব'লে তাঁর অন্যায় অসংযমের পথ খোলসা ক'রে দিতে হবে?" "বাবা সুশীল, তোমার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটেছে। ভগবান তোমায় সুমতি দিন"—উদাসীনভাবে এই শুষ্ক আশীর্ব্বাদ ক'রে গুরুদেব চলে গেলেন।

হতাশ হ'য়ে গুরুদেব ফিরে এলে আশুবাবু ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—Rascal আপনারও অপমান ক'রেছে? আজ হ'তে সে আমার কেউ নয়!" "ছি বাবা, ওকথা বল্‌তে নেই। এখনও এক যুক্তি আছে ওকে ফেরাবার। দেখ বাবা! টাকা বড় জিনিষ। তা'কে গিয়ে ভয় দেখাও যে, এরকম অবাধ্য হ'লে বাপের বিষয়সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাক্‌বে না, দেখি ছেলে বশে আসে কি না।" আশুবাবুর অন্তরটা রাগের আগুনে তখনও টগ্‌বগ্ ক'রে ফুট্‌ছিল—বল্লেন "কিন্তু জান্‌বেন গুরুদেব! এততেও যদি ও পাজি নচ্ছার বাধ্য না হয় ত সত্যিই ও আমার ত্যজ্য পুত্র। এই আপনার পা ছুঁয়ে আমি শপথ কল্লুম।" গুরুদেব ত্রস্তব্যস্ত হ'য়ে দূরে সরে গিয়ে পরিতাপের সুরে বলে উঠলেন—"ছি ছি ছি বাবা, কি করলে! রাম! রাম! রাম! নারায়ণ! একি হ'ল ঠাকুর? যাক্ বাবা, রাগ না চণ্ডাল! এখন চল স্নান আহার ক'রে ঠাণ্ডা হবে চল।"

কিন্তু আশুবাবুর রাগ অত শীঘ্র ঠাণ্ডা হবার নয়। তিনি কল্‌কাতায় এসে সুশীলকে ডেকেই আরম্ভ করে দিলেন "পাজি নচ্ছার কোথাকার! এতখানি যে স্পর্দ্ধা হবে তোমার, তা' আমি স্বপ্নেও

ভাবিনি। তুমি এতদূর উৎসন্ন গিয়েছ, এমন অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হয়েছ যে, গুরুদেবকে পর্য্যন্ত অপমান করতে তোমার বাধ্‌ল না! আজ তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি মাত্র একটা কথা; তোমার কাছে জান্‌তে এসেছি—তুমি আমার বাধ্য হবে কিনা?" সুশীল ধীর নম্র ভাবে কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, আশুবাবু বাধা দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"কোন কথা শুনতে চাইনা আমি! তুমি আমায় এক কথায় বল—আমার বাধ্য হবে কিনা?" সুশীল তবুও কি জিজ্ঞাসা করতে গেল, আশুবাবু আবার চীৎকার ক'রে উঠলেন—"চোপ্‌রাও! আর একটা কথাও না। শুধু বল তুমি আমার বাধ্য হবে কিনা? বল 'হ্যাঁ' কি 'না'।" এবার বেশ শান্ত গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর এল 'না'। "না? আচ্ছা জেনো আজ হ'তে তুমি আমার কেউ নও—আমার বিষয়সম্পত্তির একটা কানাকড়িতেও তোমার এতটুকু অধিকার নেই—আর জীবনে কখনও আমার বাড়ীতে ভুলেও মাথা গলিও না।" আবার তেমনই শান্ত গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর এল "আচ্ছা।"

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কেদারাছায়ানট—যৎ।

——[∷●∷]——

তোমার ব্যথার দানে উঠ্‌ল ভরি' চিত্ত আমার যবে,
বল কার চরণে নিবেদিব এই সে ডালি তবে ?
আজি আকাশ বাতাস কুসুম লতা
গুঞ্জরে কোন্ ম্লান বারতা,—
কি অপরূপ ব্যথা জাগায় মর্ম্মরের রবে ?
যাতে ভ'রে ওঠে চিত্ত রাঙা ব্যথারই গরবে !

আজি ভুবন-জোড়া বেদন-তারে
রণিয়ে ওঠে বারে বারে,
তাই বুঝি মন আন্‌মনা আজ হাটের কলরবে ?
দিতে জীবন-বীণায় ব্যথার রাগে সাড়া উছল স্তবে !

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

———

চাষী



আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তার ভিত খোঁড়া হয়েছে লাঙ্গলের ফলায়। মানুষ যে-আদিতে অসভ্য যাযাবর ছিল, তার কারণ স্থিতি-শীল সভ্য হয়ে তার প্রাণে বাঁচবার উপায় ছিল না। অন্নের পশু ও পালিত পশুর অন্নের সন্ধানে তাকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিক্রম করতে হ'ত। পরিচিত ভূভাগ স্বল্পপশু ও তৃণবিরল হয়ে উঠলে, অজ্ঞাত দেশের দিকে পা বাড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা চল্‌তো না। কৃষির রহস্য আয়ত্ত করে' তবেই মানুষ এ ভবঘুরে অস্থিরতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। চাষের ক্ষেতকে কেন্দ্র করে' তারই চারপাশে গ্রাম, নগর, স্বদেশ, স্বরাজ্য গড়ে উঠেছে। এই সব স্থায়ী আবাসে চাষের অন্নের কৃপায় মানুষের মন, শরীরের একান্ত দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে, শিল্প ও সৌন্দর্য্য, ভাব ও জ্ঞানের বিচিত্র সৃষ্টিতে রত হয়েছে। তার কর্ম্মকুশলতা অজস্র ধারায় সহস্র পথ কেটে চলেছে। এই সভ্যতার জন্মের সন তারিখ ঠিক জানা নেই। কিন্তু মানুষ যেদিন চাষের ক্ষেতের কারখানায় দ্যাবা-পৃথিবী থেকে অন্ন চুঁয়িয়ে নেবার সজীব কলের সৃষ্টিকৌশল আবিষ্কার করেছে সেই দিনই এর জন্মদিন।

মাটির চাষ সভ্যতাকে বহন ক'রে এনেছে, কিন্তু সে সভ্যতা চাষীকে বহন করতে পারে নি। চাষী চিরদিনই সভ্যতার ভারবাহী মাত্র হয়ে আছে। সে হচ্ছে সভ্যতার মূল। মাটির নীচে থেকে রস

টেনে সে সভ্যতার ফুল ফোটাবে, ফল ধরাবে,—কিন্তু তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ সে কখনও জানবে না।

এর কারণ সভ্যতার জন্মকথার সঙ্গেই জড়ান রয়েছে। মানুষের যাযাবর জীবন ছিল সাম্য ও স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্য। জমিয়ে জমিয়ে অবাধে বাড়িয়ে তোলা যায়—ধনের এমন আকার ছিল না বলে', ধনী ও নির্ধনের উৎকট প্রভেদ তখন সম্ভব ছিল না। সমাজের এক ভাগ অন্য সকলের পরিশ্রমের ফলের মোটা অংশ ভোগ করবে, এ ব্যবস্থার উপায় ও অবসর অতি সামান্য ছিল, এ জন্য সমাজের মধ্যে দাসপ্রভু সম্বন্ধ গড়ে' উঠতে পারে নি। বহিঃপ্রকৃতির দাসত্ব সকলকেই এমন নিরবচ্ছিন্ন করতে হ'ত যে, সে দাসের দলের এক ভাগের আর প্রভু হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। চাষের জ্ঞানের ফলে মানুষ সে স্বর্গরাজ্য থেকে চ্যুত হয়েছে। মাটি যেদিন ধন হয়েছে, ও স্বর্গরাজ্যও সেইদিন মাটি হয়েছে। চাষের ফসলকে জীবনোপায় করার সঙ্গে সেই কৌশল মানুষের করায়ত্ত হয়েছে, যাতে একজন বহুজনকে অনাহারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে' খাটিয়ে নিতে পারে। আর তার ফল ক্রমে জমা ক'রে সে ক্ষমতাকে ক্রমে বাড়িয়ে চলতে পারে। যারা বলী ও কৌশলী, এ চেষ্টায় তাদের প্রলোভনও ছিল প্রচুর। যাযাবর জীবনে যারা অভ্যস্ত, চাষের পরিশ্রম তাদের কাছে বিস্বাদ ও অতিমাত্রায় ক্লেশকর। ক্ষুধার তাড়নায় গুরু শ্রম, আর তার শান্তিতে অখণ্ড আলস্য,—এই ছিল যাযাবর জীবনযাত্রার সাধারণ ধারা। এর তুলনায় চাষীর শ্রম কঠোরতায় লঘু, কিন্তু সে শ্রম প্রতিদিনের নিয়মিত পরিশ্রম,—অনভ্যস্তের কাছে যা সব চেয়ে পীড়াকর। সে পরিশ্রম করতে হয় বর্ত্তমানের ক্ষুধার তাড়নায় নয়, ভবিষ্যতের অনাহারের

আশঙ্কায়। কারণ সে পরিশ্রমে বর্ত্তমানের ক্ষুধানিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে এই অনভ্যস্ত, চিরফলপ্রসূ, নিয়ত পরিশ্রমের গুরুভার বলবান ও বুদ্ধিমান লোকেরা চিরদিনই দুর্ব্বল ও হীনবুদ্ধিদের কাঁধেই চাপিয়ে এসেছে।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে এর উদাহরণ ছড়ান রয়েছে। সভ্য গ্রীসের রাজ্যগুলিতে চাষী ছিল ক্রীতদাস; আর এ ব্যবস্থা ভিন্ন সভ্যতা কি করে' টিঁকে থাকতে পারে, গ্রীক পণ্ডিতেরা তা ভেবে পান নি। রোমান সভ্যতা সাম্রাজ্যের পথে পা দিতেই হাতের লাঙল তুলে দিয়েছিল দাসদের হাতে। ইউরোপের মধ্যযুগে ও রুশিয়াতে সেদিন পর্য্যন্ত চাষী ছিল নামে ও কাজে দাসেরই রূপান্তর। হিন্দুর শাস্ত্রে চাষের কাজ বৈশ্যের, অর্থাৎ আর্য্যের—যার বেদে অর্থাৎ বিদ্যায় অধিকার আছে। শাস্ত্রের কথা শাস্ত্রের পুঁথিতেই লেখা আছে, কিন্তু সুদূর অতীত থেকে চাষের লাঙল ঠেলছে শূদ্রে, যে শূদ্রকে "দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ংভুবা"—স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকর্ত্তা দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

মোট কথা ধনতন্ত্রের যেমন দুই দিক—ধনসৃষ্টি ও ধনবিভাগ; সভ্যতারও তেমনি দুই দিক—সৃষ্টি ও বিভাগ। শরীর ও মনের যা পুষ্টি ও সম্পদ, তার সৃষ্টির কাজে নানা সভ্যতার মধ্যে বড় ছোট, ভাল-মন্দ ভেদ আছে; কিন্তু বিভাগের কাজে সব সভ্যতার এক চাল। সভ্যতার সৃষ্টির বড় ও শ্রেষ্ঠ অংশ ভাগ হয় অল্প ক'জনার মধ্যে, যা অবশিষ্ট তাই থাকে বাকী সকলের জন্যে,—যদিও শ্রমের ভাগটা তাদেরই বেশী।

যে সভ্যতা নিজেকে আধুনিক বলে' গর্ব্ব করে, তার শ্রেষ্ঠত্বের

প্রধান দাবী এই যে, বিভাগের এই উৎকট বৈষম্য সে ক্রমে কমিয়ে আনছে। জ্ঞান ও রসের সৃষ্টিকে অল্প ক'জনার জন্যে তুলে না রেখে, যার শক্তি আছে তারই আয়ত্তের মধ্যে এনে দেবার সে নানা পথ কেটে দিচ্ছে। শরীরের জন্য যে বস্তুসম্ভার, তাকে ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান এবং স্বল্পভাগ্য ও সাধারণবুদ্ধি লোকের মধ্যে কেবল প্রয়োজনের মাপে বেঁটে দেওয়া সম্ভব না হ'লেও, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা প্রয়োজন তা থেকে যাতে কেউ না বঞ্চিত হয়,—সেদিকে তার চেষ্টার বিরাম নেই; এবং সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শকেও সে ক্রমে উঁচু দিকেই টেনে তুলছে। পূর্ব্বে যা ধনীর বিলাস ছিল, তাকে সে অল্পবিত্তের নিত্য ব্যবহার্য্য করেছে। তার জন্যে ধনীর ব্যসনের আয়োজন ও পরিমাণ কমাতে হয় নি, তা বরং বেড়েই চলেছে। তবুও যে এ কাজ সম্ভব হয়েছে, সে হচ্ছে বস্তুসৃষ্টির যে অভিনব কৌশল সে আবিষ্কার করেছে, তারই প্রয়োগ। এই কৌশলের বলে স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে, অল্প লোকে, অতি সামান্য সময়ে প্রয়োজন ও বিলাসের যে বৃহৎ সামগ্রীসম্ভার উৎপন্ন করতে পারে, ইতিপূর্ব্বে সমস্ত দেশব্যাপী লোকের বহুদিনের চেষ্টাতেও তা সম্ভব ছিল না। এই কৌশলের নাম 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্‌'।

আধুনিক 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল' সভ্যতার এই দাবী, তার জন্ম ও লীলাভূমি পশ্চিম ইউরোপে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে সত্য বলেই স্বীকার করতে হবে। সেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এখনও যতই পার্থক্য থাকুক, ধনিকের তুলনায় শ্রমিকের প্রয়োজন ও বিলাসের উপকরণের যোগান যতই নগণ্য হোক, এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের তুলনায় ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল যুগের সভ্যতার ভারবাহীরা অনেক বেশী

পরিমাণে সে সভ্যতার ফলভোগী হয়েছে। এ সভ্যতার যারা মাথায় রয়েছে, এ যে তাদের উদারতায় ঘটেছে তা নয়। যারা ধনে ও বুদ্ধিতে প্রবল, তারা নিজেদের লাভের লোভেই ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর গোড়াপত্তন করেছে। কিন্তু তার ফলে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে' উঠেছে তাতে ভারবাহীদের দল বাঁধবার সুযোগ ঘটেছে, এবং দলের চাপেই তারা ও-ফল আদায় করেছে। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এর সম্ভাবনা ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। নূতন সৃষ্টিকৌশলে যোগানের পরিমাণ যদি না বেড়ে যেত, তবে ধনিকের ভাণ্ডার খালি না করে শ্রমিকের থলি ভরান কিছুতেই চল্‌তো না।

কিন্তু ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল দেশগুলিতে দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে গোটা পৃথিবীর দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, চাষীকে নিয়ে প্রাক্‌-ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সভ্যতার যা সমস্যা, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্‌ তার কোনই সমাধান কর্‌তে পারে নি; সমস্যাটিকে এক পা দূরে হটিয়ে রেখেছে মাত্র। পূর্ব্ব যুগের সভ্যতা যে গোঁজামিল দিয়ে এর মীমাংসার চেষ্টা করতো, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সভ্যতা খুব ব্যাপকভাবে সেই গোঁজামিলই চালাতে চাচ্ছে।

সভ্যতার নিত্য সমস্যা হচ্ছে, জীবনের পুষ্টি ও আনন্দের যা উপ-করণ আবিষ্কার হয়েছে, কি করে' তা যথেষ্ট উৎপন্ন করে' সমাজের মধ্যে এমন করে বেঁটে দেওয়া যায়, যাতে প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে কেউ বাদ না পড়ে, অথচ উৎপাদনের কাজে বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগের আকর্ষণেরও অভাব না হয়; আর প্রকৃতি যাদের নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়ে জন্ম দিয়েছে, তাদের সেই শক্তিপ্রয়োগের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের কি করে' ব্যবস্থা করা যায়। এর একটির উপর নির্ভর

করে সভ্যতার স্থিতি, অন্যটির উপর তার বৃদ্ধি। এ পর্য্যন্ত কোনও সভ্যতা এ সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, সব সভ্যতা তার বোঝা চাপিয়েছে সমাজের একটা অংশের উপর, যাতে বাকী অংশটা ঐ পরিশ্রম থেকে মুক্ত হ'য়ে সভ্যতার ভোগ ও বৃদ্ধির যথেস্ট উপকরণ ও অবসর পায়। সব সভ্যতার অন্তরেই এই ভয় যে, ঐ পরিশ্রমের ভার সমাজের এক অংশের মাথা থেকে লাঘবের জন্য সকলের উপর ভাগ করে' দিলে, সভ্যতা সমাজের সকলের পক্ষেই বোঝা হয়ে উঠবে। ওর ভোগের উপাদান কারও ভাগ্যে জুটবে না, ওর বৃদ্ধির সংযোগ ও অবসর কারও ঘটবে না। কাজেই সভ্যতার স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য বলে হোক, ছলে হোক, সমাজের একদল লোককে তার ভারবাহী করতেই হবে, এবং খুব সম্ভব সে দল লোক হবে সংখ্যায় সব চেয়ে বড় দল।

ইনডষ্ট্রিয়াল যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক সভ্য সমাজে সভ্যতার এই ভারবাহীর দল ছিল চাষী। কারণ কৃষিই ছিল প্রতি সমাজের জীবিকার মূল উৎস। ইনডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, কৃষিকে বাদ দিয়ে এক নূতন ধরণের কারুশিল্পে সমাজের বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগ করলে তার ফল ফলে বেশী। কৃষি জীবিকার যে উপকরণ উৎপন্ন করে, সমান পরিশ্রমে এতে তার অনেক গুণ বেশী পাওয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপে এই ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে দেখা গেল যে, এই সমাজব্যবস্থায় সভ্যতার ভারবাহীদেরও অনেক পরিমাণে তার ফলভোগী করা কৃষিসভ্যতার তুলনায় সহজসাধ্য। কারণ এতে যে অল্প সময়ের পরিশ্রমে অনেক বেশী ফল লাভ হয় কেবল তাই নয়,

এ ব্যবস্থায় কৃষির জন্য দেশের অধিকাংশ লোককে দেশময় বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে থাক্‌তে হয় না, স্থানে স্থানে অল্প জায়গার মধ্যে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হয়। অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী না থেকে নগরবাসী হয়। এবং গ্রাম্য হ'ল সভ্যতার বোঝাবাহী বর্ব্বর, আর নাগরিক তার ফলভোগী বিদগ্ধজন। সহরের দলবদ্ধ লোকের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য যা' সহজসাধ্য, সারা দেশে ছড়ান চাষীর জন্য সে ব্যবস্থা অতি দুঃসাধ্য।

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের এই পরিণতিতে ইউরোপের অনেক সমাজ-হিতৈষী ভাবুক স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়েছেন। তাঁরা বল্‌ছেন এখন যদি ধনীর লাভের লোভ ও বিলাসের দাবী কমান যায়, এবং কাউকেও অলস থেকে পরের পরিশ্রমের ফলভোগ করতে না দিয়ে পরিশ্রমের ভার সকলের মধ্যে ভাগ করা যায়, তবে প্রত্যেক লোকের প্রতিদিন অল্প সময়ের পরিশ্রমেই সমাজের সকলের প্রয়োজন ও অল্পস্বল্প বিলাসের উপযোগী ধন উৎপন্ন হতে পারে। আর সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ ফল, সৃষ্টি-কৌশলীদের তার সৃষ্টির এবং অন্য সকলের তার রসগ্রহণের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের ব্যবস্থা হয়। সভ্যতার ভারবাহী হতভাগ্যের দল সমাজ থেকে লোপ পায়।

বিনা আগুনে এই অন্নপাক কি করে সম্ভব হবে? উত্তর অতি সহজ,—পরের আগুনের উপর পাকপাত্র চাপিয়ে। ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সমাজ চায় কৃষির পরিশ্রম ও তার আনুসঙ্গিক সমাজব্যবস্থার অসুবিধা থেকে নিজকে মুক্ত করতে। অথচ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের আদি ও অন্ত চাষীর পরিশ্রমের উপর নির্ভর করছে। তার শিল্পের উপাদানও যোগাবে কৃষি, বিনিময়ও যোগাবে কৃষি। সুতরাং ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সমাজ

থেকে কৃষির পরিশ্রম দূর করার অর্থ—অন্য সমাজের উপর সেই পরিশ্রম দ্বিগুণ করে চাপান, প্রতি সমাজে চাষীর যে সমস্যা ছিল, কতকগুলি সমাজ থেকে তা সরিয়ে অন্য কতকগুলি সমাজের ঘাড়ে তুলে দেওয়া ; পৃথিবীর প্রতি সভ্যদেশের একদল লোককে তার সভ্যতার ভারবাহী না করে', কতকগুলি সভ্যদেশের সভ্যতার ভার অন্য কতকগুলি দেশকে দিয়ে বহন করানো ; যে ছল ও বল প্রত্যেক সভ্য সমাজের একভাগ লোক অন্য ভাগের উপর প্রয়োগ করতো, সেই ছল ও বল আত্মীয়তার বাধা নিরপেক্ষ হয়ে মনুষ্যসমাজের একভাগের উপর প্রয়োগ করতে বাধ্য করা।

যাযাবর মানুষের সঙ্গে স্থিতিশীল কৃষিসভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটা বড় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। এই সংঘর্ষেই রোমান সভ্যতা ধ্বংশ হয়েছে, গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে, বগ্‌দাদের মুসলিম সভ্যতার বিলোপ ঘটেছে। ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ সেই সংঘর্ষেরই এক মূর্ত্তি। চাষের পরিশ্রম অস্বীকার করে' এও চাষীর পরিশ্রমের ফল লুট্‌তে চায়। যে ধন ও ধনী একে চালনা কর্‌ছে, তারাও মুখ্যত যাযাবর। এক দেশ থেকে অন্য দেশে, পৃথিবীর এক ভাগ থেকে অন্য ভাগে প্রয়োজনমত চলে বেড়াতে তাদের কিছুতেই বাধা নেই। এবং এর হাতে বিনিময়ের বাটকাড়া থাক্‌লেও, অন্য হাতে যাযাবরের শাণিত অস্ত্র বাহাল রয়েছে।

সভ্যতার যা সমস্যা, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ তার মীমাংসা নয় ; কারণ ও ব্যবস্থা মানুষের সমাজকে এক ক'রে দেখে না এবং দেখ্‌তে পারে না। মানুষের এক অংশকে ভারবাহীতে পরিণত না করে', সভ্যতাকে কেমন ক'রে বাঁচান ও বাড়ান যায়, সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ থেকে

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের এর কোনও উত্তর নেই। মানুষের সভ্যতার চরম সমস্যা হচ্ছে চাষী। যেদিন চাষীকে সভ্যতার ভারবাহীমাত্র না রেখে, ফলভোগী করা সম্ভব হবে, কেবল সেইদিন সভ্যতার সমস্যার যথার্থ মীমাংসা হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে প্রমাণ হবে গ্রীকপাণ্ডিত্যের কথাই সত্য,—দাসের শ্রম ভিন্ন সভ্যতার চাকা অচল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র (১)।*

শান্তিনিকেতন,

২২শে জুন, ১৯১৮।

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার ১৯শে জুন তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়টির সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝি, তাহা এই ঃ—

(১)

পশুপক্ষীদিগের জ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজন নাই; তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কারই তাহাদের গুরু।

(২)

মনুষ্যের অন্নবস্ত্রাদির অভাবমোচনের জন্য কৃষিবিদ্যা, বস্ত্রবয়ন-বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করা আবশ্যক; এবং আধ্যাত্মিক অভাবমোচনের জন্য আত্মা-বিষয়ক এবং পরমাত্মা-বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক।

---

* মহৎ হৃদয় সামান্য জিনিষেও আপনাকে প্রকাশ করে। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি, আমার বিশ্বাস তা সর্বসাধারণের উপভোগ্য। দ্বিতীয় পত্রখানিতে আত্মশক্তির উদ্বোধন সম্বন্ধে অল্প দু'চার কথায় তিনি যা বলেছেন, সেই জ্বলন্ত বাণী আমাদের মধ্যে নব চেতনা সঞ্চারিত করুক। অসীম করুণাময়, সদানন্দ মহর্ষি দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মরণে প্রণাম করে' এই ক'খানি চিঠি সকলের কাছে নিবেদন করছি।

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(৩)

শিক্ষা দুইরূপ, শুনিয়া শেখা এবং দেখিয়া শেখা। অন্নের ভিতর নানাপ্রকার পুষ্টিকর পদার্থ আছে, এটা আমাদের শুনিয়া শেখা; অন্নের ভিতর কতপ্রকার কি কি পুষ্টিকর পদার্থ আছে—রসায়ণবিৎ পণ্ডিতের তাহা দেখিয়া শেখা। শুনিয়া শেখা বিদ্যাকে বলা যায়—পরোক্ষ জ্ঞান; দেখিয়া শেখা বিদ্যাকে বলা যায়—অপরোক্ষ জ্ঞান।

(৪)

অপরোক্ষ জ্ঞান যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের এবং বর্ত্তমানকালের সাধুসজ্জনের নিকট হইতে শুনিয়া শেখা পরোক্ষ জ্ঞানের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়।

(৫)

আপনি চা'ন অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। তাহার একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান।

(৬)

সকলেই আমরা ন্যূনাধিক পরিমাণে আত্মাকে জানি। আদবেই যদি আমরা আত্মাকে না জানিতাম, তবে আত্মার অভাব-মোচনের জন্য আমাদের মাথাব্যথা হইত না; তাহা হইলে আপনিও আমাকে ১৯শে তারিখে পত্র লিখিতেন না, আমিও এ-পত্র লিখিতাম না। আত্মা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বস্তু, অথচ আত্মাকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা কম জানি, এইটিই আমাদের দুঃখ—একেবারেই যে জানিনা তাহা নহে।

(৭)

সমুচিত আত্মজ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বিতীয় উপায় নাই। আমরা যদি আমাদের নিকটতম এই আত্মাকে চৈতন্যময় আত্মারূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেই সঙ্গে আপনাতে এবং সর্ব্বজগতে চৈতন্যময় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে পারি। আপন আত্মাকে আমরা ছায়া-ছায়ারূপে বা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা রূপে দেখি বলিয়া পরমাত্মাকেও অন্ধ শক্তিরূপে দেখি।

* * * *

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর

পত্র (২)।

শান্তিনিকেতন,
১লা জুলাই, ১৯১৮।

সাদর নিবেদন—

আপনার ২৯শে জুন তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার সকল কথার সবিস্তরে উত্তর দিতে আজ পর্য্যন্ত কেহ পারিয়াছেন কি না, তাহা আমি জানিনা। আমি তাহার সম্বন্ধে যাহা সার বুঝি, তাহাই সংক্ষেপে বলি; বোধ করি তাহাতে আপনার আকাঙ্ক্ষা কতকটা মিটিতে পারিবে।

(১)

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

(২)

যাঁহার যে অবস্থা, তাহা কতক পরিমাণে তাঁহার অনুকূল, কতক পরিমাণে প্রতিকূল।

(৩)

এইরূপ অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া মনুষ্য নিতান্ত পশুবৎ অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্য হইতে সভ্যতর অবস্থায় ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনো অগ্রসর হইতেছে।

(৪)

অগ্রসর হইতেছে কিসের জোরে? নৌকা অগ্রসর হয় কিসের জোরে? দাঁড়ের জোরে এবং বায়ুর জোরে। মনুষ্য অগ্রসর

হইতেছে আত্মার প্রভাবে এবং পরমাত্মার প্রসাদে। বায়ু অদৃশ্য—দাঁড় দৃশ্য; তেম্নি পরমাত্মার প্রসাদ অব্যক্ত—আত্মপ্রভাব ব্যক্ত। আত্মপ্রভাব কি? না—আত্মশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি।

(৫)

মনুষ্য যদি আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইত—তুফানে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিত— তাহা হইলে মনুষ্য, হয় অনেককাল পূর্ব্বে মারা পড়িত, নয় বংশপরম্পরাক্রমে পশুদিগের ন্যায় মোহান্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

(৬)

ফলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য হাল ছাড়িয়া দেয় নাই—সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হয় নাই—ঈশ্বরদত্ত আত্ম-শক্তিকে কাজে খাটাইতে বিরত হয় নাই। বিজ্ঞান-বীরেরা আত্মশক্তি খাটাইয়া দূরতম নক্ষত্রগণের গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন, অদৃশ্য পরমাণু অপেক্ষা "কোটিগুণ সূক্ষ্মতর তড়িতাণুর" (Electron-এর) গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন; জীবশরীরের মধ্যে ব্যাধিজনক এবং আরোগ্যজনক জীবাণুদলের মধ্যে যেরূপ সংগ্রাম চলিতেছে তাহার গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন। ধর্ম্মবীরেরা আত্মশক্তি খাটাইয়া ইন্দ্রিয়-সংযম এবং রিপুদমনাদি করিয়া আত্মার নিগূঢ় তত্ত্বসকলের গুপ্ত সমাচার অবগত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, আত্মা পদ্ম-পত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় সুখদুঃখের মধ্যে থাকিয়াও সুখদুঃখ হইতে নির্লিপ্ত। আত্মার দর্শন পাওয়ার গুণে ইহাঁদের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

(৭)

প্রতিকূল অবস্থা মনুষ্যের প্রসুপ্ত ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইয়া তোলে—এই হিসাবে প্রতিকূল অবস্থাও অনুকূল অবস্থারই আর এক মূর্ত্তি। প্রতিকূল অবস্থা যদি না থাকিত, তবে মনুষ্যের ইচ্ছা-শক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিত।

আত্মশক্তির উদ্দীপন যে কত বড় মঙ্গল, তাহা আমরা জানিয়াও জানিনা। আমাদের আত্মশক্তি রীতিমত পরিস্ফুট হইলে আমাদের কোনো অভাবই থাকেনা। আপনার চৈতন্য না জানিলে যেমন অন্যের চৈতন্য জানা যায় না—তেমনি আপনার আত্মশক্তি না জানিলে পরমাত্মার আত্মশক্তির নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান জানা যায় না। আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে পরমাত্মার আত্মশক্তি—অর্থাৎ, জগৎব্যাপারে যে শক্তি খাটিতেছে সেই ঐশীশক্তি—কত বড় মঙ্গল তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

(৮)

আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল, তাহা যতক্ষণ না পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ততক্ষণ বুঝিতে পারা সম্ভবে না।

(৯)

গীতাশাস্ত্রে আছে "উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানং। নাত্মানং অবসাদয়েৎ" ॥ আত্মাদ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে—আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না। একবার যদি রাশি রাশি প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে আত্ম-শক্তিকে রীতিমত উদ্দীপন করিয়া তুলিতে আমি পারি বা তুমি পার, তবে

দেখিতে পাইবে যে, জাগ্রত আত্মশক্তির ন্যায় মঙ্গল জগতে আর কিছুই নাই। তাহা সকল রোগের মহৌষধ। তা শুধু না—আমার আপন আত্মশক্তি কত বড় মঙ্গল জানিতে পারিলে পরমাত্মার আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল, তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে না। আমাদের আপনার আত্মশক্তিকে আমরা যদি মনে করি যে, তাহা অতি সামান্য বস্তু—তাহা থা'ক্; আত্মশক্তি যেমন ঘুমাইতেছে ঘুমা'ক্; এখন আমার যাহাতে উন্নতি হয় তাহারই চেষ্টা দেখা যা'ক্—কতকগুলি টাকা সংগ্রহ করা যাক্ আগে, আত্মশক্তিকে জাগাইবার চেষ্টা দেখা যাইবে তাহার পরে; হীরাকে যদি মনে করি কাঁচের বেলোয়ারি - তবে আমরা আপনারই বা কি, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই বা কি—কিছুরই মধ্যে সার কিছুই পাইব না; সবই আমাদের নিকট অসার এবং অপদার্থ বলিয়া মনে হইবে। আমাদের আপনার আত্মশক্তি কত বড় মঙ্গল, তাহাই যদি আমরা না বুঝিতে পারি—তবে পরমাত্মা যে কত বড় মঙ্গল, তাহা আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব?

* * * * * *

আমি আপনি সাধনার পথে ততটা অগ্রসর হই নাই যে, অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি। মোটামুটি বলিতে পারি এই যে, Huxley, Mill প্রভৃতির গ্রন্থাবলীর পরিবর্ত্তে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সাধন সম্বন্ধে অনেক সার সার উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র (৩)।

শান্তি নিকেতন।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৩১।

কল্যানীয়েষু,—

*   *   *   *   *   *

* * গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা তাহার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে—একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই তোমার নিকট তাহা ঢাকা থাকিবে না। প্রথমেই রহিয়াছে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ওঁকার একটি মাত্র শব্দ, কিন্তু তাহার অর্থ সমস্ত জগৎ ছাড়াইয়া উঠিয়া পূর্ণব্রহ্মে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি ও সমস্তের মূলাধার সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম—ঐ একটি শব্দের মধ্যে সমস্তই সম্ভুক্ত রহিয়াছে। পত্রে সে সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিতে আমি অসমর্থ,—সেইজন্য তুমি এখানে আসিলে তোমাকে উপনিষৎ খুলিয়া তাহা আমি দেখাইয়া দিব। ওঁকারের এইরূপ নিগূঢ় অর্থ অন্তশ্চক্ষুর গোচরে আনিবার জন্য ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। পৃথিবী হইতে সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মোট বাঁধা রহিয়াছে। আমাদের এই সূর্য্য যেমন একাই সমস্ত সৌরজগতের সার সর্ব্বস্ব, তেমনি আদি সূর্য্য অর্থাৎ পরমাত্মার আদ্যাশক্তি সমস্ত জগতের সার সর্ব্বস্ব। তৎ

সবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গঃ—সেই আদ্যাশক্তি, তাহাই সর্ব্ব জগতের জ্ঞান প্রাণ এবং জ্যোতিঃ। তাঁহাকে ঋষিরা গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিতেন। এবং তাঁহার নিকট হইতেই সেই ধীশক্তি প্রার্থনা করিতেন যাহা মর্ত্ত্য জীবগণের মাথার মণি এবং সর্ব্বমঙ্গলের আকর।

এইটুকু আপাততঃ তোমাকে লিখিলাম, কিন্তু এর মধ্যে ঢের কথা লুকান রহিয়াছে—দেখা হইলে বলিব। * * * * *

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নাটোরের মহারাজ

—:*:—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের মৃতদেহের শেষ সংস্কারের পর আমরা পাঁচজন যখন শ্মশান থেকে ফিরছিলুম, তখন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ আমাদের বলেন যে, আজ বাঙলার শেষ ভদ্রলোককে আমরা হারালুম।

এই কথাই স্বর্গীয় মহারাজা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মনের কথা।

আমরা সকলেই ভদ্রলোক, অর্থাৎ—বাঙলায় যাকে ভদ্রশ্রেণী বলে, আমরা সকলেই সেই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু ভদ্রতা নামক গুণটি আমাদের সকলের মধ্যে সমান পরিস্ফুট নয়। ও বস্তুটি যে কি তা বলা কঠিন, যদিচ ও গুণের সাক্ষাৎ পেলে আমরা সকলেই তা চিন্‌তে পারি। গত নাটোরের মহারাজার চরিত্রে ও ব্যবহারে এ গুণটি এতই অসামান্য ছিল যে, তাঁকে বাঙলার শেষ ভদ্রলোক বলাটা অত্যুক্তি নয়।

আমরা এ যুগে ভদ্রতা নামক গুণের যতই কেন না আদর করি, আমাদের ভিতর সকলে সে গুণে গুণান্বিত হতে কোনরূপ চেষ্টা করেন্‌ না। ভারতবর্ষ থেকে নানারকম আর্ট দিন দিন লোপ পাচ্ছে। এবং এ কথাও আমরা সকলেই জানি যে, ভদ্রতা নামক জীবনের আর্টটাও আমরা অনেক অংশে হারিয়ে ফেলেছি। এর নানা কারণ আছে,

কিন্তু এর প্রধান কারণ হচ্ছে, ও চর্চ্চা করবার আমাদের প্রবৃত্তিও নেই, অবসরও নেই। আমরা ভাল লোক হতে পারি মন্দলোক হতে পারি; কিন্তু সৌজন্য গুণটিকে আমরা তেমন লোভনীয় মনে করিনে, বা তার যথার্থ চর্চ্চাও করিনে। সুতরাং যে জগদিন্দ্রনাথ সৌজন্যের অবতার ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে বাঙলা যে তার শেষ ভদ্রলোক হারালে, এ কথা বলায় মিথ্যা কথা বলা হয় না। অন্ততঃ তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা এ কথার কোনও প্রতিবাদ করবেন না। আর তাঁর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও বাঙলা দেশে কম নয়। কারণ যাঁর সঙ্গে তাঁর মাত্র দুদিনের পরিচয়, তিনিও মহারাজকে বন্ধু হিসেবেই দেখতে শিখেছিলেন। কারণ মহারাজ স্বভাবতই মানুষ মাত্রেরই সঙ্গে বন্ধু হিসেবে ব্যবহার করতেন। এই উদার অমায়িকতা আভিজাত্যেরই একটি বিশিষ্ট গুণ।

মহারাজের সকল ব্যবহার সকল কথাবার্ত্তার ভিতর যা বিশেষ করে ফুটে উঠত, সে হচ্ছে তাঁর আভিজাত্য।—আমরা এ যুগে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সকলেই অল্পবিস্তর ডিমোক্রাসির ভক্ত হয়ে উঠেছি। এ ভক্তিরও যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে, এবং কোন কোনও হিসেবে ডিমোক্রাসিই যথার্থ আদর্শ। কিন্তু এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জন-সাধারণের আর যা গুণ থাকুক না কেন, আভিজাত্য নামক গুণটি তাদের শরীরে নেই। আমরা আজও এতটা ডিমোক্রাট হয়ে উঠিনি যে, আভিজাত্যের মর্য্যাদা আমরা বুঝতে পারি নে। বড় ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই মানুষে আভিজাত্য লাভ করে না। সব ফুলই ফুটে ওঠবার জন্য অণুকূল অবস্থার অপেক্ষা রাখে। বাহিরের অবস্থা মানুষের ভিতরকার গুণকে ফুটিয়ে তোলবার সাহায্য করতে পারে অথবা বাধা দিতে পারে; কিন্তু যার প্রকৃতিতে যা নেই, তার সৃষ্টি

করতে পারে না। সুতরাং মহারাজার চরিত্রের যে গুণ তাঁর বন্ধুবান্ধবকে বিশেষ করে মুগ্ধ করত, সে গুণের বীজ তাঁর অন্তরেই নিহিত ছিল।

আমরা সকলেই ভদ্রলোক, ও সমাজে বাস করতে হলে আমরা সকলেই কতকপরিমাণে সৌজন্যের চর্চ্চা করতে বাধ্য এবং করেও থাকি। তবে যে গুণ ভদ্রসমাজ সামান্য—সে গুণ এ ক্ষেত্রে আমাদের পাঁচ জনের কাছে অসামান্য বলে ঠেকত কেন? এর কারণ তাঁর ব্যবহারের ভিতর এমন একটা অপূর্ব্ব শ্রী ছিল, যা আমাদের ব্যবহারের ভিতর নেই।

এই শ্রী জিনিষটি কি, তা কথায় বুঝিয়ে বলা কঠিন। বড় জোর একটা ইংরাজী কথার সাহায্যে বলতে পারি, এটি হচ্ছে একটি æsthetic quality। মহারাজার সকল কথায় সকল কাজে সকল ব্যবহারেই যা বিশেষ করে ফুটে উঠত, সে হচ্ছে তাঁর প্রকৃতির এই æsthetic ধর্ম্ম। শ্রী জিনিষটি হচ্ছে প্রাণের একটি ধর্ম্ম। ও বস্তু জড়জগতে নেই। তাই জড়পদার্থে যখন আমরা প্রাণের এইরূপ আরোপ করি, তখন তার নাম হয় পালিস। কিন্তু পালিসের চাকচিক্য চিরকালই বাইরের জিনিষই থেকে যায়, আর শ্রী জিনিষটি ভিতর থেকে বাইরে ফুটে বেরোয়।

মহারাজা নাটোর যে সঙ্গীতের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, এ কথা সর্ব্বলোক-বিদিত। এ বিষয়ে তিনি একজন বড় গুণীও ছিলেন। পাখোয়াজি হিসেবে তিনি বাঙলার ভিতর একজন অগ্রগণ্য গুণী ছিলেন। তাঁর চাইতে ঢের বড় ওস্তাদ পাখোয়াজি এ দেশে অবশ্য আছে, বিশেষত হিন্দুস্থানীদের মধ্যে। এই বড় বড় ওস্তাদরা পাখোয়াজে যেরকম ঝড় বইয়ে দিতে পারতেন, মেঘগর্জ্জন করতে

পারতেন—মহারাজার পক্ষে তা করা অসাধ্য ছিল। কিন্তু এ যন্ত্রে তাঁর তুল্য মিষ্টি হাত আর কারও ছিল না। এক কথায় তাঁর মৃদঙ্গ বাদনের ভিতর শ্রী নামক গুণটি পূর্ণমাত্রায় দেখা দিত।

বাজনায় তাঁর হাত যেমন মিষ্টি ছিল, আলাপে তাঁর মুখ তেমনি মিষ্টি ছিল। যাঁরা তাঁর যৌবন-সুহৃদ—তাঁরাই নর্ম্মসুহৃদ কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। সেকালে তাঁর কথাবার্ত্তার ভিতর যে রস ছিল, শুধু তাই নয়—তেজও পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁর প্রতি কথা একটি সরস সতেজ মনের পরিচয় দিত। আমি জীবনে এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত জগদিন্দ্রনাথের তুল্য সুরসিক দ্বিতীয় ব্যক্তি আর দেখি নি। সামান্য আলাপের ভিতরও যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—তা যিনি মহারাজার সঙ্গে কখনো মনখুলে আলাপ করেছেন, তিনিই তা জানেন।

সংসার-বিষবৃক্ষের যে কাব্যামৃতরসাস্বাদ ও সজ্জনের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে দুটিমাত্র অমৃতোপম ফল, এ কথা মহারাজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। ও-দুটি ফল সকলে ভোগ করবার অধিকারী নয়। কিন্তু জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন এ বিষয়ে একজন শ্রেষ্ঠ অধিকারী।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নবম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩২

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পেনাঙের পথে।



আমরা যে জাহাজে যাচ্ছিলুম সেটা হ'চ্ছে এই ধরণের:—সাম্‌নেটা দোতলা; উপরের তলায় জাহাজের যন্ত্রপাতি লোহালক্কড় দড়িদড়া এই সব ভরা ছিল, আর নীচের তলায় কতকগুলি ক্যাবিন, সেখানে খালাসীদের থাকবার জায়গা। এই সামনের অংশে যাত্রীদের থাকবার স্থান ছিল না। তার পরে হ'চ্ছে একতলা খোলা ডেক; সেখানে মাঝে একটু সরু পথ রেখে দু'ধারে ফাঁকা জায়গায় ভেড়ার পাল রাখা হ'য়েছে। তার পরে হ'চ্ছে জাহাজের মধ্যভাগটা; সেখানে সব নীচে ইঞ্জিন-ঘর, তার উপরে খোলা ডেকের সঙ্গে একতলায় কতকগুলো ক্যাবিন, সেখানে জাহাজের অফিসাররা কেউ কেউ থাকেন, আর কতকগুলি ক্যাবিন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে; তার উপরে প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন, আর প্রথম শ্রেণীর খাবার জায়গা, আর তার চারধারে খোলা ডেক; আবার তার উপরে হ'চ্ছে কাপ্তেনের ঘর, জাহাজ চালাবার চাকা, এই সব। এই মাঝের অংশের পরে আবার খানিকটা মাথা-খোলা খালি জায়গা—ডেক। এর তলায় সব মাল পোরা হয়; এইখানটায় ভেড়া ছাগলের জন্য শুখ্‌নো ঘাসের বোঝা, মুরগীর খাঁচা, একটা গুমটীর মতো ঘরে চীনে বাবুর্চ্চী-খানা, আর এক পাশে মস্ত একটা লোহার সিন্দুকের মতন, সেটা হ'চ্ছে ডেকযাত্রীদের জন্য উনুন। এই লোহার বাক্সের ভিতর পাথুরে

কয়লার আগুন দেওয়া হ'ত, বাক্সর ডালাটী তেতে উঠ্‌ত, সেইটে চাটুর মতন রুটী সেঁক্‌বার জন্য ব্যবহার হ'ত, আর ডালাটীর তিন চার জায়গায় গোল গোল ক'রে কাটা, তার উপর হাঁড়ী চড়িয়ে ভাত ডাল তরকারী সিদ্ধ করা যেত। বিস্তর যাত্রী বিছানা কম্বল বিছিয়ে এই খোলা ডেক দখল ক'রেছিল, কিন্তু মাঝসমুদ্রে ঝড়-তুফান হাওয়ায় পরে সবাইকে সেখান থেকে স'রে অন্য আশ্রয় নিতে হয়। যখন আকাশ পরিষ্কার থাক্‌ত, তখন রোদ্দুর আট্‌কাবার জন্য এই দু'ধারের খোলা ডেকের উপর ত্রিপলের শামিয়ানা টাঙানো হ'ত। পিছনের এই খোলা ডেকের পরে হ'চ্ছে জাহাজের পশ্চাদ্ভাগ— এটা সামনের মতন দোতলা; নীচের তলাটা—যেটা খোলা ডেকের সামিল—সেটা হ'চ্ছে একটা ছাতওয়ালা হল বিশেষ—এই জায়গাটা ডেক্‌-যাত্রীতে ভর্ত্তি; উপরের তলা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা, এখানেও বিস্তর ডেক্‌-যাত্রী যে যেখানে পেরেছে বিছানা বিছিয়ে একটু ক'রে জায়গা দখল ক'রে আছে। ঝড়ের সময় এই উপরতলার ডেক-যাত্রীদেরও নীচে এসে আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল। জাহাজে ডেক্‌-যাত্রীদের মিঠে জল দেবার জন্য একটা পাম্প্‌ ছিল, সকাল বিকেল দু'ঘণ্টা ক'রে সেই পাম্প্‌ কল খুলে রাখা হ'ত। পাম্প্‌টা ছিল জাহাজের সেই ওপাশে খালাসীদের ঘরের কাছে; এদিক থেকে ডেক-যাত্রীদের জলের দরকার হ'লে জাহাজের মাঝের ইঞ্জিনঘরের ভিতর দিয়ে, ভেড়া ছাগল পেরিয়ে, তবে তারা পাম্পের কাছে পৌঁছতে পারত। জল নেবার জন্য সরু-মুখ একরকম টিনের তুম্বী প্রায় সবাই ক'লকাতা থেকে সঙ্গে ক'রে এনেছিল।

ডেক-যাত্রীদের কথা এইবার একটু বলা যাক্‌। এদের মধ্যে

প্রথমেই চোখে প'ড়্‌ল চীনেদের। প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন চীনে ছিল, অধিকাংশই কাণ্টনের যাত্রী—হঙ্‌কঙে নাম্‌বে; তারা ক'লকাতায় বেশীর ভাগই মুচীর কাজ করে। ক'লকাতায় ছুতোরের কাজ যে সব চীনেরা করে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ শুনেছিলুম শাঙ্‌হাইয়ের লোক। চীনেরা আরাম, ভোগসুখ—যাকে বলে creature comforts—তা বেশ বোঝে। এরা ডেক-টিকিট কেনে, তাতে খাবারের দাম ধরা থাকে, হাত পুড়িয়ে রান্না করার ধার ধারে না, ষ্টীমার থেকেই এদের খাবার যোগায়। এদের জন্য চীনে রান্নাঘরের ব্যবস্থা আছে, তার কতকগুলো চীনে বাবুর্চ্চীও আছে। আর দু' একজন চীনে কেরাণীও থাকে, এদের চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

আমাদের জাহাজ তখনও গঙ্গাতেই র'য়েছে, রাত্রে বন্ধ ক্যাবিনে ঘুম হ'চ্ছে না; জাহাজে এই প্রথম রাত্রি, মনে ভাবছি উঠে ডেকে গিয়ে একটু পায়চারী ক'রে আসি,—এমন সময়ে চমৎকার বাঁশীর আওয়াজ কানে এল। এ বাষ্পযানের ভেঁপু নয়, একেবারে আমাদের দেশের বাঁশের বাঁশীর আওয়াজ। বিছানা থেকে উঠে আওয়াজ ধ'রে ক্যাবিনের পাশের সরু পথ দিয়ে গিয়ে দেখি যে, এই বাঁশী বাজ্‌ছে অন্য এক ক্যাবিনে—মস্ত বড় ক্যাবিন এটা, তাতে গোটা ছয় আট বাঙ্ক বা বিছানা; পরে বুঝলুম সেটা হ'চ্ছে চীনে কেরাণী আর বাবুর্চ্চীদের থাকবার জায়গা। রাত্রি প্রায় দশটা হবে তখন, কাজকর্ম্ম চুকিয়ে চীনেরা ঘুমতে যাবার আগে একটু আমোদপ্রমোদ ক'রছে। Chinaman at work খুব দেখেছি, Chinaman at play দেখবার এই প্রথম সুযোগ ঘট্‌ল। ক্যাবিনটার দরোজা খোলা, আমি সরু পথটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের রকমটা দেখ্‌তে লাগলুম।

এরা আড়চোখে দু' একবার আমার দিকে তাকালে, কিন্তু কিছু ব'ল্‌লে না। ক্যাবিনের মাঝে একটা ছোটো টেবিলের চারধারে বাঁশের মোড়া কুরসীতে ব'সে জন চারেকে মিলে কি একটা খেল্‌ছে—ছোটো ছোটো ডমিনো খেলার পাশার মতো কি নিয়ে; হয়তো সেটা আজকাল ইউরোপে আর আমেরিকায় যা খুব চ'লেছে, সেই "মা-জঙ্" খেলা হবে। অনেকেই কালো রেশমের থোকা-ঝোলানো লম্বা চীনে নল দিয়ে তামাক খাচ্ছে। খেলার মধ্যে গল্প গুজবও চ'লেছে, মাঝে মাঝে বোধহয় দান ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটু কলরবও উঠ্‌ছে। কোণে একটা উঁচু তেপায়ার মতন, তাতে একটা ছোটো তোলা উনুনের উপর চা-দানে চা ফুট্‌ছে, পাশে সবুজাভ চীনে মাটির দু'তিনটে ছোট্ট ছোট্ট পেয়ালা—একটী পেয়ালায় দু' তিন ঢোকের বেশী পানীয় ধ'রতে পারে না, বিলিতী liqueur glass ব'ল্‌লেই হয়। খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন না একজন মাঝে মাঝে উঠে এসে একটু ক'রে ফুটন্ত চা পেয়ালায় ঢেলে খেয়ে যাচ্ছে। বড্ড গরম, তায় ক্যাবিনের ভিতর,—প্রায় সকলেরই কোমর পর্য্যন্ত গা খোলা। ক্যাবিনের বিছানাগুলিতে এক একজন চীনে শুয়ে বা আধশোয়া হ'য়ে আছে—একজন নীচের বাঙ্কে পা ঝুলিয়ে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে—লম্বা তল্‌তা বাঁশের মতো পাত্‌লা বাঁশের বাঁশী, তাতে কালো আর লাল রেশমের গোছা বাঁধা; আর একজন চীনে, সারেঙীর মত একটা যন্ত্র,—অতি অল্পসংখ্যক তার তাতে আর বেজায় কর্কশ ধ্বনি তার,—সেইটা নিয়ে বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গত ক'র্‌ছে। জন দুই এই সব হট্টগোলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বই প'ড়্‌ছে—চীনে বই—বেশ নিবিষ্টচিত্তে প'ড়ছে দেখলুম। ক্যাবিনের একদিকে দেয়ালে লম্বা লালরঙের একটা

কাগজে কালো চীনে কালীতে তিন চারটে চীনে হরফ লেখা র'য়েছে দেখলুম—কোনও শুভ বচন হবে। ভীষণ গরম, ক্যাবিনের ভিতর আর বাইরে চীনে তামাকের উৎকট গন্ধ, কথাবার্ত্তার কলরব, দূরে ষ্টীমারের বাইরে গঙ্গার উপর সমাগত নৌকার মাঝিদের চেঁচামেচি, এই সব ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে বাঁশীর তানটুকু উঠ্‌ছিল—সুরটা একঘেয়ে হ'লেও বেশ মিস্টি আর করুণ লাগ্‌ল। মোটের উপর এই চীনে বাবুর্চ্চীদের আমোদে চিত্তবিনোদনে একটা উঁচুধরণের cul-ture-এর হাওয়া আছে ব'লে মনে হ'ল।

তখন নোতুন চীনা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হ'য়েছে, মাঞ্চু রাজারা আর সিংহাসনে নেই। চীনে যাত্রীরা প্রায় সবাই হ'চ্ছে নিম্নশ্রেণীর লোক—জুতাওয়ালা, ছোটোখাটো ব্যবসাদার, ফেরিওয়ালা। দু' চার জনের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দী বাঙ্‌লা ইংরিজিতে আলাপ ক'র্‌লুম। চীনা রিপাব্‌লিকের কথা—"চুঙ্‌-হুবা" অর্থাৎ মধ্য দেশ, পুষ্পদেশ—চীনের "মিঙ্‌-কোয়" অর্থাৎ গণ-রাষ্ট্রের কথা সকলেই খুব ফুর্ত্তির সঙ্গে, খুব গর্ব্বের সঙ্গে উল্লেখ ক'রলে। এরা প্রায় সকলেই দখিনে চীনে। মাঞ্চু রাজবংশের উপর এদের জাতক্রোধ। গায়ের শক্তিতে, চেহারার লম্বাই চওড়াইয়ে উত্তরের চীনেদের চেয়ে খাটো হ'লেও, বুদ্ধিতে এরা খুব দড়, আর এরা যে বড্ড গোঁয়ার-প্রকৃতির, তাও প'ড়েছিলুম। এদের দুর্দ্ধর্ষতার দু' একটী প্রমাণ জাহাজেই পাওয়া গেল।

পিছনের দিকের উপরের দোতলা ডেকে বহু যাত্রী আশ্রয় নিয়েছে। কতকগুলি তথা-কথিত নীচ জাতির পাঞ্জাবী—চুহড়া—আর কতকগুলি শিখ আর পাঞ্জাবী মুসলমান, যে যেখানে পেরেছে কম্বল বা গুণচটের

বিছানা পেতে শুয়ে আছে। এই দোতলা ডেকটীর মাঝখানটা হ'চ্ছে জাহাজের যন্ত্রপাতি, লঙ্গরের মোটা শিক্‌লী, কপিকল, ক্যাপ্‌স্‌ট্যান্‌ প্রভৃতিতে সমাকুল। তার মধ্যে মধ্যে যেখানে একটু খালি জায়গা আছে, সেখানেই এক একজন মোটঘাট বসিয়ে স্থান সংগ্রহ ক'রে নিয়েছে। কতকগুলি চীনা "হ্যামক্‌" বা দড়ীর ঝোলা টাঙিয়ে তার ভিতর শুয়ে র'য়েছে, আর কতকগুলি বাঁশের বেঞ্চি পেতে বিছানা বানিয়ে নিয়েছে। এরি মধ্যে এক পাঞ্জাবী মুসলমান ফৌজী লোক, ছ'ফুটের উপর ঢ্যাঙা হবে, নিজের স্ত্রীর আর নিজের জন্য জায়গা ক'রে নিয়েছে। স্ত্রীটী হ'চ্ছেন পর্দ্দানশীন। একখানা দড়ির চারপাই খাট উপরে তুলে নিয়ে মিঞাসাহেব স্ত্রীর জন্য জায়গা ক'রেছে, আর একটা মশারি টাঙিয়ে দিয়ে বিবির আব্রু রক্ষা ক'রেছে। খোলা সমুদ্রের হাওয়ায় প'ড়ে মশারি প্রতি মুহূর্ত্তে দড়ি ছিঁড়ে উড়ে পালাবার চেষ্টায় আছে, তাই তাকে তলায় দড়ি-দড়া দিয়ে ইঁট বেঁধে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হ'য়েছে। পরে জোর ঝ'ড়ো বাতাসে মশারি ঢাকা দিয়ে আব্রু রাখা আর সম্ভবপর হয় নি—সেটা হচ্ছে পরেকার কথা। যাক্‌, খোলা সমুদ্রে জাহাজের দুলুনি আরম্ভ হ'য়েছে। পাঞ্জাবী বীরেরা চক্কর খেয়েছেন, সকলেই করুণ, হাস্যোদ্দীপক মুখ ক'রে শুয়ে প'ড়ে আছেন, মাঝে মাঝে উঠে ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে বা ব'সে পা ঘ'ষে ঘ'ষে ডেকের রেলিঙের ধারে গিয়ে বমি ক'রে আস্‌ছেন। আমার এই প্রথম সমুদ্রযাত্রায় সৌভাগ্যক্রমে চক্কর লাগার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলুম, তাই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে দেখ্‌ছিলুম। এখন এই উপরের ডেকে গিয়ে দেখি, ফৌজী পাঞ্জাবী এক কম্বল পেতে শুয়ে আছে, তার সাজা তামাক বেকার হ'য়ে

গড়গড়ায় পুড়ে যাচ্ছে—তার স্ত্রী মশারির পর্দ্দার মধ্যে খাটিয়ায় ব'সে আছে,—আশেপাশে চীনে, পাঞ্জাবী। একটী চীনে লোক শুয়েছিল জাহাজের একটা উঁচু জায়গায়। তার ভালো ক'রে পা ছড়িয়ে শোবার সুবিধা হ'চ্ছিল না, কারণ সেই উঁচু জায়গাটীতে অন্য কার একটী টিনের কানেস্তারা ছিল। হঠাৎ চীনেটী সেই কানেস্তারায় একটা লাথি মেরে সেটীকে নীচে ফেলে দিলে, তারপর বেপরোয়া হ'য়ে দিব্যি পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে শোবার চেষ্টা ক'রলে। কানেস্তারাটী ছিল ফৌজী পাঞ্জাবীর; সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বল্‌লে—"এই, ইয়ে মেরী চীজ হ্যায়, তুম্‌নে কেঁ‍্যা ইসে নীচে গিরায়া।" ব'লে উঠে জিনিসটী তুলে, যথাস্থানে রেখে দিয়ে আবার এসে শুলো। চীনেম্যান চুপ ক'রে দেখলে, পাও সরিয়ে নিলে, কিন্তু যেই পাঞ্জাবী শুয়েছে, অম্‌নি আবার লাথি মেরে কানেস্তারাটা ফেলে দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা হিন্দুস্থানীতে অশ্রাব্য ভাষায় পাঞ্জাবীকে গালাগালি দিলে। তাতে পাঞ্জাবীও হিন্দুস্থানীতে তার উপযুক্ত জবাব দিয়ে, টল্‌তে টল্‌তে উঠে, জোর ক'রে জিনিসটা রাখলে। তারপর চীনেটীকে একবার বেশ ক'রে দেখে নিয়ে, গড়গড় ক'রে চীনে ভাষায় তার সঙ্গে তক্‌রার করতে লাগল। দেখলুম দুজনের খুব ঝগড়া বাধ্‌ল চীনে ভাষায়। আশেপাশে, ঝোলা বিছানা থেকে, ডেক থেকে, বেঞ্চি থেকে চীনেরা মাথা তুলে দেখতে লাগল। খোলা হাওয়া, রোদ্দুর, চারদিকে অনন্ত দিক্‌চক্রবাল,—এর মধ্যে দুল্‌তে দুল্‌তে জাহাজ চলেছে—আর সেই জাহাজের মধ্যে এই দুটী প্রাচীন জাতের প্রতিনিধি এইরকম ঝগড়া লাগালে। মিনিট দুই ঝগড়ার পর হঠাৎ চীনেম্যানটী একটী বাঁশের টুল তুলে পাঞ্জাবীকে মারবার জন্য

ওঠালে। পাঞ্জাবী সেটাকে ধ'রে ফেল্‌তেই চীনেম্যান একেবারে "বেঙ্‌-তড়্‌কা" লাফে লাফিয়ে উঠে, দু'হাত দিয়ে পাঞ্জাবীর টুঁটী চেপে ধরলে, পাঞ্জাবী পাঁচ সেকেণ্ডের জন্য কাবু হ'য়ে রইল। এই সব ব্যাপার যেন চক্ষের নিমেষের মধ্যে ঘট্‌ল। আমি অবাক্ হ'য়ে এই লম্বা চওড়া ছ' ফুট ঢ্যাঙা পাঞ্জাবী জোয়ানের সঙ্গে পাঁচ ফুট খর্ব্বাকৃতি চীনেম্যানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখতে লাগলুম। আশপাশ থেকে চীনেরা তাদের জাত-ভাইকে উৎসাহিত ক'রতে লাগ্‌ল। পাঞ্জাবীর স্ত্রী তার মশারির পর্দ্দার ভিতর থেকে খুব তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—ভয়ে নয়। অন্য পাঞ্জাবী সকলে চক্কর লাগার দরুণ কাতর, তারা যাকে ইংরিজিতে বলে languid interest, সেই ক্ষীণভাবের গরজে-পড়া দরদ দেখিয়ে তাকাতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবী দুই ধাক্কা দিয়ে চীনেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে,—চীনে তখন হাতের কাছে ছোটো একটা লাঠী কি যা কিছু একটা পেয়েছে সেইটে নিয়ে আক্রমণ করবার জন্য আবার তেড়ে আস্‌ছে। পাঞ্জাবীটা তার জাতভাইদের দিকে চেয়ে—"লাক্‌ড়ী লাও, লাক্‌ড়ী লাও"—অর্থাৎ "লাঠী দাও, লাঠী দাও" ক'র্‌তে কর্‌তে এগিয়ে গিয়ে চীনের ঘাড়টা বাঁ হাতে ধ'রে তার পিঠে কাঁধে দুম্‌-দাম্ ক'রে বজ্রমুষ্টি লাগাতে আরম্ভ করলে। দুজনে ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি, চেঁচামেচি; চীনেরা দু-চার জনে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াল, কিন্তু কেউ এগোতে সাহস ক'রলে না। ইতি-মধ্যে গোলমালে জাহাজের এক ইংরেজ অফিসার এসে প'ড়ল। সে আস্‌তেই সব চুপ। চীনেম্যান এর মধ্যে বেশ মারটাই খেয়েছে, সে আর বেশী ঘাঁটাতে চাইলে না, সাহেবকে আস্‌তে দেখে নিজে আস্তে আস্তে স'রে গেল সেই ডেক থেকে। ইংরেজ আস্‌তেই আমাদের

পাঞ্জাবী খাড়া দাঁড়িয়ে ফৌজী কায়দায় তাকে সেলাম ক'রলে, আর ভাঙা ইংরিজিতে ব'ল্‌লে—"সার্, দিস্ চায়্নামায়ন্, ওয়েরী বায়্ড্ মায়ন্, মায় থিঙ্গ সাটে হিয়ার, হি কিক্ মায়্ থিঙ্গ, হি এবিউজ্ মি, আয়্ আয়্ম্ হাওইল্‌দার হাঙ্‌কাঙ্ মিলিটারী পোলিস্"। তাকে থামিয়ে দিয়ে সাহেব হুকুম দিলে, "তুম ইয়ে তুম্‌হারা ক্যানিষ্টার হটাও।" সেলাম বাজিয়ে সে তখনি তার জিনিষ সরিয়ে নিলে। ইংরেজ অফিসারের পিছন পিছন চীনে কেরাণী এসেছিল, তাকে আস্তে আস্তে কি ব'ল্‌লে, তাতে সে "অল্ লাইট্, অল্ লাইট্" ব'লে চ'লে গেল। ব্যাপারটা এইখানেই সাঙ্গ হ'ল।

ডাক্তারবাবুর কাছে শুন্‌লুম, এই চীনেরা মারমারি করতে খুবই পটু, আর রাগ হ'লে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'য়ে হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে মেরে বসে। প্রত্যেক জাহাজে এইরকম ছোটোখাটো মারামারি এরা অন্য জাতের লোকের সঙ্গে তো করেই—পাঞ্জাবীদের হাতে মাঝে মাঝে মার খায়ও বেশ—কিন্তু দমে না; আর আপোষে জুয়ো খেল্‌তে খেল্‌তেও মারামারি করে। মালয় অঞ্চলে দক্ষিণ চীন, হঙ্-কঙ্ আময় প্রভৃতি বন্দর থেকে বিস্তর চীনে কুলি প্রতি বৎসর যাওয়া-আসা করে, তখন জাহাজের অফিসারদের খুব সতর্ক থাক্‌তে হয়। দাঙ্গাফাসাদের জন্য ৩০।৪০ জনকে কখনো কখনো হাতকড়া লাগিয়ে বেঁধে রাখ্‌তে হয়। সময় সময় নাকি পিস্তলও দেখাতে হয়। এদের রকমসকম দেখে সেটা অসম্ভব বলে মনে হয় না। জাহাজযাত্রী চীনে আর জাহাজযাত্রী ভারতীয় ডেক-প্যাসেঞ্জারদের আমার ক'লকাতা-পেনাঙ যাওয়া-আসার আট দিন আট দিন ষোলো দিন যা দেখেছি, তাতে পূর্ব্ব-এসিয়ার কতকগুলি জটিল সমস্যার একটি দিক

আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা ক'রবো।

আগেই ব'লেছি যে চীনেরা creature comforts বেশ বোঝে। এরা জাহাজে সফর করে, গরীব শ্রেণীর লোক, ডেক যাত্রী,—গোঁড়া হিঁদুর মত চাল চিঁড়ে ছাতু বেঁধে নিয়ে নয়, বা মুসলমানের মতো হাত পুড়িয়ে রেঁধে নয়। এরা ডেকের যাত্রী হ'লেও খাওয়ার ব্যবস্থাটা পাকা ক'রে বেরোয়, টিকিটের দামের সঙ্গে খাবার খরচও ধ'রে দেয়। জাহাজে তাই বাবুর্চ্চীখানা আছে, তা'থেকে এদের সকালে বিকেলে দু'বার খাবার দেওয়া হয়। দেখ্‌তুম, চীনে যাত্রী সারাক্ষণ তার কম্বলের ভিতর বা ঝোলা বিছানার ভিতর বা বেতের চেয়ারের মধ্যে শুয়ে ব'সেই কাটাচ্ছে—বেশী বেড়াতে চেড়াতে এদের দেখতুম না—পরস্পর কথবার্ত্তা ব'ল্‌ছে, গল্পগুজব চালাচ্ছে, বই প'ড়ছে, বাঁশী বাজাচ্ছে, কখনো কখনো সারেঙ্গীর মতো যন্ত্র একটা কঁ্যা-কো' ক'রছে। কিন্তু সকাল দশটায় আর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় যেই বাবুর্চ্চীখানা থেকে বাল্‌তি ক'রে ভাত আর চীনে মাটির বাসন ক'রে নানা চীনে তরকারীব্যঞ্জন নিয়ে বাবুর্চ্চীরা উপরের ডেকের "চীনে-পাড়ায়" উপস্থিত হ'ত, অম্‌নি একটা সাড়া প'ড়ে যেত, চারদিকে যত চীনেম্যান সব জেগে উঠ্‌ত—গা ঝেড়ে দাঁড়িয়ে পড়্‌ত সবাই—একটা টেবিলের চারদিকে বাঁশের টুল চেয়ার সব টেনে এনে ব'সে যেত। চীনেদের খাওয়ার রীতি আমি দেখতুম—কেমন ক'রে ভাতের বাটীটা বাঁ হাতে ধ'রে মুখের কাছে এনে, ডান হাতে দুটো বড়ো কাঠী ধরে' ভাত সরিয়ে সরিয়ে মুখের ভিতর পুরে দেয়, তারপর লঘু হাতে কাঠি দুটির সাহায্যে সামনের বড়ো বড়ো রেকাবী আর ছোট

চীনেমাটীর গামলার মতন পাত্র থেকে তরকারী মাছ মাংস সব তুলে তুলে নিয়ে মুখে পোরে; তরকারীর মধ্যে দেখতুম অনেক সময়ে আলু পেঁয়জ কপি প্রভৃতির মধ্যে মস্ত এক মাছ আস্ত বিরাজ ক'রছে। একটা সাদা পাতলা জিনিষ এরা খুব খেত। সমস্ত খাদ্যের নানা গন্ধ ছড়িয়ে যে মিশ্র গন্ধটা বার হ'ত, তার মধ্যে পচা বা শুঁটকি মাছের চামসে সৌরভের রেশটাই সব চেয়ে মোটা সুরে দূর থেকে আমার নাকে বাজ্‌ত।

চীনে যাত্রীরা অধিকাংশই দক্ষিণ চীনের লোক। দুজন চীনে কিন্তু ছিল, তারা হ'চ্ছে মধ্যচীনের, শাঙ্‌হাই অঞ্চলের। এরা ছিল বাজী-কর,—এক বুড়ো, আর তার ছোকরা চেলা। বাজীকরের কাজে ভারতবর্ষে এরা কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি ব'লে মনে হ'ল। মাঝে মাঝে বোধহয় এইরূপ চীনে বাজীকর ছিট্‌কে ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছয়, আর তারা ভারতের মধ্যে দূর দূর জায়গায় ঘুরে ফিরে বাজী দেখিয়ে—বাঁশবাজী ধরণের কসরৎ, যাদু সব জড়িয়ে—কিছু রোজগার ক'রে থাকে। বছর কয় পূর্ব্বে আমি এলাহাবাদে দেশী মহাল্লায় একবার এইরকম চীনে বাজীকরদের, কাঁসরের আওয়াজে দর্শকদের কান ঝালাফালা ক'রে বাজী দেখাতে দেখেছিলুম। এই দুই চীনে যাচ্ছিল অতি গরীবের মতো; অল্পস্বল্প তল্পিতল্পা নিয়ে ডেকে গুণ চটের বিছানা পেতে প'ড়ে থাক্‌ত। ছোকরা তার গুরুর খুবই সেবা ক'র্‌ত দেখতুম। কোথা থেকে একটা ভারতবর্ষীয় পিতলের লোটা এরা সংগ্রহ ক'রেছিল—চীনেম্যানের ব্যবহারে আমাদের দেশের ঘটী একটু বিশেষ ক'রেই চোখে লেগেছিল। এইটেই এদের তৈজস ছিল, আর তা একাধারে পানপাত্র আর পিকদানি উভয় কাজেই লেগে-

ছিল। খুব গরীব ব'লে বোধহয় অন্য চীনেদের সঙ্গে এরা বড়ো মিশত না, আলাদাই থাকৃত, আর এদের জন্য ভাততরকারী আলাদা ক'রেই দিয়ে যেত। খুব সম্ভব ভাষাসঙ্কট না মেশার আর একটা কারণ। এরা মধ্যচীনের লোক, দক্ষিণ চীনের ভাষা এরা বুঝত না, আর এদের ভাষাও দক্ষিণ চীনের লোকেরা বুঝ্‌ত না। আমি এই দু' অঞ্চলের ভাষা এক বর্ণ না বুঝেও কানে শুনেছি—ধ্বনি আর উচ্চারণ হিসাবে তখন দুটো একেবারে আলাদা আলাদা লেগেছিল। উত্তরের ভাষাটি বেশ শ্রুতিমধুর—তালব্য 'চ'কার 'শ'কার বহুল; আর দক্ষিণের ভাষা অতি কর্কশ—'খ' 'হ' এই সব ধ্বনি বড্ড বেশী কানে লাগ্‌ত। এর মত কর্কশ ভাষা খুব কম শুনেছি। চীন দেশের লোকসংখ্যা নাকি চল্লিশ কোটি। এদের মধ্যে প্রায় গোটা আঠারো ভাষা আছে। অক্ষর বা চিত্রলিপি সমস্ত চীনময় এক, কিন্তু উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিশেষ পার্থক্য এসে গিয়েছে। তাতে ক'রে এই দাঁড়িয়েছে যে, চীনা ভাষায় কিছু লিখে দিলে সমগ্র চীনদেশের পড়িয়ে চীনেরা সকলেই সেটা বুঝ্‌তে পারবে, কিন্তু সেই লেখাটা এক প্রদেশের মতন উচ্চারণ ক'রে প'ড়্‌লে অন্য প্রদেশের লোকেরা বুঝ্‌তে পারবে না। এটা ত গেল চীনা সাহিত্যের ভাষা, সাধু ভাষার কথা। প্রাদেশিক কথিত ভাষার বাক্যরীতিতে আবার নানা পার্থক্য দাঁড়িয়েছে। চীনদেশে পেকিঙ্‌ অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষা আর সেখানকার উচ্চারণ শিষ্ট ব'লে গণিত; শিক্ষিত লোকেরা, উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা পেকিঙের ধরণে চীনা ভাষা ব'ল্‌তে শেখেন। চীনে গণতন্ত্রের শাসকেরা এই "ক্বান হ্বা" বা উত্তর চীনের ভাষাকে এখন সমস্ত রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা ক'র্‌তে চান। কিন্তু এতে নানা অসুবিধা আসছে।

আমাদের দেশে এই অবস্থা কল্পনা করা একটু মুস্কিল। অবস্থাটা কতকটা এইরূপঃ—লেখবার সময় লিখলুম যথাসম্ভব খাঁটি সংস্কৃত, কিন্তু বাঙালী পড়বার সময় তাকে প'ড়বেন বাঙলা প্রতিশব্দ দিয়ে, মারহাট্টী পড়বেন মারহাট্টী প্রতিশব্দ দিয়ে, হিন্দুস্থানী প'ড়বেন হিন্দী প্রতিশব্দ দিয়ে। শেষটা চেষ্টা হ'ল খালি হিন্দী প্রতিশব্দ দিয়ে পড়া সংস্কৃত হবে দেশভাষা; আর বাঙলায়, মারহাট্টা দেশে স্থানীয় ভাষা অনুসারে না প'ড়ে এই হিন্দী অনুসারে তাকে প'ড়তে হবে। এত ঝঞ্ঝাটে সাধারণ লোকের চলা অসম্ভব—এক প্রাচীন ভাষাকে খাড়া ক'রে তার দ্বারা কতকগুলি পৃথক্ পৃথক ভাষাকে গেঁথে রাখা এখন আর সম্ভব হ'চ্ছে না—সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে এই ভাষাগত পার্থক্য র'য়েই যাচ্ছে। দূর দূর প্রদেশের অধিবাসী চীনে বাধ্য হ'য়ে এই পার্থক্যকে মেনে নিচ্ছে, আর তাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তার দরকার হ'লে, দু'পক্ষেরই "কান হুবা" জানা না থাকলে অন্য যে-কোনো বিদেশী ভাষা জানা থাকে তাই ব্যবহার করে—যেমন ইংরাজী, মালায়, হিন্দুস্থানী। দক্ষিণ চীনের এক রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক এই ভাষা-সঙ্কটে প'ড়ে উত্তর চীনের এক চীনা কলেজে ইংরাজিতে পড়াতে বাধ্য হ'য়েছিলেন শুনেছিলুম। এ হ'চ্ছে বাঙালী আর মারহাট্টীয় ইংরিজীতে আলাপের মতন। এই যাত্রায় আমাকে একবার দুই চীনের মধ্যে দো-ভাষীর কাজ ক'রতে হ'য়েছিল। জাহাজ যখন পেনাঙে পৌঁছল, তখন ডেকযাত্রীদের বোটে ক'রে কোয়ারান্টীনে নিয়ে গেল। ক'লকাতায় প্লেগ হয়, পাছে ক'লকাতার তৃতীয় শ্রেণীর ডেকযাত্রী প্লেগের বীজাণু নিয়ে পেনাঙে নেমে অসুখটা ছড়িয়ে দেয়, সেই ভয়ে যাত্রীদের তিন দিন ধ'রে একটা আলাদা জায়গায় নিয়ে আটকে রেখে দেয়। যদি

এই তিন দিনের মধ্যে কারু অসুখবিসুখ জ্বরজাড়ী না হয়, তাহ'লে সকলকে ছেড়ে দেয়; অন্যথা প্লেগের আশঙ্কায় আরও লম্বা সময় আটক ক'রে রাখে। এখন পেনাঙে যখন জাহাজ দাঁড়াল, বন্দরের ডাক্তার এসে সব ডেকযাত্রীকে সার দিয়ে দাঁড় করালে, তারপর এক এক ক'রে নাড়ী টিপে, জিভ দেখে, নিজের সামনে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেল। তারপর তারা নিজের নিজের গাঁঠ্‌রী মালপত্র নিয়ে তৈরী হ'তে লাগল, কোয়ারান্টীনের নৌকায় চ'ড়বে ব'লে। সবাই নিজের মালপত্র নিয়ে ব্যস্ত। শাঙ্‌হাইয়ের দুজন চীনে তখন কি ক'রবে সে বিষয়ে ঠিক ক'রতে না পেরে, হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্য চীনেরা নিজের জিনিষ নিয়ে ব্যস্ত, আর সাহায্য করবার ইচ্ছা থাকলেও ভাষার অভাবে এরা কিছু ক'রতে পারলে না। এদের ভাষা কেউ জানে না, কেউ এদের দেখলেও না। কদিন জাহাজে ডেকপ্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমি অনেকের সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়েছিলুম—প্রায় সকলের সঙ্গে মুখচেনা আলাপ হ'য়েছিল,—বুড়ো চীনে তার টোল-খাওয়া গাল, রেখাঙ্কিত কপালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চোখ, আর বেশ লম্বা (যদিও সংখ্যায় অল্প ক'গাছি) দাড়িগোঁফওয়ালা সহাস্য মুখে ঘাড় নেড়ে আমায় নীরব সম্ভাষণ ক'র্‌ত। এমন কি তার ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে তার সঙ্গে আমি কথাও দু' একটা ক'য়েছি, তাতে তার বৃত্তান্ত সামান্য কিছু জানতেও পেরেছি; আর আমার ভাষাতত্ত্বের কেতাবে পড়া দু' একটী চীনে বাক্যও তার উপর প্রয়োগ ক'রেছি—যেমন "নী-ম্যন্ য়ুঙ্‌ শাঙ্‌-হাই লাই—তোমরা শাঙহাই থেকে আস্‌ছ?" আর "থিয়েন হাই হাও—আকাশ আর সমুদ্র পরিষ্কার"।—এই গোলমালে সে আমার দিকে তাকালে। ব্যাপারটী কি হ'চ্ছে, জাহাজ বন্দরে লাগ্‌লে

যে আবার কোয়ারাণ্টীনের হাঙ্গামা হয়, সে সব আমার জানা ছিল না। এমন সময় জাহাজের এক চীনে কেরাণী সেখানে এল। সে আবার দক্ষিণ চীনের লোক, উভয়ের ভাষা জানে না। আমি ইংরাজিতে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—এরা কি ক'রবে? যা যা ক'রতে হবে সে আমায় ব'লে দিলে, আমি তখন অতি কষ্টে হিন্দী ভাষার দ্বারা এদের বুঝিয়ে দিলুম।

জাহাজে অন্য লোক যাদের দেখেছিলুম, এই চীনেদের বাদে—তারা নানা জাতের ছিল। খালাসীরা বাঙালী মুসলমান প্রায় সবাই—দু চারটী অবাঙালী, খুব সম্ভব বিহারী ছিল। পাঞ্জাবী ছিল অনেক—শিখ আর মুসলমান; কতক ফৌজী লোক, কতক পুলিসে কাজ করে সিঙাপুরে, হঙ্‌কঙে, শাঙহাইয়ে,—বাকী সব দরওয়ানের কাজ করে ইন্দোচীনে। সিঙাপুরে তখন ব্রাহ্মণ সিপাহীর পল্টন ছিল, সেই পল্টনের জনকতক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সিপাইও ছিল। ভোজপুরী আর হিন্দুস্থানী আর কতকগুলি ছিল, এরা মালয় শ্যাম, ইন্দোচীন অঞ্চলে দরোয়ানের কাজ করে। সিন্ধী ব্যবসায়ী চার পাঁচ জন ছিল, এরা যবদ্বীপ আর সুমাত্রার যাত্রী—ঐ সব দেশে ছোটো বড় অনেক ব্যবসায় এরা হাতে নিয়েছে—চাল দাল আটার ব্যবসা অনেকে করে। জনকতক পাঠান, জন দুই আরব, জন দুই মালাইও ছিল। এদের সকলের কথা বারান্তরে ব'লবো।

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কথা ও কাজ

——:০:——

মানুষের মনের ভাবের সঙ্গে মুখের কথার ধারাবাহিকতা ব্যাপারটা এতই মৌলিক এবং সনাতন যে, এমন কি বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতের ব্যাকরণসমূহেও ভাষার সংজ্ঞার কোন অভিনব সংস্করণের প্রয়োজন হয় নি। মানুষের মুখের কথা এবং হাতের কাজের ভিতরে কিন্তু এমনধারা কোনো সহজ পারম্পর্য্য সহসা সাদা চোখে ধরা পড়ে না। ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন যা কাজ, তার সম্পাদনে কথার আবশ্যকতা হয়ত খুব বেশী নেই। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের জটিলতা মানুষের যতই বেড়েছে, কাজের আগে কথার ভূমিকার প্রয়োজনীয়তাও ক্রমে ততই অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। ডাল ভাত উদরস্থ করা যে এমন একটা অত্যন্ত সোজা কাজ, সেটি করবার আগেও শাস্ত্রমতে 'নিবেদন' অবশ্যকর্ত্তব্য। আর বিবাহাদির মত গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হবার পূর্ব্বে যে উভয়পক্ষে লক্ষ কথার বিনিময়ের ব্যবস্থা—সে ত' আমাদের সকলেরই জানা কথা।

যেখানে কাজের আগে কথাবার্ত্তা কিছুই হয় না, সেখানে কাজটা হয়ে পড়ে নিতান্তই দৈবাৎ। মানুষে সৃষ্টির আদিকাল থেকে নিজ নিজ অবিবেচনা আর অপরিণামদর্শিতা দেবতার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আসছে। ফলে দৈবের সদর মফঃস্বল দু'পিঠই সমান অন্ধকার। দেবদ্বিজে ভক্তি যতই থাক্‌, সংসারী মানুষ দৈবাতের পরে

ভবিষ্যতের বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। এটী একটী অত্যন্ত আটপৌরে সত্য কথা। যুগে যুগে অনেক শাস্ত্রের বিধি এবং ধর্ম্মের অনুশাসনের ধোপ এর উপর দিয়ে গিয়েছে; কিন্তু এর পাকা রং দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়েই উঠ্ছে। মানুষের মনের সহজ অহমিকা তাকে দেবতার সমকক্ষ না হওয়া অবধি কিছুতেই দৈবের পরে একান্ত নির্ভরপরায়ণ হবার নতি স্বীকার করতে দেয় না। এটী হচ্ছে বিধির বিধি—মানুষের স্বভাব। ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ বা বেদাধ্যয়নে এর পরিবর্ত্তন অসম্ভব। এই কারণেই মানুষের সর্ব্বপ্রকার ঐহিক অনুষ্ঠানের উপক্রমণিকা মন্ত্র না হয়ে, হয়েছে মন্ত্রণা।

কিন্তু মন্ত্রণা ব্যাপারটি যে বিশেষ করে একটী অসমাপিকাক্রিয়া, তা ওর আকারেই প্রকাশ। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ববিধ কর্ম্মক্ষেত্রে এর এই অসমাপিকা আকার এমন অসাধারণ দ্রুত বেড়ে চলেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে ভরসা হয় অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সকল সমস্যার তাপ এই বিরাট মন্ত্রণার চন্দ্রাতপতলে চিরনির্ব্বাণ লাভ করবে। মুমূর্ষু দেহটীকে ক্রমাগত বাড়িয়ে ঘটোৎকচ যদি ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স-শরীরে স্বর্গে চলে' যেত, তাহলে ব্যাপারটা বাস্তবিক যা ঘটেছিল তার চেয়ে কিছুমাত্র কম আজগুবি নিশ্চয়ই হত না; কিন্তু তাতে কুরুপাণ্ডব কোনো পক্ষেরই কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। তার বিরাট দেহের আকস্মিক পাতনেই শত্রু অক্ষৌহিনীর ধ্বংস সম্ভব হয়েছিল। মন্ত্রণাও যদি শুধু কথার জাল ক্রমাগত বুনে গিয়ে পরিশেষে আপনাতেই আপনি পরিসমাপ্তি লাভ করে, তাহলে যতই সুদীর্ঘ, সর্ব্ববাদিসম্মত এবং বিস্ময়কর হোক না কেন, তা নিতান্তই কথার কথায় পরিণত হতে বাধ্য। উদ্দেশ্যকে সকল

দিক থেকে চাপ দিয়ে শৃঙ্খলিত করে' সাধ্যের গণ্ডীর ভিতরে আনাতেই মন্ত্রণার সার্থকতা। এ কথাটা যেন আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছি। সমবেতভাবে কোনো কাজের আশু প্রয়োজন হলেই, আমরা চারিদিক থেকে অজস্র মন্ত্রণার জাল বিস্তার করে' অচিরেই সেটাকে লোক-চক্ষুর অগোচর করে' ফেলি। তারপরে জাল গুটানোর সময় হ'লে সবাই অকুতোভয়ে নিজ নিজ কোলের দিকে টানি; এবং জাল নিংড়ে যা পাই, তা হচ্ছে বিশুদ্ধ কথাসরিৎসাগর।

(২)

ন্যায়শাস্ত্রকারগণের মতে ধোঁয়া নাকি আগুনের অস্তিত্বই জ্ঞাপন করে। কিন্তু রান্নাঘরের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁরা সবাই জানেন যে, অনেক সময়ে ধোঁয়া বিশেষ করে আগুনের অভাবই জানিয়ে দেয়। যে মন্ত্রণার পিছনে ঐকান্তিক কর্ম্মপ্রেরণার স্ফুলিঙ্গ নেই, তা শুধু আমাদের কর্ম্ম-শক্তিকে আচ্ছন্ন করে মাত্র। এমনধারা নিরর্থক কথার মাত্রা যতই কমবে, আমাদের সামাজিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার উদ্বোধন ততই সহজ-সাধ্য হবে। কাজের প্রতি যতক্ষণ না প্রাণের টান আস্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কথা কাজের কথা হবে না; আর কাজের দায়িত্ব দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত না হলে, কাজটাকে উপলক্ষ্য করে' কল্পনার আকাশে রঙবেরঙের ঘুড়ি ওড়ানোই হবে আমাদের লক্ষ্য। অনেক অসাধ্য তখন আমরা সাধন কর্‌ব। কথার তোড়ে নিচুগাছকে ছদ্মবেশী আমগাছ, আর আমগাছকেই প্রকৃতপক্ষে নিচুগাছ প্রমাণ করে দিতেও আমরা পশ্চাৎপদ হব না। দরকার হলে দিনকে রাত, রাতকে দিন আমরা মুখের জোরে তখন

করব। এত করেও কিন্তু জমাখরচ খতিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

আত্মারাম সরকারের হাড় ছুঁইয়ে বাজীকর ধুলোমুঠি নিয়ে টাকা বানিয়ে দেয়, একটা থেকে টেনে অনায়াসে দশটা বের করে—কিন্তু পরণের শতগ্রন্থি লুঙ্গি আর গায়ের শতছিদ্র জামা আর তার ঘোচে না। হাতের বদলে ক্রমাগত হাত-সাফাই দিয়ে কাজ চালাতে গিয়ে আমরা ঘরের অশান্তি আর বাইরের অশ্রদ্ধাই দিন দিন বাড়িয়ে তুল্‌ছি। এতদিনে অন্ততঃ এটা আমাদের বোধগম্য হওয়া উচিত যে —যে বিদ্যায় রাতারাতি বড়মানুষ হওয়া সম্ভব, কর্ম্ম-জগতে তার স্থান নেই। এখানে তেল মাখবার আগেই কড়ি ফেলা চাই—আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই সে কড়ির সংস্থান কর্‌তে হয়। লক্ষ্মীলাভের আশায় এ ক্ষেত্রে কোন পঞ্চম উপায়ের প্রয়োগ শুধু যে শাস্ত্রবহির্ভূতই হবে তা নয়, জাতীয় প্রকৃতির উপরে তার প্রতিক্রিয়াও অবশ্যম্ভাবী।

মামুদ ঘোরীর সিন্ধু পার হবার বহু পূর্ব্বেকার সেই সুদূর অতীত যুগের সমাজ, যার নিষ্ঠা এবং আদর্শের গৌরব এবং গর্ব্ব আমরা আমাদের পুরুষ-পরম্পরাগত সহজ উত্তরাধিকারহিসাবে অঙ্গীকৃত করে' সময়ে অসময়ে পরম পুলক প্রকাশ করে' থাকি—সে সমাজে পুরুষকারই ছিল প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। এবং এই কারণেই বোধহয় তখনকার মানুষের হাতের অস্ত্রের মত তাঁদের মুখের কথারও প্রত্যাহার ছিল না। কথার জন্য তখন রাজ্যত্যাগ, পুত্রত্যাগ, সংসার ত্যাগ সম্ভব হত। আর এখন আমাদের আদর্শ হয়েছে—শতং বদ মাকং মা লিখ। আইন আদালতের ভয় না থাকলে আমরা মনে মনে যে আদর্শটিকে মেনে চলি, তাকে শাস্ত্রীয় আকার দিলে—শত শতং

বদ শতং লিখ, একং মা কুরু—এইরকমই হয়ত দাঁড়ায়। এই 'মা কুরু'র বীজমন্ত্রেই আমাদের সমস্ত কথাকে সত্যমিথ্যানির্ব্বিচারে নিরর্থক করে দিয়েছে। অর্জ্জুনের রথের সাম্‌নে বসে' অশ্বরশ্মি মাত্র হাতে, কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ঝড়ঝাপ্‌টা বুক পেতে না নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যদি যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতার যথারীতি আবৃত্তিতে অর্জ্জুনকে মুগ্ধ করে' রেখে, দারুককে ডেকে নিজের রথ আনিয়ে শিঙা ফুঁকে দ্বারকায় চলে যেতেন, তাহলে তাঁর সেই সারগর্ভ বক্তৃতাও অর্থহীন প্রলাপেই পর্য্যবসিত হত। দ্বৈপায়ণ ঋষি কষ্ট করে সে গীতাভিনয় সঙ্কলিত এবং লিপিবদ্ধ করলেও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা নামে তাকে নিশ্চয়ই অভিহিত কর্‌তেন না।

আমরাও কর্ম্ম-জগতে বহুদিন ধরে গীতাভিনয়েরই চর্চ্চা করে' আস্‌ছি। যুদ্ধে বাক্‌পটুতা এবং সভায় বিক্রম প্রকাশ, এ সবও ক্রমশঃ আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ হয়ে আস্‌ছে। কথার মাত্রা হিসাবে মাঝে মাঝে আমাদের যে-সব অঙ্গসঞ্চালন, তাতে শুধু আমাদের কর্ম্মশক্তির নগ্ন দারিদ্র্যই ফুটে উঠ্‌ছে। রবাহূত হয়ে কাজ যতবারই আমাদের দুয়োরে এসেছে—অতৃপ্ত ফিরে গিয়েছে। অভিনয়ের আবেগে বহু আড়ম্বরে সর্ব্বস্ব পণ করে' দেবার বেলায় দিয়েছি আমরা শুধু তাকে আমাদের মাথার'পরের কর্ম্মবৈমুখ্যের বোঝাটিকে ঘুরিয়ে বসানোর ভার। সদাসতর্ক মন আমাদের কালের ইঙ্গিতে অনিশ্চিত কল্যাণের দিকে পা না বাড়িয়ে, সমধিক আগ্রহে সুপ্রতিষ্ঠিত জড়তাকেই আঁক্‌ড়ে ধরে আছে প্রাণপণে। এই জাগ্রত আবিষ্টতার ফলে জাতীয় বা সামাজিক যত কিছু আমাদের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, সবই হয়েছে মৃত-জাত বা জীবন্মৃত।

(৩)

কর্ম্মপরিচয়ে আমাদের এই যে অচল অধম দশা, এটাকে ঘর এবং পরের কাছ থেকে সর্ব্বতোভাবে প্রচ্ছন্ন রাখ্‌বার জন্যেই আমরা যখন-তখন মুখে মুখে মোহমুদ্গর পরিচালনা করে থাকি। কিন্তু এতে ক'রে আমাদের মুখ ব্যথা হওয়া ছাড়া আর কোনই ফল হয় না। জাতিকে তার নিজস্ব প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত করতে যে কর্ম্মপ্রেরণা, সমাজকে আমাদের আদর্শের দিকে উন্মুখ করে তুল্‌তে যে আন্তরিকতা নইলে নয়—তার সন্ধান যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজেদের ভিতরে না পাব, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের সব কথা এবং কাজই মিথ্যা বৃথা ছলনা মাত্র হবে। রূপহীন যে, সে মুখে চুণ ঘস্‌লেও লোকে হাস্‌বে, কালি মাখ্‌লেও কেউ মুগ্ধ হবে না। ও উভয়বিধ অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসই আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। আর সেই ত্যাগই হবে আমাদের মুক্তিপথের প্রথম সোপান।

শুষ্কমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার অভিমানবশেই আমরা মনে করি আমরা আমাদের সমাজকে এবং জাতিকে চিনি ও জানি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে—কর্ম্ম ছাড়া জ্ঞান-লাভ হয় না। পাশ্চাত্য দেশসমূহে, যেখানে সামাজিক বাঁধন অত্যন্ত শিথিল বলে' আমাদের অনেকের ধারণা—সেখানে সামাজিক হিত-সাধনের জন্য অসংখ্য কর্ম্মীসংঘ নানা দিকে নানা কাজে সদাই ব্যস্ত। এম্নি করে' কাজের ভিতর দিয়েই সে-সব দেশে সমাজের সর্ব্বস্তরের ভিতরে জানাশোনা, সহানুভূতি এবং প্রাণের পরিচয় ঘটে। আর আমাদের দেশে?

অতীত যুগে যখন অন্নসমস্যার প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আয়ুপরিমাণও দিন দিন ক্ষীণ এবং ক্ষীণতর হতে সুরু হল, খুব সম্ভব

তখনই আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রাকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে বাধ্য হয়ে অর্দ্ধেক ত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই পরিত্যক্ত অর্দ্ধেক হচ্ছে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। ঐ দুই আশ্রমের কাজই ছিল স্বতঃ পরতঃ সমাজের হিতসাধন—নিঃস্বার্থভাবে। আমাদের সামাজিক জীবনে তখন ভাঁটা পড়ে এসেছে। যাকে কালোপযোগী আকার দিয়ে, গার্হস্থ্য সংস্করণে পরিণত করে', সমাজের অঙ্গীভূত করে' ধরে রাখা উচিত ছিল, আমরা তাকে নির্ব্বিবাদে বিদায় দিয়েছি। সেই থেকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর বিধিব্যবস্থা আমাদের সমাজ শাস্ত্রেত নেই-ই, বরং পরের খেয়ে ঘরের মোষ তাড়ানোর প্রবৃত্তি আমাদের প্রকৃতিতে বহুল পরিমাণে ঢুকেছে।

আমাদের মনের অভিধানে 'সমাজ' 'জাতি' এ সব শব্দের অর্থের ঠিক সেইধরণের আকৃতি এবং বিকৃতি ঘটেছে, যে ধরণের বিকৃতির ফলে আমাদের ব্যবহারিক ভাষায় পরিবার মানে দাঁড়িয়েছে স্ত্রী। সামাজিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার একান্ত অভাবের ফলেই আমাদের ভিতরে এ সব সঙ্কীর্ণতা এসেছে। কথার ফুৎকারে এ অপসারিত হবার নয়। 'সমাজ' এবং 'জাতি'র বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ এবং জাতি রয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয় আমাদের শুধু কর্ম্মের ভিতর দিয়েই হওয়া সম্ভব। আর সে পরিচয় সংসাধিত হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে কথার প্রয়োজনীয়তাও অনেকাংশে অন্তর্হিত হবে। কারণ সমাজের পিঠে গুরুগিরি ফলানোর প্রবৃত্তি, অথবা সমাজের পক্ষে ওকালতি করবার উৎসাহ, এ দুইই তখন নিতান্ত অনাবশ্যক হয়ে পড়বে। তখন সমাজ হবে সজীব—আমাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেও স্বরূপে ফুটে উঠবে

স্বতঃই। তখন আমাদের সমাজ হবে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ভালোমন্দের সম্মিলিত নিদর্শন।

এখন আমরা সমাজের ভিতরে থেকেও সমাজছাড়া; জাতি হয়েও জাতিহীন। সমাজের সঙ্গে সহজ সরল সহানুভূতি এবং নিত্য অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপন করবার মত কর্ম্মপ্রবণতা সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরল। এর ফলে যখনই আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবন-যাত্রার বিরোধ ঘটে, তখনই হয় আমরা আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক নানাপ্রকার প্রলাপের প্রলেপ দিয়ে বিরোধের ব্যথা চেপে রাখি, নয় ত বিদ্রোহ করি—সমাজকে হাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে আমরাও গিয়ে হোটেলে ঢুকি।

নিজের জিনিষের প্রতি মানুষের একটা সহজ অধিকারের আনন্দ বা দায়িত্ববোধ—একটা মমতা থাকেই। কিন্তু এ মনোভাবের সম্যক বিকাশ নিশ্চয়ই চর্চ্চাসাপেক্ষ। আমাদের সমাজের প্রতি যে আমাদের মমতাবোধ, সেটাও খুব সম্ভব চর্চ্চার অভাবে আমাদের মনোবৃত্তির ভিতরে সম্যক্ পরিণতি লাভের সুযোগ পায় না। এই কারণেই সমাজের ভালোমন্দের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ না হ'লেও অনেকটা উদাসীন। সামাজিক কোনো অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিতান্ত আমাদের গা-ঘেঁসে না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা অত্যন্তই নির্লিপ্তধরণের হয়ে থাকে। তাতে আমাদের সৎবুদ্ধির পরিচয় যতই থাক্, সমবেদনার ছাপ প্রায়ই থাকে না।

কিছুদিন আগে স্নেহলতার আত্মাহুতিতে আমরা অত্যন্ত বিচলিত

হয়ে পড়েছিলাম। গদ্যে পদ্যে অনেক লেখালিখি হয়েছিল, সভাসমিতিও হয়েছিল বিস্তর। এবং তাতে দেখা গিয়েছিল পণপ্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে প্রত্যেকেই আমরা শতমুখ এবং সবাই আমরা একমত। কিন্তু একমত হয়ে আমরা করেছি কি? নূতনত্ব চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গে ও-সব ব্যাপারকে একটী নতুনতর দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের দলভুক্ত করে' দিয়ে, আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেছি। এম্নি ধারা কর্ম্ম-বিমুখতার দরুণ আমরা ক্রমশঃ নিজেদের কাছেই নিজেরা ঝুঁটা বনে' গিয়েছি। আমাদের তথাকথিত ভাবপ্রবণতা, বাক্-প্রবণতার ভিতর দিয়ে গিয়ে ক্রমে হুজুগ্প্রিয়তায় পরিণত হয়েছে।

(৪)

আমাদের কথার সঙ্গে কাজের অসহযোগ এবং বৈসাদৃশ্য যে কত বেশী, তা আমাদের কথা-সাহিত্যের সঙ্গে কর্ম্ম-সংহিতার তুলনা করলেই ফুটে উঠবে। মুখে মুখে আমরা ললিতা সুচরিতা দত্তা পরিণীতার চর্ব্বিতচর্ব্বণ করি, আর কাজের বেলায় নিজের ঘরের খুকী দশ বছরে পা দিতে না দিতেই আমাদের আহার কমে যায়, নিদ্রা ঘুচে যায়—আমরা তাকে পাত্রস্থ করবার চেষ্টায় প্রাণপণ করি। যে পরিমাণ চেষ্টা আমরা বাধ্য হয়ে 'কন্যাদায়' হ'তে মুক্তি পাবার প্রয়াসে ব্যক্তিগত ভাবে করে থাকি, তার সিকির সিকিও যদি আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমবেত ভাবে 'বরপণে'র উৎপীড়ন থেকে সমাজকে মুক্ত করবার চেষ্টায় ব্যয় করতাম, তাহলে সমাজের অনেক সমস্যার উপরেই হয়ত মীমাংসার আলো এসে পড়ত। কিন্তু তা'ত হবার নয়। ললিতা সুচরিতা ওঁরা কথা-সাহিত্যের পটেই আঁকা থাকবেন—কাজের বেলায় 'গৌরীদান'ই হবে আমাদের লক্ষ্য।

সব বিষয়েই ঐ এক কথা। আমাদের জীবনের; সমাজের যে সব সম্ভাবনাকে সাহিত্যপ্রতিভা আকার দিয়েছে, আমরা সেগুলোকে অনায়াসে অবলীলাক্রমে কল্পলোকে অন্তরিত করে' সেখানেই তাদের যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করেছি। কথাসাহিত্য আমাদের কাছে উপকথায় রূপান্তরিত হয়ে শুদ্ধ অবসরবিনোদনের উপাদানেই পরিণত হয়েছে। তার ইঙ্গিত এবং প্রেরণা আমাদের মৌতাতের খোরাক যোগায় মাত্র—কর্ম্মের উদ্দীপনা ভুলেও জাগায় না। "ম্যাট্‌নীনি-লীলা" চিরদিনই আমাদের কাছে "সরেস" থেকে যায়।

সমালোচনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে শোনা যায়, আমাদের কথা-সাহিত্য নাকি ক্রমশঃই অ-জাতীয় হয়ে উঠছে। এ অভিযোগের মূলে অনেকখানি সত্য আছে। যে সমাজে জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, গোত্র, গোষ্ঠি, আরো কত কি, এবং সর্ব্বশেষে কোষ্ঠির মিলামিল যোগাযোগ না হ'লে স্ত্রী-পুরুষের মিলন অসম্ভব বা অবিধি, সেখানে জাতীয় ধারায় কথা-সাহিত্যের প্রসার যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, সে কথা কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু যথাবিধি ঘটকের মুখে নায়িকার রূপগুণ, বিদ্যাবুদ্ধি এবং ঘরবাড়ী সব জেনেশুনে সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা উপন্যাসের নায়ক হিসাবে কি যে করতে পারি, তা'ত কবি-গুণাকর সবিস্তারেই লিখেছেন। ও-দিকে আমাদের সামাজিক জীবন এমন বৈচিত্র্যহীন যে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, আমাদের সাহিত্য অন্য কোনো দোষাশ্রিত না হলেও পুনঃপুনঃ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হবেই।

আসল কথা, আমাদের জাতীয়-জীবন খুব সম্ভব এখনও সৃষ্টির অপেক্ষা করে' রয়েছে। যা আছে সেটা হচ্ছে জাতীয় জড়তা।

অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত জাতীয়তার দোহাই ব্যাপারটা আমাদের কৃতিগত জড়তার ওজর ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহিত্যের রস-সংগ্রহে আমরা আরব, পারস্য থেকে সুরু করে' সুদূর নর্‌ওয়ে, সুইডেন্ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যেতে প্রস্তুত। কিন্তু সমাজ দেহে সাহিত্যের রসায়ণের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে আমরা সদাই সন্ত্রস্ত। অনুপানে আমাদের বিশেষ আপত্তি নেই, বরং যথেষ্ট আগ্রহই আছে; কিন্তু ওষুধ আমাদের ধাতে কিছুতেই সইবে না। এ আমরা আগে থেকেই জেনে বসে' রয়েছি। এ সর্ব্বজ্ঞতার মুলে কিন্তু বিন্দুমাত্রও কৃতকর্ম্মের অভিজ্ঞতা নাই—আছে শুধু আমাদের বহু যুগের জেরটানা জড়তা।

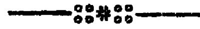
এমনধারা সর্ব্বজ্ঞতার সতর্কতা কর্ম্মজগতে আমাদের সর্ব্বতোমুখী জড়তারই অন্যতর উপসর্গ। প্রকৃতির রাজ্য যে এমন অচঞ্চল নিয়মের শৃঙ্খলায় বাঁধা—সেখানেও ত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অমন কত শতই হচ্ছে। সে-সব যদি প্রাকৃতিক মহানিয়মের ব্যতিক্রম না হয়ে অন্তর্ভুক্ত এবং অনুবর্ত্তীই হয়, তবে কর্ম্মের পথে আমাদের যে সব ভুল-ভ্রান্তি, স্খলন-পতন, ত্রুটী-বিচ্যুতি, সে সবও আমাদের সাথের সাথী বলেই মেনে নিতে হবে। ভগীরথের যে এত স্তবস্তুতি, এত সাধ্য-সাধনা, এত পুণ্যের জোর,—তবুও ত স্বর্গমন্দাকিনী সগর-বংশের ভস্মাবশেষের উপর সরাসরি এসে নামেন নি; অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে, অসংখ্য বাঁক ঘুরিয়ে, বহু ফাঁড়া কাটিয়েই তাঁকে আন্‌তে হয়েছিল।

আমাদেরও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে বোঝাপড়া কর্‌তে কর্‌তেই জাতীয় ভবিতব্যতায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভ্যস্ত বাক্‌প্রবণতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আস্‌বে

সন্দেহ নেই; কিন্তু তখনই আমরা আমাদের ভিতরে প্রকৃত আন্তরিকতার সন্ধান পাব। আজ যে-কথা আমাদের ভালো লাগে, তখন তা আমাদের ভালো কর্‌বে। আন্তরিকতার আলোতে কথার হাওয়া থেকে তখনই আমরা গঠনের উপকরণ সংগ্রহ কর্‌তে পারব। শুদ্ধ তখনই আমাদের মন, আমাদের আশা, আমাদের কাজ, আমাদের ভাষা, ভগবানের বরে সত্য হয়ে উঠবে।

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত।

বাঙ্গালীর কবিত্ব।



কবিতার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ইউরোপের জনৈক মনীষী বলিতেছেন যে, কবিতা চিত্তাবেগের রাগে রঞ্জিত চিন্তা। অবশ্য কবিতার এই ব্যাখ্যাটি যে খুব সূক্ষ্ম বা গভীর, তাহা আমি মনে করি না। তবে আপাততঃ এটি গ্রহণ করিতেছি এবং এই কথা দিয়াই আমার আলোচনা সুরু করিতেছি এই জন্য যে, তাহাতে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। কারণ আমি বলিতে চাই, বাংলার কাব্যে চিন্তাসম্পদের বড় মহিমা নাই, সেখানে যাহা আছে তাহা চিত্তাবেগের প্রাচুর্য্য—বাংলার নিজের এক কবির কথায়, "প্রাণেরই প্রচুর স্পন্দন রে"। ফলতঃ, যদি বলা যায় বাংলা কবিতা মূর্ত্ত ভাবমত্ততা বা ভাবোন্মত্ততা, তবে বিশেষ অন্যায় হইবে না—কথাটা কেবল দোষের হিসাবে আমি বলিতেছি না, গুণের হিসাবেও বলিতেছি। বাংলার কাব্যসৃষ্টির আসল গোড়াপত্তন হইয়াছে ভক্তদের—প্রধানতঃ বৈষ্ণব-ভক্তদের হাতে। পদাবলীর সুরই বাংলার কবিতার প্রধান সুর। বাঙ্গালীর আদি কবি চণ্ডীদাস যে তান দিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহার মূর্চ্ছনা আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর কাব্যজগতে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বাংলার কীর্ত্তন, বাংলার বাউল যে বাঙ্গালীর অতি নিজস্ব সম্পদ, তাহাও বাঙ্গালীর রসানুভবের ও রসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যটিকেই ধরিয়া দেখাইতেছে। সে বৈশিষ্ট্য কি? না

প্রাণের উদ্বেগ উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের তীব্র ভাবালুতা, সুকুমার মর্ম্মের কেমন অন্ধ একাগ্র তন্ময়তা।

এমন জিনিষটি পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। আমার চোখে ত পড়ে না, নির্জ্জলা ভাবাবেগ দিয়া কোথায় এমন একটা কাব্যজগতই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে মেনান্দের (Menander) ও লাতিন সাহিত্যে কাতুল্ল (Catullus) ছিলেন; ফরাসীর রঁসার (Ronsard), জর্ম্মনীর হায়েন (Heine) ও ইংরাজের বর্ন্‌স্‌ (Burns) বা কিয়ৎপরিমাণে শেলীর (Shelley) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের সকলেরই খুব তীব্র একটা ভাবোল্লাস বা lyric enthusiasm ছিল, সন্দেহ নাই। ইঁহারা ছাড়া আরও অনেকানেক কবির মধ্যে যে এই জিনিষটি অল্পবিস্তর পাওয়া যায় না, এমনও নয়; কিন্তু মোটের উপরে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখি এই ভাবোল্লাসকে শৃঙ্খলিত সুসংহত সুষীম করিয়া রাখিয়াছে আর একটা বৃত্তি, একটা চিন্তাশীলতার সবল রেখা—সে চিন্তা অবশ্য শুধু মস্তিষ্কপ্রসূত তর্কবুদ্ধিজাত নাও হইতে পারে, তাহা হয়ত হৃদয়াবেগের স্পর্শে জাগরিত আন্দোলিত আর এক ধরণের জ্ঞানভূমি; তবুও তাহাতে পাই একটা সজাগ সমর্থ বুদ্ধিরই আভাস, মনে হয় হৃদয়াবেগ সেখানে মস্তিষ্কেরই একটা ঊর্দ্ধতর প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ রূপান্তরিত হইয়া সুঠাম অর্থপূর্ণ স্থিরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালীর কাব্য-প্রেরণা যেন হৃদয়ের প্রাণের স্তরের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া চলিয়াছে, এই স্তরে আবদ্ধ থাকিয়া শুধু এই স্তরেরই গভীরতর অন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; মস্তিষ্কের অন্বীক্ষা ও অন্বয় তাহাতে কিছু

নাই, তাহাতে আছে একান্ত চিন্তাবেগেরই অন্বীক্ষা ও অন্বয়। তাই বাঙ্গালীর কবিত্ব যেন স্রোতের মত কোমল, তরল, নিত্যগতিময়; কোন মুহূর্ত্তে কোনরকম কাঠিন্য বা স্থৈর্য্য সে লাভ করে নাই।

শেক্সপীয়রের এই গীতিকবিতাটি আমাদের সকলেরই হয়ত জানা আছে—

Take, Oh! take those lips away,
That so sweetly were forsworn,
And those eyes, the break of day,
Lights that do mislead the morn:
But my kisses bring again,
Bring again—
Seals of love, but seal'd in vain,
Seal'd in vain!

ইংরাজী সাহিত্যে এটি sheeer lyricism-এর পরাকাষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু এখানেও ভাবমত্ততার সাথে সাথে বা তাহাকে অতিক্রম করিয়া নাই কি, মস্তিষ্কের মধ্যে পৃথক একটা চিন্তারও আন্দোলন, এলিজাবেথীয় যুগের নিজস্ব একটা কারুকল্পনার লাস্য? অথবা শেলীর এই মর্ম্মোচ্ছ্বাস—

I fear thy kisses, gentle maiden,
Thou needest not fear mine!
My spirit is too deeply laden
Ever to burthen thine.

এখানে অনুভব হয় যেন সকল চিন্তাবৃত্তি মস্তিষ্কের গতি এক প্রকার স্তব্ধই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও, শুনুন এবার একটু আমাদের বৈষ্ণব কবিদের বাণী—

বঁধুয়া! কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি॥

অথবা,

সখিরে! কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

এখানে আমরা একেবারে হৃদয়ের রসের কূপে ডুবিয়া গিয়াছি, এখানে যে আবেগে আচ্ছন্ন আমরা, তাহাতে জ্ঞানবুদ্ধির কোন রশ্মির এতটুকু প্রবেশপথ নাই, মর্ম্মের কোন নিগূঢ় একতারায় এখানে ঝঙ্কার দিতেছে মর্ম্মেরই আদিম সুরটি, এখানে শুনি শুধু হৃদ্‌পিণ্ডেরই তালে তালে মন্দ্রিত এক অনাহত নাদব্রহ্ম।

ইহাই বাঙ্গালীর কবিত্বের বনিয়াদ, আর ইহাই যেন চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দিতে চাহিতেছে বাঙ্গালীর কবিত্বের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম। আধুনিক বাংলার কবি-চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথও মূলতঃ এই বৈষ্ণবভক্তদিগেরই উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব—এবং হয়ত অনেকখানি তাঁহারই কল্যাণে আধুনিক বাংলারও বিশেষত্ব এইখানে যে, পূর্ব্বতন কবিদের স্বভাবসিদ্ধ একমুখী চিত্তাবেগ এখন বহুবিধ চিন্তার সেবায় নিযুক্ত হইয়া বিচিত্র ও প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। তবুও একটা কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সত্বেও, আধুনিক কালধর্ম্মের প্রভাব সত্বেও, বাংলার চিন্তা ও চিত্ত

মিলিয়া মিশিয়া এখনও সে নিবিড় রসায়ন তৈয়ার করিতে পারে নাই, যাহা কাব্যের কবিত্ব; এখনও যেন মনে হয় ঐ দুইটি বস্তু তেল ও জলের মত বাঙ্গালীর কাব্যে পাশাপাশি থাকিয়াও আলাদাই রহিয়া গিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে সে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে নাই। বঙ্গীয় কবির চিত্ত চিন্তার ক্ষেত্রে আপনাকে তুলিয়া ধরিতে হয়ত চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না; প্রাণকে জ্ঞানের মধ্যে উঠাইয়া কি প্রকারে রূপান্তরিত করিয়া ধরিতে হয়, সে রহস্যের সন্ধান বাংলার কবিপ্রতিভা এখনও পায় নাই। আর দ্বিতীয় পথ যে, চিন্তাকে চিত্তের স্তরে নামাইয়া আনা, চিত্তের খোরাকরূপে ধরিয়া দেওয়া—তাহা কথঞ্চিৎ বাঙ্গালীর স্বভাব ও স্বধর্ম্মের অনুকূল হইলেও, সেখানেও সম্যক সিদ্ধিলাভ সে করে নাই। এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় বাঙ্গালী কবি যাহা করিতেছে তাহা প্রধানত চিন্তাকে আবেগের রঙে একটু রঙীণ করিয়া ধরা, মস্তিষ্ককে একটা প্রাণের বাহ্য আবরণ পরাইয়া দেওয়া, অথবা আবেগস্রোতের মধ্যে বিসদৃশ চিন্তারাজি ছড়াইয়া দেওয়া।

বাঙ্গালীর কাব্যে তাই দেখি দুই দিক হইতে দুইরকমের অকবিত্বের ছায়া বা রসভঙ্গের দোষ স্পর্শ করিয়াছে। এক, যখন একান্ত ভাবাবেগে সে চলিয়াছে বটে কিন্তু ভাবস্থির হইতে পারে নাই, তখন গভীরে যাইতে না পারিয়া উপরের ভাসা ভাসা চাঞ্চল্যে সে উদ্বেগ উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কাব্য হইয়া পড়িয়াছে কেবল বাগাড়ম্বর (Rhetorical); আর যখন সে তাহার সৃষ্টিতে চিন্তাবস্তু কিছু দিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহা হইয়া পড়িয়াছে নীতিশাস্ত্র (Didactic)। বাঙ্গালীর কবিত্ব বেশীর ভাগ—বিশেষতঃ, আধুনিক যুগে—দেখি এই দুই প্রান্তের দুই অতিমাত্রার মধ্যে দোল খাইয়া

চলিয়াছে। তবে এই উভয় ভঙ্গীরই মূলে রহিয়াছে বোধহয় এক জিনিষ—চিন্তাকে কাব্যরসে ভিজাইবার, পরিপাক করিবার অসামর্থ্য। এই অসামর্থ্যকেই পূরণ করিয়া লইবার ব্যস্ততায় পড়িয়া বাঙ্গালী কবি হয় একদিকে চিন্তাকে ঠেলিয়া রাখিয়া কপট অন্তঃসারশূণ্য আবেগে কেবল শব্দজাল তৈয়ার করিয়াছে, নতুবা অন্যদিকে মস্তিষ্ককে অত্যধিক খাটাইয়া চিন্তাকে ফলাইতে গিয়া শুধু তত্ত্ব-কথা শুনাইয়াছে।

বাঙ্গালীর কবিত্ব সার্থক হইয়াছে তখনই, যখন চিন্তার বা মস্তিষ্কের কথা তাহার আদৌ মনে পড়ে নাই, সেদিকে কোন লুব্ধ-দৃষ্টি দেয় নাই বা কষ্টপ্রয়াস করে নাই; পরন্তু সহজ অনুভবের একান্ত আবেগে চলিয়া যখন সে সৃষ্টি করিয়াছে ভাবময়, ভাববিগলিত চিন্তা (vital thoughts)—বৈদিক ঋষির ভাষায় যাহার নাম মরুৎ-বাহিনী—যতক্ষণ তাহার চিন্তা চিত্তাবেগেরই শ্রবণ এবং উৎসেচন। এই ভাবুকতা যতক্ষণ আপন গণ্ডী পার হইয়া যায় নাই, চলিয়াছে একটা সঙ্কীর্ণ খাতে, একটা বিশেষ অনুভবের ধারায়—তদবধি সেই সঙ্কীর্ণ-তার তীব্র তন্ময়তার জোরেই তাহা পাইয়াছে একটা নিবিড় গভীরতা, একটা প্রগাঢ় উপলব্ধি। বঙ্গীয় কবির বুক ফাটিয়া বাহির হইয়াছে এই যে উচ্ছ্বাস—

বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞিও সে অবলা নাম—

এই অন্ধ ভাবমুগ্ধতা চিন্তাবৃত্তির কাছেকিনারায় দিয়াও যায় নাই, তর্কবুদ্ধির সকল ব্যাকরণ একটা দুর্ব্বার আবেগে হেলায় ভাসাইয়া দিয়াছে; অথচ কি এক একাগ্র তীব্রতার তীক্ষ্ণতার ফলে দেখি সে

অনুভব কেমন প্রায় চক্ষুষ্মান জ্ঞানভাস্বরই হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানের আছে একটা উপলব্ধি। জ্ঞানের আছে সাক্ষাৎ দৃষ্টি, আর ভাবের আছে সাক্ষাৎ স্পর্শ—উভয়ই অপরোক্ষ উপলব্ধি। বঙ্গীয় কবির মধ্যে ঋষির উজ্জ্বল পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি তেমন নাই, আছে ভাবুকের ও মরমীর অপরোক্ষ স্পর্শালুতা।

কবিত্বের এই যে দুইটি উৎস, ইহাদিগকে ধরিয়া দুই প্রকারের কবিতা সৃষ্ট হইয়াছে। কবিতায় আমরা যাহাকে বলিলাম এক জ্ঞানের ধারা আর এক ভাবের ধারা, ইংরাজ-কবি কোল্‌রিজ্ (Coleridge) তাহারই নাম দিয়াছিলেন masculine ও feminine poetry—পুরুষালী ও মেয়েলী কবিতা। আধুনিক যুগে প্রায় সর্ব্বত্রই দ্বিতীয় রীতিটিরই প্রাদুর্ভাব দেখি বেশী। যাহাকে আজকাল আমরা বলি মিস্‌টিক্ কবিতা তাহা ইহারই রকম ফের। যাহা হউক, নিছক প্রথম ধারার যে কবিতা—অর্থাৎ যে কবিতার রস ভাবলাস্যে নয় কিন্তু চিন্তাসামর্থ্যে, মাধুর্য্যে ততখানি নয়, যতখানি শক্তির ব্যঞ্জনায়,—তাহার সহিত তুলনা করিলে বঙ্গীয় কবিতার বিশেষত্বটি আরও স্পষ্ট হইবে। পাশ্চাত্যের গোটে বা সোফোক্লিস্ কিম্বা প্রাচ্যের মহাভারতকার বেদব্যাসের সৃষ্টিতে (বা তামিলখণ্ডের তিরুবল্লুবরের মধ্যে) পাই যে অর্থগৌরব, যে তপঃপ্রভা, যে একটা কাঠিন্য, তাহা বাংলার নরম মাটিতে ভিজা হাওয়ায় বিকশিত হইতে পারে নাই। মধুসূদনে যে একটা সংহত প্রাণশক্তির প্রকাশ দেখিয়াছিলাম, অথবা বিবেকানন্দের দুই চারিটি কবিতায় যে সবল মস্তিষ্কের কিছু আভাস পাইয়াছিলাম, তাহা বাঙ্গালীর কাব্যপ্রতিভায় আপনার বস্তু হইয়া উঠিল কই? বাঙ্গালীর যতটুকু খাঁটি কবিত্ব, তাহা ফুটিয়াছে

কেবল বৈষ্ণব কবিতায় ও বৈষ্ণব-ভাবের কবিতায়। * বাঙ্গালী কবি তাহার এই সঙ্কীর্ণ রসাল-চিত্তকে যখনই উদার ও বহুমুখী করিয়া ধরিতে চেষ্টা পাইয়াছে, অথবা তাহাতে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছে চিন্তা-জগতের বৈচিত্র্য, তখনই তাহার কাব্য দেখি বেশীর ভাগ হইয়া পড়িয়াছে পদ্য—তরল বা উচ্ছল বিবৃতি, নাই যাহাতে ইন্দ্রজাল, নাই যাহাতে কবি কীট্‌সের সেই "magic casements"-এর কোন আভাস।

বাঙ্গালীর কাব্যে এই যে বৈষ্ণব-সুরের কথা আমরা বলিলাম, একটু বৃহত্তর অর্থে তাহাই গীতিকাব্যের সুর। ফলতঃ, বাঙ্গালীর চারুসাহিত্য বিশেষভাবে গীতিকাব্যেরই সাহিত্য, এরূপ বলা অত্যুক্তি নয়। বৃহৎ বিচিত্র আয়তন লইয়া একটা সৃষ্টি, স্থাপত্যের বিশাল জটিল সৌন্দর্য্য বঙ্গসাহিত্যে যে দুর্লভ, তাহারও কারণ ঠিক এইখানে। আমাদের দেশে নাটকের যে একান্ত অভাব, তাহা আজকাল সকলেই একরকম স্বীকার করিতে প্রস্তুত। উপন্যাসেরও অভাব বড় কম নয়। আমি অবশ্য বলিতেছি নাটকের মত নাটক, উপন্যাসের মত উপন্যাসের কথা, শেক্স্‌পীয়র ও বাল্‌জাকের সৃষ্টির মত সৃষ্টি। বাঙ্গালীর নাটক যাহা আছে, উপন্যাস যাহা আছে, তাহা তখনই এবং ততটুকুই সত্য ও সুন্দর হইয়াছে, যখন ও যতটুকু তাহা গীতিকাব্যের প্রেরণায় চলিয়াছে। বাঙ্গালীর বৃহত্তর কাব্য সম্বন্ধেও

* বৈষ্ণব-ধারা ব্যতীত বাঙ্গালীর কাব্যে আছে অবশ্য শাক্ত-ধারা—কিন্তু এই পার্থক্য প্রধানতঃ বিষয়গত, উভয়ের ভঙ্গী বা মূলসুর একই। শাক্তের ভক্তি ও বৈষ্ণবের প্রেম, দুইয়েরই উৎস অভিন্ন—তাহা বৈষ্ণবী ভাব বলিলে অন্যায় হয় না।

এই কথা খাটে। ইদানীন্তন কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, ইঁহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা কতদূর প্রযোজ্য, তাহাও দেখিবার বিষয়।

বাঙ্গালী বিশেষভাবে ভক্তিমার্গের সাধক, জ্ঞানপন্থী সে সহজে হইতে চাহে না বা পারে না। ভক্তি-সাধনা বাঙ্গালীর প্রতিভাকে সঙ্কীর্ণ ও তীব্র করিয়াছে বটে, কিন্তু বিশাল ও বিচিত্র করিতে পারে নাই। বিশালতা ও বৈচিত্র্য জ্ঞানের দান। ভাবাবেগ বা অনুভবের ধর্ম্ম এই যে, একসঙ্গে সে বহুদিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না—পতঞ্জলির কথায়, এক সময়ে চোভয়ানবধারণম্, এক সময়ে তাহার দুইটি জিনিষের উপর অভিনিবেশ হয় না। এ কাজটি জ্ঞানের কাজ, বুদ্ধির কাজ। মস্তিষ্কই সেই কেন্দ্র, যাহা একসূত্রে বহুল বিচিত্র অনুভবকে সংগ্রথিত করিয়া রাখে। বুদ্ধিশক্তি, চিন্তাশীলতা সহজেই আনিয়া দেয় একটা শান্ত উদাসীনতা, উদার অপক্ষপাতিতা, একটা দ্রষ্টার ভাব,—যাহার কল্যাণে পুরুষ একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী বস্তুরাজির উপর একসঙ্গে সমান মনঃসংযোগ করিতে পারে। ঠিক এই বৃত্তিটির উপর বাঙ্গালী কবির তেমন অধিকার নাই বলিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে বৃহত্তর কাব্য, নাটক, উপন্যাস গড়িয়া উঠিতেছে না। এই সকল সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন বহুতর ও বিবিধ দেশ কাল ও পাত্রের সহিত সমান পরিচয় ও সহানুভূতি, নানাবিধ ভাবধারাকে, তাহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া,—শুধু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নয়, সুস্পষ্ট ফুটাইয়া তুলিয়া,—একটা বৃহৎ দৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা। আর সে ক্ষমতা আছে সচল মস্তিষ্কের;—বাঙ্গালীর স্বাভাবিক একরোখা ভাব-বিহ্বলতা সে ক্ষমতার অন্তরায়।

সচল মস্তিষ্কের রাসায়নিক প্রতিভা কি বাঙ্গালী কবি অর্জ্জন করিতে পারিবে না? এই প্রতিভা কি তাহার প্রকৃতির মধ্যে, অন্ততঃ সুপ্ত চেতনায় কোথাও নাই? বাঙ্গালী ভক্তিমার্গী, জ্ঞানমার্গী নয়, তাহা আমি বলিয়াছি। বাঙ্গলার মাটিতে শ্রীচৈতন্যেরই আবির্ভাব হইয়াছে, শঙ্করের আবির্ভাব হয় নাই। সত্য কথা। কিন্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ? ধর্ম্ম-সাধনায় এই যুগলপ্রতিভা যে অভিনব সুর বাঙ্গালীর চেতনায় প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, কাব্য-সাধনাতেও তাহারই অনুরূপ সুর একটা প্রকট হইয়া বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? *

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

---

* প্রবন্ধটি পড়িয়া একটা ধারণা হইতে পারে যে, আমি বুঝি বলিতেছি বাঙ্গালীর চিন্তা বা বুদ্ধি-স্থানে একেবারে শূন্য। তাই এই কথাটি এখানে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার বক্তব্য বিশেষভাবে কেবল কাব্য-সৃষ্টি লইয়া। তা ছাড়া, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক বা চিন্তাবৃত্তি যে কোথায় খেলিয়াছে, তাহা কি ধরণের ও কি দরের, সে কথা বারান্তরে ভিন্ন প্রবন্ধে আমি বলিতে চেষ্টা করিব।

গাছ

গাছের বুদ্ধি।— গাছের যে প্রাণ আছে তা আগেই বলেছি—কিন্তু বুদ্ধি আছে কিনা? বুদ্ধি টের পাওয়া যায় কাজে। গাছে যে সব কাজ করে, তা বুদ্ধির কাজ কি না?

চুম্বক লোহাকে টানে, কিন্তু তাতে চুম্বকের কোনই লাভ নেই—কাজেই লোহাকে টানা চুম্বকের বুদ্ধির কাজ নয়; চুম্বকের বুদ্ধি নেই। কিন্তু পিঁপড়ে যে ভাত টেনে নিয়ে যায়, তা'তে পিঁপড়ের লাভ আছে। ভাত টেনে নিয়ে যাওয়া পিঁপড়ের বুদ্ধির কাজ; পিঁপড়ের বুদ্ধি আছে।

গাছ যে সব কাজ করে, তা কিসের মত? চুম্বকের লোহা টানবার মত, না পিঁপড়ের ভাত টেনে নিয়ে যাবার মত?

এর উত্তর তোমরাই দিতে পারবে, যদি গাছের মোটা মোটা দু' চারটে কাজ নজর করে দেখ। কেবল এইটুকু জানা দরকার যে, কিসে গাছের ভালো হয়—কি কি মতলব তার থাকতে পারে।

গাছের যদি কোন মতলব থাকে ত তার আসল মতলব দুটো—বেঁচে থাকা আর বংশ বাড়ানো। এ দুটো মতলব আমাদেরও আছে। কিন্তু এ মতলব দুটো হাসিল করবার জন্যে তার যে হাজার হাজার ছোটোখাটো মতলব থাকতে পারে—যেমন মাটীর রস টানা, পাতাখেকো জন্তুদের তাড়ানো—তার সঙ্গে আমাদের কোন মতলব মেলেনা।

গাছের বুদ্ধি যে আমাদের মতই টনটনে, সে যে আমাদের মতই ভেবেচিন্তে মতলব খাটিয়ে কাজ করে—এই হচ্চে একদল পণ্ডিতের মত। তাঁরা বলেন গাছ কেবলই নিজেকে তার চারপাশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কি হচ্ছে তা বুঝে নিয়ে সে ত কাজ করেই—কি হতে পারে তা এঁচে নিয়েও কাজ করে। সেই দলের পণ্ডিতের কথাই সত্য বলে' মেনে নিয়ে আমরা পর পর দেখিয়ে যাব গাছের সমস্ত শরীরের কাজ—আর কি কি মতলবে সেই সেই কাজ হচ্ছে।

গাছের বীচি।— যে কোন গাছের যে-কোন বীচি নিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে যে, তার উপরে শক্ত খোলা, আর ভিতরে নরম শাঁস। এই নরম শাঁসটাই হচ্চে বীচির আসল জিনিষ—এই থেকেই নতুন গাছ হয়। যে-সব বীচির ভিতরটা পোকায় ফোঁপ্‌রা করে' ফেলে, সেই ভূয়ো বীচি থেকে, কিম্বা যে-সব বীচির ভিতরকার শাঁস গজায়নি, সেই চিটে বীচি থেকে গাছ হয় না। কিন্তু এও হয়ত তোমরা দেখে থাক্‌বে যে, উপরকার খোলাটা না থাকলে, কেবল শাঁসটুকু থেকেও গাছ হয় না। একটা গিলের খোলাকে হাতুড়ী দিয়ে ভেঙে ফেলে, একটা নারকোলের মালাকে দা দিয়ে চটিয়ে তুলে ফেলে, কিম্বা একটা লিচুর বীচির খোলাকে ছুরী দিয়ে চেঁচে তুলে ফেলে মাটীর মধ্যে হতে দাও; দেখবে তা থেকে কখনোই গাছ হবে না। কেন?

গাছ ইচ্ছা করে' তার বীচির শাঁসকে শক্ত খোলা দিয়ে মুড়ে দেয় এই জন্যে যে, তাহলে তা সহজে নষ্ট হবেনা। বীচির শাঁস আল্‌গা থাক্‌লে তা'থেকে নতুন গাছ হবার আগেই তাকে পোকায় খেয়ে

ফেল্‌বে—কি যদি পোকাতে নাও খায়, তাহলেও বেশী ঠাণ্ডা কি বেশী তাত লেগে মরে' যাবে। তাত জল না পেলে যে বীচি ফলায় না তা সত্যি, কিন্তু বেশী তাত জল পেলে হয় বীচি যায় শুকিয়ে, নাহয় ত যায় পচে। এনামেলের মত শক্ত খোলায় আঁটসাঁট করে' মোড়ক-করা বীচির সে ভয় নেই। জানা গেছে, যে ঠাণ্ডায় পারা জমে শক্ত হয়ে যায়, বাষ্প গলে' জল হয়ে যায়, সে ঠাণ্ডাও বীচির খোলা ঠেকাতে পারে।

একটা বীচিকে যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল ক'রে নজর করে দেখ, তাহলে দেখ্‌বে তার খোলার গায়ে একটী ছোট্ট জায়গা আছে, যা সব চেয়ে নরম—যেন একটী ছোট্ট ছ্যাঁদাকে কেউ পাতলা পরদা দিয়ে বুজিয়ে রেখেছে। এর মানে কি?—এর মানে এই যে, বীচি যখন ফলায়, তখন ঐ নরম জায়গাতেই ফাট ধরে আগে—আর সেই ফাটল দিয়েই কচি শিকড়টী মুখ বের করে। অবশ্য মাটীর রসে ভিজে শাঁসটাও ফোলে, খোলাটাও নরম হয়ে যায়, আর ভিতর থেকে বাড়বার চাড় ত আছেই; কাজেই রোগা লোক হঠাৎ মোটা হয়ে গেলে তার জামাটা যেমন চড়াৎ করে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, খোলাটারও ঠিক তেমনি দশা হয়। পাছে মিছিমিছি বেশীদিন খোলার মধ্যে আট্‌কা পড়ে থাকে, আর বেরবার জন্যে আঁকুবাঁকু করে, তাই গাছ তার বীচির গায়ে ঐ নরম জায়গাটী ক'রে রেখেছে। একটা নারকোলকে ছুলে তার মাথাটা টিপে দেখো, দেখবে সেখানে একটা জায়গা আছে, যা আঁতুড়ে ছেলের মাথার চাঁদির মত তল্‌তলে; ঐখান দিয়েই নারকোলের চারার শিকড়গুঁড়ি বেরোয়। নারকোলের খোলের গায়ে আর যে দুটো 'চোখের মত গর্ত্ত দেখতে

পাও, সে দুটোও অম্‌নি নরম জায়গা; তা ফুঁড়েও শিকড়গুঁড়ি বেরতে পারত—কেননা একটা নারকোল থেকে তিনটে নারকোল গাছ হবারই কথা। কিন্তু তা বেরোয় না—একটা নারকোল থেকে একটা নারকোল গাছই হয়। একটা ছোলাকে আতসী কাঁচের তলায় ধ'রে দেখলেও দেখতে পাবে, তার তলপেটে নাইয়ের মত একটী গর্ত্ত আছে।

গাছের শিকড়।—বীচি থেকে বেরিয়েই শিকড় খাড়া নীচের দিকে মুখ করে মাটির মধ্যে ঢোকে। বীচিকে কাৎ করেই পোঁত, চিৎ করেই পোঁত, আর উপুড় করেই পোঁত—শিকড় নীচের দিকে যাবেই।

শিকড় নীচের দিকে যায় জলের খোঁজে। সে জানে মাটির নীচেই জল আছে—আর সে মাটি তার সেই দিকেই, যেদিকে পৃথিবী সব জিনিষকে টান্‌ছে।

কিন্তু খানিকটা নীচের দিকে নেবেই যদি সে বুঝতে পারে সেদিকে জল নেই, তাহলে সে আর পৃথিবীর টান মানবে না; যেদিকে জল আছে, সেইদিকেই যাবে। একটা চালুনীর উপর গোটা দুই তিন মটর রেখে তাদের কলাতে দাও। মটরগুলোর শিকড় চালুনীর ছ্যাঁদা দিয়ে নীচের দিকে নামবে। চালুনীর নীচে যদি এক গামলা জল রেখে দাও, তাহলে যতই জোলো হাওয়া তাদের গায়ে লাগবে, ততই তারা নীচের দিকে নাম্‌বে। কিন্তু যদি জলের গামলাটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার জায়গায় গরম বালি বিছিয়ে দাও, আর চালুনীর উপরটায় গোটাকয়েক ভিজে সেওলা ঢেলে দাও, তাহলে সেই শিকড়গুলো বুঝতে পারবে যে তাদের নীচে শুক্‌নো হাওয়া আর উপরে জোলো হাওয়া; অমনি

তারা মুখ ঘুরিয়ে উপর দিকে উঠতে থাকবে—কেননা তারা জানে যেদিকে জোলো হাওয়া, সেদিকে জল আছেই।

আগেই বলেছি শিকড়ের রোখ্ নীচের দিকে—অর্থাৎ নীচের দিকে সে যাবেই, যদি না সেদিকে জলের কম্‌তি হয়। কিন্তু এমন যদি হয় যে, তার সাম্‌নে বাধলো শুক্‌নো বেলে মাটি, তাহলে সে কি করবে? তাহলেও সে ঐ বেলেমাটি ফুঁড়ে নীচের দিকে নামবে, যদি ঐ বেলে-মাটির তলায় জোলোমাটি থাকে। যদি বেলেমাটির বদলে একটা পাথর সাম্‌নে বাধে, তাহলেও সে ভয় খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে না—মুখ ঘুরিয়ে পাথরটার গা বেয়ে তাকে ঘুরে যাবে—আর ঘুরে গিয়েই যেমন নীচে নামছিল, তেমনি নীচে নামবে। তবে যদি ঐ পাথর কি বেলে-মাটীর তলায় জল না থাকে, তাহলে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ঠিক করে নেবে কোন্‌দিকে জল আছে—তারপর সেইদিকেই যাবে।

একটী কাঠিকে আমরা যে ভাবে চেপে মাটিতে পুঁতি, শিকড় ঠিক সে ভাবে মাটির মধ্যে ঢোকে না; সে ঢোকে অনেকটা স্ক্রুপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে, যাতে জোর লাগে কম।* পাছে তা'তেও তার নরম কচি ডগাটী মাটীর ঘসড়া লেগে জখম হয়ে যায়, তাই ডগাটী একটী টুপি দিয়ে ঢাকা—যেমন টুপি লোকে সেলাই করবার সময় আঙুলের মাথায় পরে। বট, কেয়া আর পানার শিকড়ে এই শিকড়ের টুপি খুব ভালরকম দেখা যায়।

---

* শিকড় যে স্ক্রুপের মত ঘুরে ঘুরে মাটিতে ঢোকে, তার আর একটা মানেও আছে। সোজাসুজি সূচের মত ঢুকলে সে তত খাবার জিনিষ দেখ্‌তে পেতো না, যত ঐ ভাবে ঢুকে পায়।

গুঁড়ির যেমন ডালপালা হয়, শিকড়েরও তেমনি ডালপালা হয়, তা সে মোচা-শিকড়ই হোক্, আর ঝুপো-শিকড়ই হোক্। কুচো শিকড়-গুলো আসল শিকড়ের গা থেকে আড়াআড়ি ভাবে বেরোয়—আবার কুচো শিকড়ের গা থেকে তার চেয়ে কুচো শিকড় আড়াআড়ি ভাবে বেরোয়। কুচো শিকড়ের রোখ্ আসল শিকড়ের মত নীচের দিকে নয়—কেননা তারাও যদি নীচের দিকেই নামবে, তাহলে চারপাশের জল খুঁজবে কে? তাদের রোখ্ গোড়াগুড়ি থেকেই জলের দিকে, তা কে জানে উপরে, কে জানে নীচে, কে জানে আশপাশে।

কিন্তু মাটির রস আসল শিকড়ও টানে না, কুচো শিকড়ও নয়। সে টানে এক লোম-শিকড়। এ শিকড় চুলের মত সরু—আর আসল শিকড়ের গা থেকেও বেরোয়, কুচো শিকড়ের গা থেকেও বেরোয়। রস টানতে হয় বলেই গাছের সব শিকড়ের চেয়ে লোম শিকড় বেশী। লোম-শিকড় মাটির ফি ফাঁকটি দিয়ে মাথা গলায়, যাতে না এক ফোঁটা রসও ফস্কে যায়। একটা বড় গাছের গোড়া কুপিয়ে এমন এক ডেলা মাটি তুলতে পারবে না, যার ভিতর দিয়ে একটা লোম-শিকড়ও না মাথা চালিয়েছে। লোম-শিকড়গুলোই দলে দলে বেরিয়ে এমন জোরে মাটী কামড়ে থাকে যে, একটা গাছকে উপড়ে তুলে ফেললে দেখবে তার শিকড় থেকে ডেলা ডেলা মাটি ঝুলছে। বরং লোম-শিকড় ছিঁড়বে, তবু সব মাটি ছাড়বে না—ঝাড়লেও না, ধুলেও না।

লোম-শিকড়ই যে মাটির রস টানে, অন্য শিকড় টানে না, তা এই থেকেই বুঝতে পারবে। একটা চারাগাছকে চড়চড়িয়ে টেনে তুলে আবার ভাল করে মাটির মধ্যে পুঁতে দাও, পরদিনই দেখবে তার পাতাগুলো মুস্ড়ে গেছে। তার মোটা শিকড় একটাও ছেঁড়ে নি—

ছিঁড়েছিল কেবল লোম-শিকড়, তাই সে আর মাটির রস টানতে পারছে না। লোম-শিকড়ই যে মাটির রস টানে, তা আর এক দিক দিয়েও বোঝানো যায়। পানা পাটারি, পানিফলের মত যে সব গাছ জলে হয়, তাদের ত আর জল জল করে হাতড়ে বেড়াতে হয় না, কাজেই তাদের লোম-শিকড় নেই বল্লেই হয়। ক্ষুদে পানার ত মোটেই লোমশিকড় নেই। তার যা একটা কি দুটো আসল শিকড় থাকে, তাই লোম-শিকড়ের কাজ করে।

গাছ যতই বড় হতে থাকে, তার শিকড়ও ততই বাড়তে থাকে,—কি লম্বায়, কি মোটায়, কি ডালপালায়। কেননা গাছ বড় হতে থাক্‌লেই তার বেশী খাবারের দরকার। তা ছাড়া ঝড়ঝাপ্‌টার সময় চারাগাছের শিকড়ে তত টান পড়ে না, যত বড় গাছের। গাছের সঙ্গে সঙ্গে যদি শিকড়ও না বাড়ত, তাহলে একটু ঝড় উঠলেই, কি কোন রকমে গুঁড়িটা একটু হেলে পড়লেই, গোটা গাছটা উপ্‌ড়ে যেত। শিকড় গাছটাকে নোঙরের মত পোক্ত করে মাটীর সঙ্গে গেঁথে রাখে। ডালপালা নেই বলে' ঝড়ের সময় তাল নারকোলের গায়ে ধাক্কা লাগে কম; তবু যে আম কাঁঠালের চেয়ে তারাই বেশী ওপ্‌ড়ায়, তার মানে আম কাঁঠাল যত মোটা মোটা শিকড় দিয়ে যতখানি মাটি আঁকড়ে থাকে, তাল নারকোল তা পারে না। ঝড়ের আগেই যে কলাগাছ পড়ে, সেও এই জন্যে।

গুঁড়ির তলাতেই শিকড় থাকবে, এই হচ্ছে গাছের নিয়ম; কিন্তু কখনো কখনো গুঁড়ির গা থেকেও শিকড় বেরোয়। বটগাছের ডালপালা থেকে যে ঝুরি (বোয়া) নাবে, তা তোমরা দেখেইছ। ওগুলো নাবে কেন?—ওগুলো নাবে এই জন্যে যে, বটগাছের ডাল যেমন ভারি

তেমনি লম্বা ; ওগুলো যদি থামের মত ডালের ভার না বয়, কি খুঁটির মত ডালগুলোকে চাড়া দিয়ে না রাখে, তাহলে সেগুলো মড়মড় করে ভেঙে পড়বে। তা ছাড়া ওগুলো মাটির রস টেনেও গাছকে খাওয়ায় —যেন গাছের বুড়োবয়সের ছেলে ! ওগুলোকে গাছের বেজায়গার শিকড় বলে। আর যে শিকড় গোড়াগুড়ি থেকে গাছকে খাইয়ে বড় করে তোলে, সেই হচ্ছে গাছের আসল জায়গার শিকড়। কেয়া, নারকোল, সুঁদরীর গোড়ারদিককার গুঁড়ি থেকে যে বেজায়গার শিকড় বেরোয়—তা বেরোয় এই জন্যে যে, এ সব গাছের আসল জায়গার শিকড় তেমন লম্বাও নয় শক্তও নয় যে, কেবল তার ভরসাতেই গাছ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। চৈ, গাছপান, গজ্‌-পিপুলের গুঁড়ির গাঁট থেকে যে থোপা থোপা শিকড় বেরোয়—তা বেরবার মানে এই যে, ও-সব গাছ কোন একটা খাড়া গাছকে বেয়ে ওঠে ; সে গাছটাকে জড়িয়ে ধরবার জন্যেই ঐ সব শিকড়ের দরকার। পাথরকুচির পাতাকে মাটিতে ফেলে রাখলে, পাতার কিনার দিয়ে যে বেজায়গার শিকড় বেরোয়—তার মানে ঐ শিকড়ের উপরেই নতুন গাছ হবে।

বটগাছের বেজায়গার শিকড়ের মত আরো অনেক গাছের শিকড় আছে, যা দেখতে মোটেই শিকড়ের মত নয়। বট গাছের ঝুরি দেখ্‌লে ঠিক মনে হবে সেগুলো শিকড় নয়, গুঁড়ি—যদিও আসল গুঁড়ির চেয়ে সরু। কিন্তু সেগুলো যে গুঁড়ি নয়, তা এই থেকেই বোঝা যায় যে, গুঁড়ির মত তাদের গায়ে গাঁট নেই—তাদের গা থেকে পাতাসুদ্ধ ডালপালা বেরোয় না। কিন্তু এই সব শিকড় দেখতে অনেকটা গুঁড়ির মত বলে, এদের নাম হচ্ছে রূপচোরা শিকড়।

সমুদ্রের ধারে যে গরাণ গাছ হয়, তাদের তলার দিককার গুঁড়ি থেকে 'বেজায়গার শিকড় বেরোয়—তাও রূপচোরা শিকড়, তাও দেখতে গুঁড়ির মত। ভাঁটার সময় যখন শিকড় সব জেগে ওঠে, তখন ঠিক মনে হয় গাছের গোড়ার দিককার গুঁড়িটা অনেকগুলো ফ্যাক্‌ড়ায় চিরে গেছে। এরকম শিকড় বেরবার মানে এই যে, গরাণ গাছ যে মাটিতে জন্মায়, সে হচ্ছে পেঁকো বেলে মাটি, তা'তে শিকড় তেমন এঁটে বসতে পারেনা, যেমন এঁটেল মাটীতে বসে; তার উপর জলের স্রোত তাকে কেবলই গোড়া ধ'রে ঝাঁকাচ্ছে, কাজেই এরকম কায়দা ছাড়া সে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার বেজায়গার শিকড়গুলোর ফাঁক দিয়ে হু হু করে জল বয়ে যায়—তখন ঠিক মনে হয় একটা মাকড়সা তার লম্বা লম্বা ঠ্যাংগুলোকে হাঁটু পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আগেই বলেছি শিকড় মাটির রস টানে, কিন্তু সে রস মানে শুধুই জল নয়—জলে গোলা শক্ত খাবার। * যে সব খাবার জলে গোলেনা, তাদের গলিয়ে নেবার জন্যে শিকড় নিজের গায়ের ভিতর থেকে একরকম টক রস (অ্যাসিড) বের করে। ঐ টক রসে গলানো খাবারকে সে জলের মতই টেনে নেয়।

---

* গাছের শক্ত খাবার হচ্ছে এই ক'টা—লোহা, গন্ধক, বালি, ক্যাল্‌সিয়ম, ম্যাগ্‌নিসিয়ম, পটাসিয়ম, ফস্ফরস্। লোহা যেমন একটা ধাতু, ক্যাল্‌সিয়ম, ম্যাগ্নিসিয়ম, পটাসিয়মও তেম্‌নি এক একটা ধাতু। ফস্ফরস্ কোন ধাতু নয়—গন্ধকের মতই একটা জিনিষ। ফস্ফরস্ অন্ধকারে দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলে, কিন্তু আগুনের মত হাত পুড়িয়ে দেয় না।

অর্কিডের মত যে-সব নিরীহ পরগাছা অন্য গাছের উপর পাখীর মত ভর দিয়ে থাকে মাত্র, তাদের শিকড় ত লুটে-যাওয়া শিকড় নয় যে, যে গাছের উপর গজিয়েছে সেই গাছেরই রস চুষে খাবে; আর সে শিকড় মাটি পর্য্যন্তও নাবেনা যে, মাটি থেকে রস টানবে। কাজেই সে শিকড় অন্য ফন্দীতে খাবার জোগাড় করে। তার ত দরকার মাটি আর জল। এ দুইই সে পায় বাতাস থেকে। তোমরা জান হাজার হাজার ধূলোর গুঁড়ো দিনরাত বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে—আর এও জান যে, অনেক জল বাষ্প হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে আছে। এখন, ধূলোর গুঁড়োদের এইটুকুই মজা যে, তারা খালি গায়ে থাকতে চায় না; হাওয়ার বাষ্পকে গলিয়ে জল করে নিয়ে তাই দিয়ে নিজেদের মুড়ে রাখে। এই সব জলেমোড়া ধূলোর গুঁড়ো হতে নিরীহ পরগাছার শিকড় খাবার বের করে নেয়। তাছাড়া যে গাছের উপর ঐ সব পরগাছা জন্মায়, তার ছালের ফাটলের মধ্যেও শিশির বৃষ্টিতে ভেজা ধূলো থাকে। পরগাছার শিকড় ঐ ফাটলের মধ্যে ঢুকে ঠিক যেন মাটির রস চুষে খায়। টোকা পানার মত যে সব গাছের শিকড় জলে থাকে, তাদের জলচরা শিকড়, আর অর্কিডের মত নিরীহ পরগাছাদের বাতাসচরা শিকড় খুবই নরম; কিন্তু যে সব গাছ মাটী থেকে রস টানে তাদের মাটীচরা শিকড়, আর রাক্ষুসে পরগাছাদের শিকড় বেশ শক্ত—কেননা শক্ত জিনিষের মধ্যে তাদের ঘুরতে হয়।

গাছের গুঁড়ি।—বীচি থেকে বেরিয়েই ক'ল সোজা উপর দিকে ওঠে। যদি বীচি বেশী মাটির নীচে পোঁতা থাকে, তাহলে কলের মাথাটি কেন্নোর মত কুঁকড়ে মাটি খুঁড়ে ওঠে, পাছে মাটির

ঘষড়ায় জখম হয়ে যায়; আর মাটির উপরে উঠেই পাক খুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ক'ল যখন বড় হয়ে পাতা বের করে, তখন তাকে গুঁড়ি বলে।

গুঁড়ি উপরে ওঠে আলোর খোঁজে। যদি সোজা উপর থেকে আলো না আসে, তাহলে যেদিক থেকে আলো আসে সেইদিকেই গুঁড়ি বেঁকে যায়। একটা অন্ধকার ঘরের জানলার কাছে টবে করে একটা চারাগাছ রেখে দাও—দু'চারদিন পরেই দেখবে ডালপাতাসুদ্ধ গুঁড়িটা বাইরের আলোর দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

পাতায় যে গাছের খাবার রান্না হয়, তা আগেই বলেছি। কিন্তু যখন ক'ল বা কচি গুঁড়ির গায়ে পাতা বেরোয়নি, অথচ শিকড় রস টান্‌ছে, তখন খাবার রাঁধে কে?—খাবার রাঁধে বীচিপাতা। ক'ল বুঝেসুঝেই অনেক সময় বীচিপাতাকে কাঁধে করে' মাটির উপরে ঠেলে ওঠে। একটা তেঁতুলের কচি চারার দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে এ কথা ঠিক কিনা। গুঁড়ির গায়ে দু'চারটে পাতা বেরলেই বীচিপাতা খসে' পড়ে' যায়।

গুঁড়ির গা নলের মত সমান নয়; তার গায়ে গাঁট আছে। সব গুঁড়ির গাঁট তেমন চোখে মালুম হয় না—যেমন আখ বাঁশ সুপুরীর হয়। দুই গাঁটের মাঝামাঝি জায়গাকে পাব বলে। তোমরা সকলেই জান যে, পাবের চেয়ে গাঁট বেশী শক্ত আর নীরেট। মাঝে মাঝে গাঁট আছে বলেই গাছের গুঁড়ি অত মজবুত—ঝড়ঝাপ্‌টায় টপ্‌ করে' ভেঙ্গে পড়ে না। হাড়জোড়া গাছের পাবের চেয়ে গাঁটগুলোই সরু সরু—সেইজন্য তার গুঁড়িটা দেখতে শিকলের মত। কিন্তু গাঁটগুলো যে পাবের চেয়ে শক্ত, তাতে ভুল নেই।

যে সব গাছের গুঁড়ি খুব সরু আর লগ্‌বগে, ঝড়ের সময় তাদের তলার গুঁড়িতেই টান পড়ে বেশী। এই জন্যে তাদের আগার গুঁড়ির চেয়ে তলার গুঁড়ির গাঁটগুলো কাছাকাছি।

যে সব গাছের গুঁড়ি মোটা আর শক্ত, তারাও এমন জিনিষ দিয়ে আগাগোড়া তৈরী যে, নোয়ালেও ভাঙতে চায় না। বেতকে যে কি রকম বেঁকানো যায়, তা তোমরা জান; কিন্তু অতটা না বেঁক্‌লেও সব গাছই যে কিছু না কিছু বেঁকে, তা ঝড়ের সময় যে-কোন গাছের দিকে চাইলেই দেখতে পাবে। সুপুরী গাছ ত মাটীর উপর শুয়ে পড়ে আর উঠে দাঁড়ায়—দেখলে মনে হয় যেন রাগের চোটেই মাথা কুট্‌ছে!

গুঁড়ি গাঁট থেকেই পাতা বের করে। কোন গুঁড়ির গাঁট থেকে একটী করে পাতা বেরোয়—যেমন লাউ, বাঁশ, পেঁপে, জবার; কোন গুঁড়ির গাঁট থেকে দুটো করে' পাতা বেরোয়—যেমন গন্ধরাজ, তুলসী, ঘলঘসের; আবার কোন গুঁড়ির গাঁট থেকে অনেকগুলো করে' পাতা বেরোয়—যেমন ছাতিম, ডালিমের।

প্রতি পাতার উপর-কোলে একটী ক'রে ছোট কুঁড়ি থাকে। ঐ কোলকুঁড়িই পাতাসুদ্ধ ডাল হয়ে ফুটে বেরোয়। পাতা খসে' গেলেও, কোলকুঁড়ি প্রায় খসে না।

গুঁড়ির মাথাতেও একটী কুঁড়ি থাকে, যাকে মাথার কুঁড়ি বলে। মাথার কুঁড়ি বাড়লেই গুঁড়ি লম্বাতে বাড়ে। ডাল হচ্ছে গুঁড়ির ফ্যাক্‌ড়া, সরু গুঁড়ি বল্লেও চলে: তাই ডালের মাথাতেও মাথার কুঁড়ি আছে।

সব কোলকুঁড়িই যে ডালপালা হয়ে ফুটে বেরোয় তা নয়; তা যদি বেরতো, তাহলে এক একটা গাছ আশেপাশে বেড়ে এক একটা

পাহাড়ের মত হয়ে পড়ত—গুঁড়িটা ডালপালার ভার বইতে পারত না, শিকড়গুলো গাছের খাবার জোগাতে পারত না, আর পাতা-গুলোকে কাজ না করে' চুপ করে' বসে থাকতে হত; কেননা অত পাতা গাছের দরকারই নেই। তাই বেশীর ভাগ কোলকুঁড়িই হয়ে অবধি ঘুমিয়ে থাকে।

ঘুমন্ত কুঁড়িরা যে একেবারেই জাগে না, তা নয়—দরকার হলে জাগে। অনেক সময় দেখা যায় একটা ঘুনধরা সজনে গাছ ঘাড়মোড় ভেঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ে' গেল, কি একটা তেঁতুল গাছের ডালপালা সব বাজ পড়ে জ্বলে' গেল। গাছটার নেড়া গুঁড়ি অনেক দিন ধরে' মড়ার মত পড়ে' রইল, তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেই মরা-গুঁড়ির গা থেকেই কচি কচি ডালপালা তড়বড়িয়ে ফুটে বেরচ্ছে—যেন সেকালের কোন মুনিঋষি এসে একটুখানি জলের ছিটে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। এ আর কিছুই নয়, যে ঘুমন্ত কুঁড়িগুলো এতকাল ধরে' পড়ে' পড়ে' ঘুমচ্ছিল,—গাছটা মরে' যায় দেখে, তারা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।

মাথার কুঁড়ির মধ্যে গুঁড়ির একেবারে কচি ডগাটি পাতায় পাতায় মোড়া থাকে। মাথার কুঁড়িটা যতই ফুটতে থাকে, ততই গুঁড়ির ডগাটি পাতা ছড়াতে ছড়াতে বেড়ে যায়। ডগার পাবটি যখন বাড়চে, তখন তলার পাবগুলো যেমন তেমনিই থাকে; থাকেনা কেবল ধান, বাঁশ, আখের মত দু-একটা গাছের। তাদের ডগার পাবটিও যেমন বাড়ে, অমনি তলার পাবগুলোকেও কে যেন টেনে টেনে লম্বা করে' দেয়। সেই জন্যেই ঐ সব গাছ দেখতে দেখতে উঁচু হয়ে ওঠে। একটা বাঁশগাছ একদিনেই দু'হাত বাড়ে। ধানগাছের বাড় আরো বেশী।

আজ বানের জলে ধানগাছের মাথার উপর তিনহাত জল দাঁড়িয়ে গেল, কাল কি পরশু দেখবে, সে জলের উপর মাথা জাগিয়েছে।

তাল, নারকোল, খেজুর, সুপুরীর মত প্রায় সব এক-বীচিপাত গাছের মাথার কুঁড়িটাই বাড়ে, কোলকুঁড়িগুলো ঘুমিয়েই থাকে। একেই ত ও সব গাছের শিকড়-গুঁড়ির জোর কম, তা'তে আবার যদি রাশি রাশি ডালপালা বেরোয়, তাহলে টেঁকাই দায়।

গুঁড়ির মাথার কুঁড়ি বেড়েই যায়, তবে কোন কোন গাছে এও দেখা যায় যে, মাথার কুঁড়িটা খানিক দূর বেড়েই ঘুমন্ত কোলকুঁড়ির মত ঘুমিয়ে পড়ল, কি ফুল হয়ে ফুটে উঠল, কি একেবারেই মরে' গেল। তখন কি হয়? গুঁড়ির বাড় কি বন্ধ হয়ে থাকে?—তা থাকে না। ঐ মাথার কুঁড়ির ঠিক নীচেই যে কোলকুঁড়িটা ঘুমিয়েছিল, সেইটেই মাথার কুঁড়ির মত হয়ে যায়—সেইটে থেকেই গুঁড়ির মত মোটা ডাল বেরিয়ে উপরদিকে ওঠে।

আসল গুঁড়ির মাথার কুঁড়িটা ঘুমিয়ে পড়লে কি মরে' গেলে কখনো কখনো তার তলার দিককার দুটো কুঁড়িই দুদিক থেকে ত্যারচা ডাল হয়ে ফুটে বেরোয়; আবার সেই ডাল দুটোর মাথার কুঁড়ি যখন ঘুমিয়ে পড়ে কি মরে' যায়, তখন তাদের প্রত্যেকের তলা থেকে আবার দুটো করে কোলকুঁড়ি ত্যারচা ডাল হয়ে ফুটে ওঠে।

এক একটা গাছের আবার মাথার কুঁড়িটা মরে' গেলে, তার তলার দিককার দশ বিশটা কোলকুঁড়ি হয়ত একসঙ্গে ফুটে ওঠে—যেন আসল গুঁড়িটা হঠাৎ দশ বিশটা ফ্যাকড়া-গুঁড়িতে চিরে গেল। ভবানীপুর বকুলবাগানের মোড়ে যে ২৭-মাথা খেজুর গাছটা আছে, তার এই রকম খামখেয়ালী বাড়। তার মাথার কুঁড়ির বাড় থেমে যেতেই

তলার ২৭টা কুঁড়ি একসঙ্গে ফুটে উঠে তার ঘাড়ে ২৭টা মাথা চাপিয়ে দিয়েছে।

আসল গুঁড়িটাকে ডালপালা আর পাতার বোঝা বইতে হয় বলে' গাছও যত বাড়তে থাকে, সেও তত মোটা হতে থাকে। কেবল তাল, নারকোলের মত গোটাকয়েক গাছ মাথায় বাড়লেও গায়ে বাড়ে না। তবে তাদের তা'তে বিশেষ লোকসান নেই, কেননা তাদের ডালপালা হয় না যে বইতে হবে।

থামের যেমন তলার দিকটা উপর দিকের চেয়ে মোটা, গাছেরও ঠিক তাই। এতে এই সুবিধা হয় যে, গাছ বেশী ভার বইতে পারে।

গুঁড়ির গা সব গাছের সমান নয়; কোন গাছের তেলা,—যেমন বাঁশ, পেয়ারা, ইউক্যালিপ্‌টসের; কোন গাছের খস্‌খসে—যেমন আম, নিম, কুলের; কোন গাছের গুঁড়ি শোঁয়ায় ভরা—যেমন লাউ, তুলসী, সূর্য্যমুখীর; কোন গাছের গুঁড়ি কাঁটায় ভরা—যেমন গোলাপ, পদ্ম, কণ্টিকারী, কাঁটানটে, কুলেখাড়ার; কোন গাছের গুঁড়ি আগাগোড়া কুঁড়ো-মাখানো—যেমন আকন্দের; কোন গাছের গুঁড়ি চট্‌চটে—যেমন তামাক, লাল ভেরাণ্ডার; কোন গাছের গুঁড়িতে খোঁচা দিলে দুধের মত কস্ বেরোয়—যেমন পেঁপে, রাংচিতে, করবীর; কোন গাছের গুঁড়ি চির্‌লেই ঝরঝর করে আঠা পড়ে—যেমন জিউলী, সজ্‌নে, রবারের।

আঠাই বল, কসই বল, শোঁয়াই বল, কুঁড়োই বল, কাঁটাই বল,—এ সব গাছের খা[illegible]য়াল নয়, এর মানে আছে। এই দিয়েই গাছ পোকামাকড়, জন্তুজানো[illegible]রের [illegible]াত থেকে নিজেকে বাঁচায়। এক রকম গুবরে পোকা আছে যারা গাছের গা ফুঁড়ে তার মধ্যে ডিম

পাড়তে যায়। রবার গাছের গা ফুঁড়লেই তারা ঝাঁঝালো আঠায় জড়িয়ে মারা যায়।

গুঁড়ি হয় কেন? গুঁড়ির আসল কাজটা কি?—তোমরা হয়ত বলবে গাছকে খাড়া করে' ধরে' রাখা। গাছকে সে খাড়া করে' ধরে' রাখে ঠিক—কিন্তু সব গুঁড়িই ত আর খাড়া গুঁড়ি নয়; লতানে গুঁড়িও ত আছে। গাছকে খাড়া করে' রাখবার জন্যই যদি গুঁড়ির দরকার হবে, তাহলে লতানে গাছের গুঁড়ি হতই না। এবার হয়ত তোমরা বলবে গুঁড়ির আসল কাজ হচ্ছে পাতা ফুল ফলের ভার বওয়া। তাই যদি হবে, তাহলে আনারস কচু ঘৃতকুমারী মুরগার মত যে সব গাছের সব গুঁড়িটাই চোরা গুঁড়ি, অর্থাৎ মাটীর মধ্যে পোঁতা—সে সব গাছের গুঁড়ি হয় কেন?—তোমরা হয়ত এবার খাবার জমানো, খাবার চালাচালির কথা পাড়বে, কিন্তু ও সব কাজ ত গাছের পাতাও করতে পারে, শিকড়ও করতে পারে - অনেক গাছে করে'ও থাকে। চাপ্‌ড়া ঘাসের যে চোরা গুঁড়িও নেই, দেখা গুঁড়িও নেই—সে বেঁচে আছে কি করে'? তার যে শিকড়ের উপরেই পাতা। পাতাগুলো এলানো চুলের মত মাটির উপর গা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে, অর্থাৎ মাটীই তাদের ভার বয়।

ঠিক্। কিন্তু চাপ্‌ড়াঘাসের একটা কি মস্ত অসুবিধে জানো? বেশী আওতায় জন্মালে সে বাঁচেনা। দুর্ব্বা ঘাসের কিন্তু সে অসুবিধে নেই। সে যতই আওতায় জন্মাক, তার লতানে গুঁড়িটাই তাকে আওতা থেকে বের করে আলোয় নিয়ে যায়। গুঁড়ির আসল কাজ হচ্ছে পাতাগুলোকে আলোর মুখ দেখানো।

যদি বল সব গুঁড়িই তাহলে লতানে হয় না কেন? তাহলে বলব

যে উপর দিকে উঠলে যে গাছ বেশী আলো পাবে, ফাঁকা আলো পাবে। ধর—একটা মস্ত বন, কেবল ঘেঁসাঘেঁসি ঝোপগাছ। সেখানে দুর্ব্বা ঘাসের লতানে গুঁড়ি আর মাটি বেয়ে কত দূর দৌড়বে? তা ছাড়া পাতাখেকো জন্তুরা যাতে না পাতা পর্য্যন্ত নাগাল পায়, সে জন্যও গাছ উঁচুতে ওঠে। তা ছাড়া এক একটা গাছ বেয়াড়া লম্বা হয় অন্য গাছের সঙ্গে টক্কোর দিয়ে—কেননা সকলেই চায় আমার মাথায় পুরো ফাঁকা আলোটা লাগুক্।

লতানে গাছ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না কাজেই কি করে? গড়িয়ে গড়িয়েই যতটা পারে আলোর মুখ দেখবার চেষ্টা করে। পুঁই, তরমুজ, পটল, শুষ্‌নি, রাঙা-আলু, থুলকুড়ি, আমরুল—এই সব গাছের গুঁড়ি মাটির উপর দিয়ে লতিয়ে চলে। এদের মধ্যে আবার শুষ্‌নি, থুলকুড়ি, রাঙাআলু, আমরুল একটু করে' যায় আর একটা গাঁট থেকে শিকড় বের করে—যেন হাঁপিয়ে ওঠে আর শিকড় বের করে' জিরোয়। দুর্ব্বা, আলু, হলুদের গুঁড়ি মাটির উপর দিয়ে যায় না, মাটির ভিতর দিয়ে দৌড়য়। তারা যেন একরকম মাটির ডুবুরি! পানকৌড়ির মত এক নিঃশ্বাসে খানিক দূর গিয়ে ভুস্ করে ভেসে ওঠে, আর যেখানেই ভেসে ওঠে সেইখানেই উপর দিকে একটা সরু ডাল বের করে' আবার ডুব দেয়।

অনেক লতানে গাছ কিন্তু মাটিতে লতিয়ে খুসী হয় না—তারা খাড়া গাছের মত উঁচুতে উঠবে। কি করে উঠবে?—পাশেই যদি কোন খাড়া গাছ কি পাঁচীল থাকে, তাহলে সেই পর্য্যন্ত লতিয়ে গিয়েই তাকে বেয়ে উঠবে। এই বেয়ে ওঠার জন্যে তারা মাথা খেলিয়ে নানান্ ফিকির বের করেছে। কেউ বা খাড়া গাছটাকে

পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে,—যেমন সীম, গুলঞ্চ, মাধবীলতা, বরবটী, স্বর্ণলতা, তরুলতা। কেউ বা গুঁড়ি থেকে বেজায়গার শিকড় বের করে' তাই দিয়ে অন্য গাছকে আঁকড়ে ধরে' ওঠে,—যেমন চৈ, গাছপান, গজপিপুল, গোলমরিচ। কেউ বা বেজায়গার শিকড়ের বদলে বঁড়শীর মত কাঁটা বের করে' সেইগুলো অন্য গাছের গায়ে বাধিয়ে তাদের মাথায় চড়ে' বসে - যেমন কাঁটালিচাঁপা, কেলেকোঁড়া, গোলাপ, শিয়াকুল, বেত, চীনেলতা, লতানে বাঁশ। কোন কোন লতার গা থেকে আবার লম্বা লম্বা আঁকড়া বের হয়। ঐ আঁকড়াগুলো যেই কোন জিনিষে ঠেকে, অমনি তাকে জড়িয়ে ধরে,—যেমন লাউ, কুমড়ো, শশা, তরমুজ, ঝুম্‌কোলতার; আঁকড়াগুলো স্প্রিং-এর মত প্যাঁচ খাওয়া, টান পড়লে অনেকখানি লম্বা হতে পারে, কাজেই টপ্ করে' যে ঝড়বাতাসে ছিঁড়ে যাবে, সে জো নেই। বিলাতে ভার্জ্জিনিয়া ক্রীপার বলে একরকম লতা আছে, যা তেলা পাঁচীল বেয়ে উঠতে পারে, পিছ্‌লে পড়ে না। তার আঁক্‌ড়ার ডগায় ছোট ছোট বোতামের মত কতকগুলো জিনিষ হয়, যা এম্‌নি চট্‌চটে যে দেয়ালের গায়ে তাই এঁটে এঁটে সে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়।

গাছ যে আঁক্‌ড়া বের করে, সে আঁক্‌ড়া সে পায় কোথায়? গাছের কোল-কুঁড়িই বদ্‌লে আকড়া হয়ে যায়। ঝুম্‌কোলতার একটা আঁক্‌ড়া যদি একটু ভাল করে' দেখ, তাহলেই দেখবে সে বেরিয়েছে পাতার ঠিক উপরকোল থেকে, আর পাতার উপরকোলে যে কোলকুঁড়ি থাকবার কথা, সে কোলকুঁড়ি নেই। হাড়জোড়া আর গোয়ালেলতার মাথার কুঁড়িই বদ্‌লে আঁক্‌ড়া হয়ে যায়।

কোলকুঁড়ি যে শুধু আঁক্‌ড়া হয়েই বেরোয় তা নয়, দরকার হলে

কাঁটা হয়েও বেরোয়। বেল, বুঁচ, বাগানবিলাসে গাছের কাঁটা হচ্ছে রূপচোরা কোলকুঁড়ি।

খাড়া গুঁড়ির খাড়া উপর দিকে ওঠবার কথা হলেও, অনেক সময় সে তা করতে পারে না। হয়ত তার মাথার উপর অন্য দু' তিনটে বড় গাছ এমনি ঝুঁকে পড়েছে যে, এক কোণের একটু ফাঁক দিয়ে মাথা গলানো ছাড়া তার উপায় নেই,—কাজেই তার গুঁড়িটাকে বেঁকাতে হয়। ফাঁকা মাঠের গাছকে অনেক সময় ঝড়ই ঘাড় ধরে' বেঁকিয়ে দিয়ে যায়। সমুদ্রের ধারে যেখানে দিনরাত্তিরই জোর বাতাস বইছে, সেখানকার অনেক গাছই এইরকম। ঘাড় তুলে ঘাড় ভাঙবার চেয়ে তারা ঘাড় নুইয়ে থাকাই ভাল বুঝেছে।

আমেরিকায় মেক্সিকো দেশে একরকম অর্কিড পরগাছা আছে, যা নীচের দিকে মাথা করে' ঝোলে। তার মানে, সে দেশে খুব বৃষ্টি হয়। মাথা উপর দিকে থাক্‌লে জলের তোড়ে মাথা ভেঙে যেতে পারে। তা ছাড়া বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলেই যে জোলো হাওয়া ওঠে, তা হেঁটমাথা করেই তার ধরবার সুবিধে হয়।

তোমরা দেখেছ, কচি বেলায় গুঁড়ির রং থাকে সবুজ, বড় হলেই হয়ে যায় কটাসে। এর মানে চারাগাছের পাতা কম, অথচ ক্ষিদে বেশী, কেননা ধাঁ ধাঁ করে বাড়তে হবে; কাজেই তার গুঁড়িও গাছসবুজ দিয়ে পাতার মত খাবার রাঁধে। আর বড় গুঁড়ির রং কটাসে হয় এই জন্যে যে, তাকে খাবার রাঁধতে হয় না, খাবার জমাতে হয়; রাঁধা খাবারে বেশী তাত আলো লাগ্‌লে, তা নষ্ট হয়ে যায়। কটাসে রঙের ভিতর দিয়ে তাত আলো চুঁইয়ে যায় কম।

যে সব গাছের খুব কুচি কুচি পাতা—যেমন বাজবরণ; কি মোটেই পাতা নেই—যেমন ফণীমনসা (নাগযাণী); * সে সব গাছের খাবার রাঁধেও গুঁড়ি, খাবার জমায়ও গুঁড়ি। তাদের গুঁড়ি পাতার মতই সবুজ, অথচ খাবার-পোরা বলে' শাঁসালো।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

* ফণীমনসার গুঁড়ি একে পাতার মত সবুজ, তা'তে পাতার মত চেপ্টা না হলেও খুব চেপ্টা—কাজেই অনেকে পাতা বলে ভুল করে। কিন্তু ও যে পাতা নয়, রূপচোরা গুঁড়ি—তা এই থেকেই বোঝা যায় যে, ওর গায়ে গাঁট আছে। আর ও পাতা হলে ও-র দুপিঠই সমান সবুজ হত না।

রূপচোরা গুঁড়ি অনেক সময় শিকড়ের মতও দেখতে হয়। আলু, হলুদ, কচু, ওলের গেঁড় যে, মূলোশালগমের মত শিকড় নয়—তা হয় গাঁট, না হয় কুঁড়ি, না হয় পাতা, না হয় পাতা খসার দাগ দেখে বুঝবে। আলুর গায়ে যে পাতলা আঁশের মত খোসা দেখ, সেই হচ্ছে পাতা—মাটির নীচে অন্ধকারে থেকে অন্য পাতার মত সবুজ হতে পারে নি; আর যেগুলোকে আলুর চোখ বলে জানো, সেইগুলোই পাতার কোলকুঁড়ি। কচুর কোলকুঁড়িগুলোকে আমরা কচুরমুখি বলে' থাকি।

লোহার ব্যথা।



ও ভাই কর্ম্মকার!
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম্ম আর?
কোন্ ভোরে সেই ধ'রেছ হাতুড়ি রাত্রি গভীর হ'ল,
ঝিল্লিমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোলগো যন্ত্র তোল।
ঠকা ঠাঁই ঠাঁই—কাঁদিছে 'নেহাই', আগুন ঢুলিছে ঘুমে;
শ্রান্ত সাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আগেছে 'ছেনি' চুমে।
দেখগো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি,—
ক্লান্ত নিখিল, করগো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি।

রাত্রি দুপ'রে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে;
ভাঙিলে গড়িলে—সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা করে।
কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবিসম;
কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ্য দাহ মম।
অজানা দুজনে গলায়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ;
ধড় হ'তে কভু বাহুল্যবোধে মাথা কেটে দিলে বাদ।
ঘন ঘন ঘন পরিবর্ত্তনে আপনা চিনিতে নারি;
স্থির হয়ে যাই ভাবিবারে চাই—পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।

আগুনের তাপে, সাঁড়াসির চাপে আমি চির নিরুপায়;
তবু সগর্ব্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়— হোক্‌না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ ?
তোমার হস্তে ইস্পাত হই, সহি শান পান পোড়,—
রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাহে কিবা সুখ মোর ?
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা—দিন রাত মরে খেটে,
না বুঝে চাতুরি, নেহাই হাতুড়ি, ভাই হয়ে ভাইএ পেটে!

ও ভাই কর্ম্মকার!
রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্ম্মভার;
কহগো বন্ধু, কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি ?
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি ?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মার্‌ফতি ?
কি কহিছ ভাই ? আমি হব তুমি, এই প্রেম সহি যদি ?
পিটনের গুণে লোহা কবে হায়, পায় কামারের গদি!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

কাগজ।

('আনন্দবাজারে'র জন্য বিশেষভাবে লিখিত)

ইংরাজরা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের জন্মদিনে, many happy returns of the day, এই বাঁধা গৎ আওড়ে থাকেন। এর অর্থ—এদিন যেন বার বার ফিরে আসে; সংক্ষেপে তোমার যেন বছর বছর পুনর্জন্ম হয়।

আমিও আপনাদের কাগজ সম্বন্ধে এই বিলিতি দস্তুর শুভকামনা করছি।

এ কামনা আমার কেবল মুখের কথা নয়। সংবাদপত্র জিনিষটে কি, এবং কি জন্য সকলে তার উন্নতি কামনা করতে বাধ্য, তা জানলে আমার কামনার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কারও আর সন্দেহ থাকবে না। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলছি।

সভ্যতা জিনিষটি কি?—তার কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা অদ্যাবধি কোনও সভ্য মানব দিতে পারেন নি। সভ্যতার বৃদ্ধি যে মানুষের সুখের বৃদ্ধি অথবা সন্তোষের বৃদ্ধি নয়, তার প্রমাণ সভ্য-মানবের তুল্য অসন্তুষ্ট লোক আর দুনিয়াতে নেই। সভ্যতার পাণ্ডারা সভ্যমানবের অসন্তোষের নাম দিয়েছেন divine discontent—অর্থাৎ দিব্য অসন্তোষ। এ হচ্ছে সুখের লোভে সোয়াস্তির প্রতি অসন্তোষ। পৃথিবীর সব চাইতে সভ্যদেশ ইউরোপে যুদ্ধের পর থেকে শুধু এই কথাই শোনা যাচ্ছে যে—"সুখের লাগিয়া

এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল"। এর থেকেই বোঝা যায় যে, সভ্যযুগে ভবের হাট হচ্ছে নিরানন্দ বাজার।

সভ্যতার আমরা সংজ্ঞা না দিতে পারলেও তাকে চিনিয়ে দিতে পারি। তার একটি লক্ষণ অতি স্পষ্ট। এ কথা কে না জানে যে, কাগজের বাইরে সভ্যতা নেই।

কোন্ জাত কত লিখেছে বা লিখছে, তার হিসেব থেকেই আমরা সকল জাতের সভ্যতা অসভ্যতার তারতম্য নির্ণয় করি। এই দেখুন না কেন, আমরা বৈদিক যুগকে সভ্যতার আদি যুগ মনে করি, আর প্রাক্‌বৈদিক যুগকে অসভ্যতার শেষ যুগ। এ দুই পিঠোপিঠি যুগের আসল প্রভেদটা কি?—এই কি নয় যে, পরযুগের ঋক্‌বেদ বলে একখানি বই আছে, আর পূর্ব্বযুগের প্রাক্‌বেদ বলে কোনো বই নেই?

সংবাদপত্রের প্রসাদে যত লেখা হয়, তত আর কিছুতেই হয় না, হতে পারে না। সুতরাং এ সত্য স্পষ্ট যে, সভ্যতার চরম যুগ হচ্ছে কাগজের যুগ। সংবাদপত্রই হচ্ছে সভ্যতার একাধারে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে যে সাধনা করে এসেছে, এখন বোঝা যাচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেই সকল মনোবৃত্তির চর্চ্চা করা, যার ফলে সভ্যতার চরম অবস্থায় সে কাগজ লিখতে পারবে ও পড়তে পারবে। মানবসমাজ তার উন্নতির শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছে। এর পরেই তার স্বর্গারোহণ—বক্‌তে বক্‌তে।

(২)

আমাদের দেশে সংবাদপত্র তাঁরাই এনেছেন, যাঁরা এদেশে সভ্যতা এনেছেন। কিন্তু পরের আনীত ও বিদেশ থেকে আনীত বলে, সংবাদপত্র যে এ দেশে টিঁকবে না—এরূপ আশঙ্কা অমূলক।

গোল আলুও পরের দ্বারা আনীত ও বিদেশ থেকে আনীত, তাই বলে আলুর ফসল কি এদেশে কচুর চাইতে জোর ফলছে না? বরং এই কথাই কি সত্য নয় যে, এ যুগে আলুই হচ্ছে আমাদের সর্ব্বপ্রধান আহার? সংবাদপত্রও হয়ে উঠেছে তদনুরূপ আমাদের মনের প্রধান খোরাক। দেহের বলবীর্য্য আমরা যেমন আলুর কাছ থেকে সংগ্রহ করি, মনের বলবীর্য্যও আমরা তেমনি সংবাদপত্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করব,—যেমন সভ্য ইউরোপের লোক এখন করছে।

কাগজের আর একটি গুণ আছে—ও হচ্ছে মনের কাপড়। ম্যাঞ্চেস্টারের ধুতি যেমন আমাদের দেহের নগ্নতা ঢেকে রাখে, খবরের কাগজও তেমনি আমাদের মনের নগ্নতা ঢেকে রাখে। আমরা যখন সভ্য হয়েছি, তখন ও আবরণ আমরা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না। ভবিষ্যতে বড় জোর আমরা কাগজের খদ্দর বানাতে পারব। কিন্তু তারও টানা হবে বিলেতি ভাব, আর পোড়েন হবে দেশী ভাষা। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না; কেননা ভারতবর্ষের সভ্যতা চিরকালই দোসূতী।

সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধি যাঁরা দেখতে পারেন না, এমন লোক এখনও পৃথিবীতে বিরল নয়। এঁরা প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত—(১) সাহিত্যিক দল, (২) শাসনকর্ত্তার দল।

সাহিত্যিক দলের ভয় যে, সংবাদপত্রের চাপে সাহিত্য মারা যাবে; যেমন কলের চাপে তাঁত মারা গিয়েছে। এই ব্যাপারকেই বাঙ্গলায় বলে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। সাহিত্য যে মারা গিয়েছে, এ জ্ঞান কি সাহিত্যিকদের আজও হয় নি?—সে যাই হোক, আর দু'দিন যেতে দিন, দেখতে পাবেন যে, এই সাহিত্যিক শত্রুর দল সব সংবাদপত্রের

দলে ভর্ত্তি হয়েছে। সাহিত্যে ফেল করলে লোকে যে সংবাদপত্রে প্রমোশন পায়, তার উদাহরণ আমি।

শাসনকর্ত্তারা যে সংবাদপত্র ভালবাসেন না, তার কারণ পৃথিবীতে কাজের লোক কথা ভালবাসে না, বিশেষতঃ সে কথা যদি তাঁদের স্বেচ্ছামত কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে। নূতন শাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম কাজ হচ্ছে কাগজের মুখ বন্ধ করে দেওয়া। ইটালীতে মুসোলীনি ও রুষিয়ায় লেনিন, উভয়েই নিজের মুখপত্র ছাড়া অপর সকল কাগজ বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের দেশের সুমুখে মস্ত একটা ফাঁড়া আছে। যেদিন স্বরাজ হবে, সেদিন অনেক কাগজ চাপা পড়বে। কিন্তু সংবাদপত্র এ ফাঁড়াও কাটিয়ে উঠবে। যিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের গত একশ বৎসরের আইনকানুনের ইতিহাস জানেন, তিনি অবশ্যই জানেন যে, Press Act press-কে চাপতে পারে নি। যার পিছনে স্বয়ং প্রকৃতির ঠেলা আছে, কার সাধ্য রোধে তার গতি! প্রকৃতি অন্ধ বটে, কিন্তু বেজায় জোয়ান। আর যখন গতি মানেই উন্নতি, তখন সংবাদপত্রের উন্নতি অনিবার্য্য।

সুতরাং বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায় যতই কেন ছটফট করুন না—সংবাদপত্রের প্রসার ও প্রচার দিন দিন বেড়েই যাবে। সংক্ষেপে ও-বস্তু অচিরে কচুরিপানার মত বাঙলাদেশকে ছেয়ে ফেল্‌বে।

(৩)

আমি যে অন্তরের সঙ্গে আপনাদের কাগজের আয়ুর্বৃদ্ধির কামনা কর্‌ছি, তার একটি বিশেষ কারণ আছে। এক বিষয়ে আমি ও "আনন্দবাজার" সমবস্থ ;—"আনন্দবাজার"ও কোন পার্টির মুখপত্র

নয়, আমিও কোন পার্টির মুখপাত্র নই। "আনন্দবাজার" No-changer, আর আমি Independent। No-changer যে No-party, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ সত্যকার পার্টি হচ্ছে all-changer।

এখন Independent নামক জীবটির পরিচয় দিই। সমাজে লোকে যেমন জাত হারালে বোষ্টম হয়,—পলিটিক্সে লোকে তেমনি জাত হারালে Independent হয়। আমরা জনকতক যে পলিটিকাল জাত হারিয়েছি, তার কারণ আমরা জাত রক্ষা করতে চেয়েছিলুম সনাতন পদ্ধতি অনুসারে—নতুন জিনিষ থেকে আলগা হয়ে।

এখন যে আবার কোনও জাতে ঢুকতে পারছি নে, তার কারণ সব দলই বলেন যে, ভলাণ্টিয়ার হয়ে আমাদের দলে যোগ দাও—অর্থাৎ "ঘরের খেয়ে তুমি আমাদের হয়ে কাউন্সিলের মোষ তাড়াও।" উপরন্তু সকল দলই আমাকে দিয়ে স্বদলের গুণ গাওয়াতে চান, কিন্তু কেউই আমাকে নুন খাওয়াতে চান না। আমি অবশ্য নগদ বিদায়ের প্রার্থী নই। কিন্তু হয় ministerগিরি, নাহয় অন্ততঃ কাউন্সিলের Presidentগিরির লোভটাও ত আমাকে দেখানো উচিত। কিন্তু সে লোভ আমাকে কেউ ভুলেও দেখান না। সখের সাহিত্যিক গুণ্ডাগিরি কর্‌বার যদি আমার প্রবৃত্তি থাকে, শক্তি থাকে, আর সেই সঙ্গে থাকে অবসর—তাহলে ভাল করে সে সখ মেটাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, দলাদল নির্ব্বিচারে সকলের উপর হাত চালানো।

এ কাজের মহা সুবিধা এই যে, এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। সকলের গায়ে হাত চালালে কারও গায়ে তা লাগবে না। কারণ সকল হচ্ছে সকল,—অর্থাৎ কেউ নয়। তা ছাড়া আমার হাত অত্যন্ত নরম, আর

পলিটিসিয়ানদের চামড়া স্বভাবতঃই পুরু। তবে এ দলের ভিতর এমন কেউ যদি থাকেন, যিনি কথার ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান—তাহলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই যে, তাঁর কুস্তির আখড়া রাজপথ নয়, পর্দ্দার ও-পারে।

(৪)

এ যুগে কাগজ চালানো যে একটা ব্যবসা, তা সকলেই জানেন। কাগজের এই ব্যবসার দিকটে কি করে বড় করে তুলতে হয়, সে বিষয়ে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই; কারণ হাতে কলমে ও-ব্যবসা আমি কখনো চালাই নি—কারণ চালাতে পারি নি। তা ছাড়া ও বিদ্যে বাঙালী-লোকে আয়ত্ত করতে পারবে না। মাড়োয়ারী ও-ব্যবসা যতদিন হাতে না নিচ্ছে, ততদিন মুদ্রাযন্ত্র টেঁকশাল হবে না। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, দেশী Northcliffe এখন গোকুলে বাড়ছে; আর বলা বাহুল্য যে, সে গোকুল হচ্ছে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। ইতিমধ্যে বাঙালী যদি মাড়োয়ারী হয়ে উঠতে পারে, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আমরা ইদানিন্তন যেরকম ইকনমিক্স-গত-প্রাণ হয়ে উঠেছি, তাতে ভরসা হয় যে, আমরাও হয়ত একদিন সংবাদপত্রের circulation'ও gold currency-র মত ফুর্ত্তিসে চালিয়ে দিতে পারব। জিনিষটে আসলে খুব সুসাধ্য। রূপোকে সোনা করতে পারলেই কেল্লা ফতে।

তবে একটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। সংবাদ পত্রের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, press পুরোদস্তুর পেশাদার হবার পূর্ব্বেও নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছিল। কি

উপায়ে ?—বলছি। তিল কুড়িয়ে তাল করে। বারোমেসে গ্রাহকের উপর নির্ভর করলে ওর প্রচার দেশময় ছড়িয়ে পড়ে না। গ্রাহকের সংখ্যার চাইতে পাঠকের সংখ্যা যে ঢের বেশি, এ জ্ঞান আমাদের হওয়া চাই। পাঠক রাস্তায় রাস্তায় মেলে—গ্রাহক থাকে দূরে দূরে। কাগজ কাটাবার তাই শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নগদ বিক্রী। কাগজের hawker যে তার লেখকের চাইতে কম লোক নয়—এ জ্ঞানের উপর সংবাদপত্রের প্রাণ নির্ভর করে। লেখকরা পারে সুধু লিখতে, কিন্তু hawker-রা পারে তা পড়াতে। এর পর আমাদের কাগজ লেখবার পদ্ধতিও অনেকটা বদলাতে হবে। সভ্য পাঠক ভেবে পড়ে না, পড়েও ভাবে না। সভ্য-যুগ হচ্ছে নিশ্চিন্ত যুগ; অতএব আমাদেরও না ভেবে এমন লেখা লিখতে হবে, যা পড়ে কেউ যেন না ভাবে।

(৫)

কাগজের প্রচার বৃদ্ধি করতে হলে, তার আগে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। যতদিন দেশের বেশীর ভাগ লোক নিরক্ষর থাকবে, ততদিন কাগজের পাইকিরি ব্যবসা করা অসম্ভব। ইংরাজেরা যাকে mass-press বলে—সে জিনিষ mass education-এর প্রশস্ত ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। একটা উদাহরণ দিই। বাঙলা দেশে ইংরাজের চাইতে বাঙালীর সংখ্যা যে বেশী, এ কথা সবাই জানেন। আর এ কথাও সবাই জানেন যে, ইংরাজী কাগজ Statesman-এর কাটতি বাঙলা কাগজের কাটতির হাজার গুণ বেশী। এর কারণ ইংরাজসমাজে mass education আছে, বাঙালী সমাজে নেই। অতএব হুঁসিয়ার সংবাদপত্রকে লোকশিক্ষার

জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে। বিলেতে লোক-শিক্ষা কাগজ-ওয়ালাদের চেঁচামেচির ফলে compulsory হয়েছে। কারণ মানুষ লেখাপড়া শিখতে বাধ্য হলে, খবরের কাগজ পড়তে বাধ্য হবে অতএব এ বিষয়ে আপনাদের যে কি কর্ত্তব্য, তা বলবার প্রয়োজন নেই। হিন্দীতে বলে, "আক্কেলীকো ইসারা ব্যস্"।

দুঃখের বিষয় বাঙলাদেশের সংবাদপত্র তার স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। নইলে যে ডালে সে বসে আছে, সেই ডাল কাটতে সে চেষ্টা করত না, উঠতে বসতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণ করত না। এ বিষয়ে অনেকে অন্ধ যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার ফলে দলে দলে স্বুধু সংবাদপত্রের পাঠক সৃষ্ট হয়। আমরা যাকে উচ্চশিক্ষা বলি—তাও নামান্তরে লোকশিক্ষা। নিম্নশিক্ষা আর উচ্চ-শিক্ষার ভিতর প্রভেদ এইমাত্র যে, প্রাইমারিশিক্ষিত লোক স্বুধু বাঙলা পড়তে পারে, আর উচ্চশিক্ষিত লোক ইংরাজীও পড়তে পারে, কিন্তু তা লিখতে পারে না। এ কথা শুনে চম্‌কে উঠবেন না। এঁরা অবশ্য ইংরাজীতে সংবাদপত্র লেখেন। কিন্তু যে ইংরাজী তাঁরা লেখেন, বিলিতী ইংরাজীর সঙ্গে তার সেই সম্বন্ধ, পালির সঙ্গে সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ। ও ভাষায় স্বুধু পলিটিকাল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করা যায়। সে বস্তু কি?—না সেই পলিটিকাল ধর্ম্ম, যার আদর্শ হচ্ছে নির্ব্বাণ।

বর্ত্তমানের যুগ-ধর্ম্ম হচ্ছে পলিটিক্স্। এ যুগে ভগবান বুদ্ধ কিম্বা যিশুখৃষ্ট ধরাধামে অবতীর্ণ হলে তিনি যে সভ্য-সমাজে কল্কে পাবেন না, তা বলাই বাহুল্য,—যদি না তিনি তাঁর ধর্ম্মের সঙ্গে পোনেরো আনা রাজধর্ম্ম মেশান। আর সেই কেমিকাল ধর্ম্মও আর মুগুজটালদের

মারফৎ প্রচার করতে পারবেন না। ঈশ্বরের "একজাত পুত্র" যিশু-খৃষ্টকেও কাগজ বার করতে হবে, শাক্যরাজপুত্র বুদ্ধদেবকেও কাগজ বার করতে হবে। আর শাক্যসিংহকে লিখতে হবে মাগধী ইংরাজী। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সংবাদপত্রের একমাত্র কাজ হচ্ছে, মানবের অন্তর্নিহিত পলিটিক্স্‌কে ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে তোলা। সকলেই জানেন যে, পঞ্চপ্রাণ মানে পঞ্চবায়ুঃ। আমাদের ভিতর যে পঞ্চপ্রাণ আছে, সে পঞ্চপ্রাণকেই এই ফুঁয়ের কাজে নিয়োজিত করতে হবে; আর সে ফুঁ কাগজের নলের ভিতর দিয়ে চালাতে হবে, নচেৎ তার জোর হবে না, ফুৎকার চীৎকারে পরিণত হবে না। সেকেলে ধর্ম্মের সার কথা ছিল ওম্‌—অর্থাৎ নিঃশ্বাস ওরফে প্রাণবায়ু টানা। আর একালের ধর্ম্মের সার কথা হয়েছে হুম্‌—অর্থাৎ নিঃশ্বাস ওরফে প্রাণবায়ু ছাড়া। সুতরাং যুগ-ধর্ম্ম অনুসারে সংবাদপত্রকে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিতে হবে ওঙ্কারধ্বনিতে নয়—হুঙ্কারধ্বনিতে।

একালের এই যুগধর্ম্ম-পলিটিক্স্‌ই সংবাদপত্রের জন্ম দিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, পলিটিসিয়ান না থাক্‌লে সংবাদপত্র বাঁচতে পারে না। সে কারণ পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্বন্ধ যে কি, তাও একটু জানা দরকার।

ইউরোপের গত একশ দেড়শ বছরের ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই দেখা যায় যে, সংবাদপত্র প্রথম আভির্ভূত হয়—পলিটিসিয়ান-দের লাঙ্গুলস্বরূপে। তাই বহুদিন ধরে সে লাঙ্গুল পলিটিসিয়ানরা যে দিকে যে ভাবে আন্দোলিত ও আস্ফালিত করতেন, সে লাঙ্গুলও সেই দিকে সেই ভাবে সশব্দে আন্দোলিত ও আস্ফালিত হত। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কাগজ পড়ে দেখুন, তা মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ক্ষুদে

ক্ষুদে অক্ষরে পলিটিসিয়ানদের বক্তৃতার রিপোর্টে ভরা। আর আমরা যাকে আর্টিকেল বলি, তাও ছিল ঐ সব বক্তৃতার টীকা ও ভাষ্য। এই বিরাট ভাষাসাহিত্যকে বিলেতের লোকে আজকাল Old Journalism বলে। আমাদের নূতন journalism আসলে বিলাতের সেই পুরোনো journalism.

কালক্রমে কাগজওয়ালারা যখন আবিস্কার করলে যে, mass educationএর প্রসাদে পলিটিসিয়ানদের অপেক্ষা সংবাদপত্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সামাজিক মনের উপর ঢের বেশী, তখনই জন্মাল new journalism.

পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে সংবাদপত্রের আজও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বজায় আছে। বদল হয়েছে এই যে, এখন সংবাদপত্র হয়েছে অঙ্গী, আর পলিটিসিয়ান হয়েছে তার অঙ্গ। সংক্ষেপে আগে the dog used to wag the tail, আর এখন the tail wags the dog.

পলিটিসিয়ানরা পূর্ব্ব যুগে প্রমাণ করেছেন যে, কাজের চাইতে কথা বড়; আর কাগজওয়ালারা বর্ত্তমান যুগে প্রমাণ করছেন যে, কওয়া-কথার চাইতে লেখা-কথার শক্তি বেশী।

আমাদের সংবাদপত্রের উন্নতির পথও ওই। অবশ্য সংবাদপত্র যদি তার স্বত্ব সাব্যস্ত করতে চায়—তাহলে প্রথমে পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে তার বিবাদ উপস্থিত হবে। কিন্তু তা'তে ভয় খেলে চলবে না। কারণ সংবাদপত্র আসলে বিসংবাদপত্র।

বীরবল।

দোল-পূর্ণিমায়।

(১)

দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা

হৃদয় আকাশে।

দোলফাগুনের চাঁদের আলোর

সুধায় মাখা সে॥

কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারে,

বচনহারা ধ্যানের পারে,

কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে

ছিল ঢাকা সে।

দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল

গোপন রেণুকা.

গন্ধে তারি ছন্দে মাতে

কবির বেণুকা।

কোমল প্রাণের পাতে পাতে,

লাগ্‌ল যে রঙ্ পূর্ণিমাতে,

আমার গানের তানে তানে

রইল আঁকা সে॥

(২)

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিলো তারে বনবীথি
পাখীর কাকলি-গীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে॥

মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙায় দিগন্ত।
বাণী মম নিলো তুলি'
পলাশের ফুল-ধূলি,
এঁকে দিলো তোমার সীমন্ত॥

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দীপালি সংঘ।

(ঢাকা, নারীসভা।)

আজ অনুভব করচি ঢাকা নগরী তার হৃদয়ের মধ্যে আমাকে গ্রহণ করেচে, এই সঙ্গীতেই তার উপযুক্ত অভ্যর্থনা। যে অন্তর নিকেতনে মাধুর্য্যের ভাণ্ডার, সেইখানে সমাদর পাওয়াই কবির শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন।

যাঁরা কর্ম্মী, তাঁদেরই পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় আদর; যাঁরা কোনো বড় প্রয়োজন সাধন করেচেন, পুরুষমণ্ডলীর কাছে তাঁরা বড় পুরস্কার পান। কিন্তু আজ আমি মেয়েদের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়েছি, তার মধ্যে কোনো কর্ম্মের প্রাপ্তিস্বীকার নেই। তার মধ্যে তাঁদের যে আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে, সে আনন্দের কারণ এই যে, আমি মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে কিছু সুর যোগ করে দিয়েছি —যেটা বেদনাকে গানে বাজিয়ে তোলে, পৃথিবীর শ্যামলতার উপর হৃদয়ের লাবণ্য মাখিয়ে দেয়, সংসারকে তার প্রাত্যহিক তুচ্ছতার গহ্বর থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে চিরকালের আলোতে বের করে আনে। আজ মেয়েদের আনন্দধ্বনির মধ্যে যা' আমাকে পুরস্কৃত করেছে সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মজুরীশোধের কথা নেই। অন্য যে-কোনো আকারে উপকারের কাজ করি, তার জন্যে মজুরী দাবী করা চলে, তার জন্যে বাইরের দিক থেকে পারিতোষিক প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু যদি কোনো কর্ম্মের সহায়তা না করে'

কেবলমাত্র আনন্দের পাত্র ভরে দিয়ে থাকি—সুর দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, রস দিয়ে,—তবে আনন্দই তার পুরস্কার।

সংসারে আনন্দভাণ্ডারের ভার ত মেয়েদেরই উপরে। মাধুর্য্যের অমৃত মেয়েদেরই হৃদয়ে। তাদের স্নিগ্ধস্পর্শে জীবযাত্রার কঠোরতা ক্ষয় হয়, তাদের হাসি আর চোখের জলে দুঃখসন্তাপে শান্তি আনে, তাদের সেবায় ও নিষ্ঠায় গৃহ কল্যাণে সৌন্দর্য্যে শোভিত হয়। এই-জন্যে কবিকে পুরস্কার দেবার ভার ত তাদেরই, যে কবির কাজ হচ্ছে সংসারকে রসবর্ষণে শ্রীদান করা। যতদিন আমি সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত আছি, অন্তরের মধ্যে এই আশ্বাস বারবার অনুভব করেছি যে, দেশের মেয়েদের কাছে আমার কবিতা পৌঁচেছে। পুরুষদের মধ্যে সহজে রসভোগের বাধা তাদের বিদ্যার অভিমান, বুদ্ধির অহঙ্কার; বিদেশী সাহিত্যে নূতন অধিকারের উত্তেজনায় তারা পুঁথিগত তুলনার সাহায্যে রসের যাচাই করতে বসে। কিন্তু যাচনদার মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে, নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করতে আর পারে না। সহজ আনন্দ অনুভব করবার যে শক্তি, সেই শক্তিই কাব্যের রসটিকে পূরোপূরি আকর্ষণ করে নেয়। শিক্ষার দ্বারা নানা সাহিত্যে প্রশস্ত অধিকারের দ্বারা সেই শক্তির উৎকর্ষ ঘটে, এ কথা সত্য; কিন্তু যেখানে স্বভাবত সেই শক্তির দৈন্য, অথচ বইপড়া শিক্ষার দ্বারা সাহিত্য বিচাররীতির একটা বাহ্য কাঠামো হাতে এসেছে, সেইখানেই দুর্ব্বিপাক, সেইখানেই সাহিত্যরাজ্যে মত্তহস্তী পদ্মবন দলতে আসে। আমাদের মেয়েদের মধ্যে পুঁথিগত শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ট হয় নি বটে, কিন্তু তাদের চিত্তের মধ্যে সহজবোধের ঐশ্বর্য্য আছে। সেই কারণে আমার এই অহঙ্কারটুকু সত্য হতে পেরেছে যে, আমার কাব্য গ্রহণ

করতে আমাদের দেশের মেয়েদের তেমন বাধা ঘটে নি। কখনো কখনো এমনো দেখেছি, আমার রচনা সম্বন্ধে বাইরের ঘরে যেখানে বিরুদ্ধতা, ভিতরের ঘরে সেখানে বেদনার সঙ্গে মেয়েরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে। সাহিত্য মেয়েদের কাছে এই যে আতিথ্য পায়, এটি বিশেষ মূল্যবান। মেয়েদের আনন্দ পুরুষের শক্তির উদ্বোধন।

মাধুর্য্যই শক্তির প্রধান আশ্রয়। বিষ্ণুর হাতে যে গদা আছে, বিষ্ণুর হাতের পদ্মই তাকে পূর্ণতা দেয়। যে-কোনো বড় দেশেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে পৌরুষের নানাপ্রকার উদ্যম দেখতে পাই, সেইখানেই এই উদ্যমের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে নারীচিত্তের প্রবর্ত্তনা আছে। সেখানে হাওয়ার মধ্যে একটা উৎসাহ নারীর মন থেকে প্রবাহিত হয়ে পুরুষের সাধনাকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে। যে সমাজে নারীমাধুর্য্যের সেই অলক্ষ্য উদ্দীপনা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সেই সমাজই শৌর্য্যবীর্য্যে কর্ম্মে সৌন্দর্য্যে বিচিত্রভাবে সফল হয়। গাছ আপন শিকড়ের জোরে মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে ফুল ফোটায়, ফল ফলায়—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তার শক্তির প্রধান প্রেরণা আকাশের আলোয়, বসন্তের দক্ষিণ বাতাসে। প্রাণলক্ষ্মীর এই দিব্য দূতগুলি অলক্ষ্য আকারে অশ্রান্ত পদসঞ্চারে দিকে দিকে বিহার করে। তারাই অরণ্যে অরণ্যে প্রাণের পাত্রকে তেজে পূর্ণ করে দেয়। মেয়েদের অনুপ্রাণনা পুরুষের শক্তিকে তেজ জোগাবার সেই অলক্ষ্য দূত। এই কারণেই ভারতবর্ষ স্ত্রীপ্রকৃতিতে শক্তির রূপ উপলব্ধি করেছে। এখনকার মনোবিজ্ঞান যেমন বলে যে, মনের গূঢ়চেতন লোকে আমাদের মর্ম্ম উদ্যমের প্রচ্ছন্ন উৎস; আমাদের দেশ তেমনি করেই বলেছে পুরুষের

উদ্যমের দ্বারা গোচরে যে কাজ হয়, অগোচরে তার শক্তিকে সচেষ্ট করে রাখে নারীপ্রকৃতি।

কালে কালে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কর্ম্মক্ষেত্রে নব নব পরিণতি সাধন করতেই হয়। তখন পুরাতন অভ্যাসের জায়গায় নূতন উৎসাহের দরকার হয়। নূতন যুগের আহ্বান উপস্থিত হলে তবু যারা অপরিচিত পথের দুর্গমতা এড়িয়ে পুরাতন কালের কোটরে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাক্‌তে চায়, মৃত্যুর চেয়েও তাদের বড় শাস্তি,—তাদের শাস্তি জীবন্মৃত্যু। একদিন আমরা ভারতবর্ষে আত্মীয় সম্বন্ধের বৈচিত্র্যে নিবিড় নিবন্ধ একটি সমাজ পারিবারিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলাম। তাই আমাদের সংহিতাকাররা বলেছেন—গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নারীকে সেই আশ্রমের লক্ষ্মীরূপে পূজা করতে উপদেশ দিয়েছেন। সেদিন ভারতবর্ষের এই গৃহধর্ম্মমূলক সভ্যতা ভারতের ভৌগলিক সীমার মধ্যে পুণ্যে সৌন্দর্য্যে সার্থক হয়ে উঠেছিল। তখন স্বভাবতই মেয়েদের উপর ছিল আতিথ্যের ভার, পূজার ফুলের সাজি সেদিন তারাই সাজিয়েছে, গৃহকে তারা সুন্দর করেছিল, পূর্ণ করেছিল। কিন্তু যে সুরক্ষিত সীমার মধ্যে এটি সম্ভব হয়েছিল, সেই সীমা আজ ভেঙে গেছে। আজ যুগসঙ্কটের দিনে ঘরের চেয়ে বাইরের দিকের ডাক বড় হয়ে উঠেছে। সে ডাকে ঠিক মত সাড়া দিতে না পারলেই অসম্মান। আজ আমাদের আশ্রয় একান্তভাবে গৃহের মধ্যে আর নয়। আজ সমস্ত পুরাতন বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের প্রাণকে বাহিরে চারিদিকে দীনভাবে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্চে, তাতে আমাদের দীনতা মলিনতা প্রকাশ হয়ে পড়চে। সেই বিক্ষেপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে নূতন ব্যবস্থায়। এই বাঁচাবার

তার বাহিরের দিক থেকে পুরুষের, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে মেয়েদের। যে নূতন উৎসাহে নূতন যুগের সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষদের এগোতে হবে, বিশ্বে আপন যোগ্য আসন অধিকার করতে হবে, সেই উৎসাহকে নিরন্তর সজীব রাখবে মেয়েরা। এই নূতন দিন আজ এসেছে। এদিন পূর্ব্বে কখনো আসেনি, এমন নয়। ভারত একদিন পৃথিবীর সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। সেদিন যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা দেশে দেশে গিয়েছিলেন অমৃত বিতরণ করতে; যাঁরা সন্ন্যাসিনী, তাঁরাও সর্ব্বমানবের মুক্তিদানব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনকার ইতিহাসের বহুল ভগ্নাংশ প্রচ্ছন্ন রয়েছে মধ্য এসিয়ার মরুবালুকার মধ্যে। সেই আবরণ উন্মুক্ত হয়েছে, সেখানে দেখছি ভারতীয় মৈত্রীদূতদের পদচিহ্ন, পাচ্ছি বিশ্বত্রাণসাধনার প্রাচীন বার্ত্তা; আজ আমাদের পরম অগৌরবের মধ্যে সেদিনকার মহিমার কথা ধ্বনিত হয়ে উঠল। প্রথম যেদিন বুদ্ধগয়ায় গিয়েছি, দেখলাম মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তির পায়ের কাছে বসে জাপানের এক ধীবর, বুদ্ধের শরণ নিলাম বলে প্রণাম করচে। রাত্রে দেখি পূর্ব্বকৃত পাপের অনুশোচনা নিয়ে বোধিদ্রুমের তলায় বসে সেই ভক্ত পাপমোচনের প্রার্থনা করচে। এমন দিন ছিল, যেদিন দূরদেশের মুক্তিকামীরা ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি বলে' ভক্তি করেছে। সেদিনকার বিশ্বযজ্ঞের দানক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ আজ কি আপনার হৃদয়কে একেবারে সঙ্কুচিত করতে পারে? অমৃতের পাত্র কি কখনো নিঃশেষে রিক্ত হয়? গৃহপরিধির বাইরে আজ আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করা চাই। বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজ দ্বার উন্মুক্ত, সর্ব্বত্র যাবার পথ অবারিত, আজ সেখানে আমরা কি নিয়ে যাব? যারা বণিক তারা পণ্য নিয়ে যায়, যারা দস্যু তারা লুঠ করবার অস্ত্র নিয়ে

ছোটে, যারা জ্ঞানতাপস তারা আপনার জিজ্ঞাসা নিয়ে আসে। ভারতের লোক কি কেবল এই বলেই যাবে যে, আমরা পরের বুলি সংগ্রহ করতে এসেছি, আমরা অজ্ঞান, আমরা অশক্ত, আমরা অকিঞ্চন? তা নয়, এই বল্‌তে হবে আমাদের গুরুর মুখ থেকে আমরা অমৃতবাণী এনেছি। সেই কথা বলবার শুভ সময়কে তোমরা শ্রদ্ধার দ্বারা পুণ্যময় কর। বাহির পৃথিবী থেকে অতিথি আসবে— তোমরা কল্যাণশঙ্খ বাজাও, তাদের বল, তোমরা শান্ত হও, সান্ত্বনা লাভ কর, তোমাদের ক্ষতবেদনা দূর হোক্।

ভারতবর্ষ আতিথ্যকে বড় ধর্ম্ম বলেছে, কেননা আতিথ্যের দ্বারাই বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা স্বীকার করা হয়। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য—সে যে খুব বড়, তাকে অল্পপরিধির মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। খাঁচার মধ্যে যে আকাশটুকু আছে, তাতেই ত পাখীর ডানার সম্পূর্ণ সার্থকতা মেলে না। বাহিরের হাওয়ার সঙ্গে ঘরের হাওয়ার যোগসাধন করলে তবে ঘরের হাওয়ার কলুষ দূর হয়। অতিথি গৃহীকে গৃহকর্ম্মের একান্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দিতে আসেন। এইজন্যে অতিথিকে দেবতা বলা হয়েছে, কেননা দেবতাই বড়র সঙ্গে যোগের দ্বারা ছোটকে উদ্ধার করে।

আজ যেমন বৃহৎভাবে ভারতের গৃহকর্ম্মের প্রয়োজনে আমাদের মন জেগেছে, তার অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতার কথা চিন্তা করচি, এই জাগরণের দিনে আজ তেমনি বড় করেই ভারতের ধর্ম্মসাধনের কথাও যেন ভাবতে পারি। এই দুই চিন্তার পথেই মেয়েদের সেবাশক্তি ও শুভবুদ্ধির আহ্বান আছে। এই উভয় সাধনাতেই তোমাদের প্রবর্ত্তনা, তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছা দেশকে শক্তি দেবে। আজ তোমরা

তোমাদের কবিকে অভিনন্দন করচ; তার মধ্যে যদি তোমাদের এই কথাটি থাকে যে, "যাও, বাহিরে, বিশ্বকে আহ্বান কর"—তাহলে আমি ধন্য হ'ব। সমুদ্রের পরপারে আমার নিমন্ত্রণ আছে; যদি শরীর নিতান্ত অক্ষম না হয়, তাহলে অল্প কয়েকদিন পরে যাব। সেই যাবার আগে তোমাদের কণ্ঠ থেকে আজ যেন এই কথা শুনতে পাই যে, "যাও, ভারতের বাণীকে সমুদ্রপারে বহন করে নিয়ে যাও।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

——:*:——

মহাভারতের একটি শ্লোকে আছে :—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।"

অস্যার্থ :—প্রতিদিন জীবগণ যমমন্দিরে যাচ্চে, কিন্তু অবশিষ্ট যারা বর্ত্তমান থাকচে তারা ভাবচে তারা অমর; এ অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ?

কথাগুলি মহাভারতের বনপর্ব্বে পাণ্ডুপুত্র বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন। স্বয়ং ধর্ম্মরাজই যখন উত্তরটী যথাযথ বলে মেনে নিয়েছিলেন, তখন কথাগুলি ঠিকই বলতে হবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগেও যদি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বর্ত্তমান থাকা সম্ভব হ'ত, তাহ'লে তিনি মহাভারতের পরবর্ত্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই কথাগুলি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ক'রে বলতেন, মানুষ প্রতিদিন মানুষের দুঃখভার দূর করবার নব নব উন্নততর জীবন-যাত্রাপ্রণালী বের কচ্চে, কিন্তু যদিও তার দুঃখভার প্রতিদিন নব নব রূপ ধারণ ক'রে বেড়েই চলেচে, তথাপি অনন্তকাল ধরে' তার এই নবতর পন্থা উদ্ভাবনচেষ্টার বিরাম নেই—এর চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ?

সেই স্মরণাতীত আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে' মানুষ কতবার, কতভাবে, কতরকমে চেষ্টা করলে, মানুষকে অন্ধকার হ'তে আলোতে নিয়ে যাবার জন্য, বন্ধন হ'তে মুক্তিতে নিয়ে যাবার জন্য, সঙ্কীর্ণ

বিভিন্নতা হ'তে সাম্য-মৈত্রীর দিকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কে বলতে পারে তার চেষ্টা সত্যিই সার্থক হয়েচে? কে বলতে পারে তার দুঃখ-দৈন্য-বন্ধন-অন্ধ সঙ্কীর্ণতা এক তিল কমেচে? আর তা' যাচাই করবার নিকষ-পাথরই বা কোথায়? একদিকে যদি বা এতটুকু কমেচে মনে হচ্চে, অপরদিকে যে তার দশ গুণ বেড়ে গিয়েচে দেখতে পাচ্ছি; একদিকের বাঁধন যদিবা একটু আল্গা হয়েচে, অন্যদিকে যে তার বিশ গুণ আঁট পড়ে' গিয়েচে। কিন্তু তথাপি মানুষের কি বিরাম আছে, নিত্য নিত্য এই উন্নততর জীবন-যাত্রাপ্রণালী উদ্ভাবন করবার? না অন্ত আছে তার বিশ্বাসের যে, বর্ত্তমান পন্থাই তার শ্রেষ্ঠ পন্থা?—কত অবতার, কত ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, কত প্রচারক, কত দার্শনিক, কত যুগপ্রবর্ত্তক আবির্ভূত হলেন ঈশ্বরের বাণী নিয়ে। তাঁদের আশার বাণী, মুক্তির আহ্বান শুনে এই কোটি মানবসন্তান কতবার আনন্দোল্লাসে মেতে উঠল। ইঙ্গিতমাত্র কত কৃচ্ছ্রসাধনা, কত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, কত স্বজনশোণিত পাত যে করলে, তার কি ইয়ত্তা আছে? ইষা, মূষা, বুদ্ধ, চৈতন্য, কন্‌ফিউসিয়াস্‌, মহম্মদ, রামমোহন—কত মহাপুরুষ এসেছিলেন এই মানবকে মুক্ত করতে, মানবের চিরন্তন দুঃখভার দূর ক'রে তাকে অসীম আনন্দ দান করতে; কিন্তু কোথায় তাঁরা আজ? সেই এক সনাতন উত্তর—'যে অসীম অন্ধকারের বিরাট গহ্বর হ'তে তাঁরা এসেছিলেন, সেই অন্ধকারের গহ্বরেই আবার সকলে ফিরে গিয়েছেন।' আর এই হতভাগ্য মানবসন্তান?—সে যে সুধু যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল, তা' নয়; পরন্তু তাঁদেরই বিধান মাথায় করে' নব উৎসাহে নব উল্লাসে সুরু করলে এই অন্তহীন আত্মহনন, এই নৃশংস স্বজন

পীড়ন। ইতিহাস ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচে আজ সেই সব মতবাদ প্রতিষ্ঠাব্যপদেশে মানুষের জিঘাংসাবৃত্তির নিষ্ঠুরলীলার কাহিনী বহন করে'।

সৃষ্টির সেই মহারাজ বিশ্ব-বিধাতা এই চির-অবনত দুর্ভাগা মানব সন্তানের পরিত্রাণের জন্য যে সব মহাত্মাদের প্রেরণ করেছিলেন, তাঁদের সেই মহাবাণী লক্ষ্য করে' যে কত লক্ষ লক্ষ লোক শোণিত তর্পণ করেছে, তা'ত আমরা ভুলতে পারিনি। হায়রে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা! এই কাঞ্চনমৃগের অনুসন্ধানে কত দারুণ অসাম্য, কত নিদারুণ বৈরতা, কত নিষ্ঠুর বন্ধনই যে সৃষ্ট হয়েছে, বোধকরি স্বয়ং বিধাতাও তা' মনে ক'রে রাখতে পারেন নি। এক একবার এই মহামন্ত্রের ভূমিকম্প পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে চলে গিয়েচে, আর শত শত জাতি, শত শত সাম্রাজ্যসৌধ চুরমার হ'য়ে পড়েচে—ধরিত্রী আপন সন্তানের শোণিতে স্নান করে উঠেচে। যেদিন বাস্কার শৈল শিখরে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বিজনবিষাণ প্রথম বেজে উঠল, সেদিন মানুষ যে কি আশা, কি আকাঙ্ক্ষা, কি আনন্দে নৃত্য করে উঠেছিল, কারোর কাছেই তা অবিদিত নেই; এবং আজ আমরা সকলেই যে কি সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার সুশীতল ছায়াতলে কালযাপন করছি, এ কথাও বোধ করি কাউকে বল্‌তে হবে না। তবুও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটচি আমরা সেই মৃগতৃষ্ণিকার হাতছানি লক্ষ্য করে'।

দশহাজার বছর পূর্ব্বে যখন আমরা ককেসস্ পাহাড়তলী থেকে প্রথম শুভ্র সভ্যতার আদর্শ নিয়ে এখানে এসেছিলাম, তখনও বলতে ছাড়িনি—আমরা যা এনেছি, তাই মানবজীবনের উন্নতির চরম আদর্শ; এবং মানুষকে লাঠি মেরে বোঝাতেও ছাড়িনি—আমাদের আদর্শই

শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আবার হাজার বৎসর পর সেই আমরাই বলেছি, "না না, ও যা বলেছি ও ঠিক নয়। সুখের পথ, আনন্দের পথ ও নয়।" তখনও কি কম মনীষা, কম শক্তি আমরা ব্যয় করেছি জগৎকে বোঝাতে যে, প্রাচীনের জীর্ণ নিগড় ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে মুক্তির নব আহ্বান, আনন্দের নব আস্বাদ লাভ করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য? কিন্তু সেই চরম লক্ষ্য লক্ষ্য ক'রে যে নব আদর্শের বাণী আমরা প্রচার করলাম, কৈ দু'দিনত আমরা সে কথা মেনে চলতে পারলাম না। এরি মধ্যে যে আবার বলতে সুরু করেছি:—

"Ye wanderers that were my sires,
* * * * * * * * *
Why did you leave for garth and town
Your life by heath and river's brink,
Why lay your gipsy freedom down,
And doom your child to Pen and Ink" ?

কত যত্নে কত প্রাণপাত ক'রে গড়া ইমারৎ যে সব আবার ভাঙ্গতে বসেচি; আবার যে তারস্বরে প্রচার করতে আরম্ভ করেছি—ফেরো ফেরো ফেরো, সুখের পথ ও নয়, আনন্দের পথ ও নয়।

জীববিশেষের গলায় চামড়ার বন্ধনী বেঁধে দিয়ে যেমন তাকে আভিজাত্যের ছাপ দেওয়া হয়, তেমনি 'সিভিলিজেশনের' (Civilization) ছাপ এঁটে দিয়ে মানুষের মধ্যে আমরা যে একটা উৎকট ব্যবধান সৃষ্টি করেছি, তার মূলেও ত আমাদের সনাতন প্রচেষ্টাই প্রকটিত। এই সিভিলিজেশনের এক একটা বন্যা যখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে, আমরা এমনি অভিভূত হ'য়ে পড়েচি যে, যুগ যুগ ধরে তারই হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি করে' জপেছি, "নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়,

নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়”। কিন্তু অয়নায় পন্থা যে অস্তি, তাও আমাদের বুঝতে বেশী দেরী হয় নি। কারণ যাকে 'সিভিলিজেশন' বলে' শতবর্ষ ধ'রে কীর্ত্তন্ করে এলাম, দু'দিন পরে তাকে হীন "বার্বারিজম্” বলতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করলাম না।

তারপর 'সোস্যালিজম্,' 'ইন্‌ডিভিজুয়্যালিজম্,' 'কমিউনিজম্' প্রভৃতি কত মূর্ত্তিতে যে মানুষের সেই অক্লান্ত প্রচেষ্টার আবির্ভাব ও তিরোধান হয়েছে এবং অদ্যাপি হচ্চে, তা' ভাবলে স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বিস্মিত না হ'য়ে পারেন না। কত নিখিল মঙ্গলবিধায়িনী সম্মিলনী, কত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠামূলক সমিতি, কত আন্তর্জাতিক শান্তিসভার প্রতিষ্ঠান হল, যার প্রত্যেকটীর মূলমন্ত্র ছিল নিখিল মানবের সুখশান্তি বিধান করবার নবতর পন্থা উদ্ভাবন। কিন্তু এই সভ্যতার আদর্শ যুগে দাঁড়িয়েও কি আমরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, সেই সুখের অদৃশ্য তটভূমির দিকে আমরা এক পাও বেশি এগিয়েছি?

সেই অখণ্ড সুখরাজ্যজয়ের দুর্ব্বার তাড়নায়, এই অফুরন্ত মানবের অপ্রমেয় শক্তি নিয়ে আমরা পৃথিবীর বুকে যে অঘটন ঘটিয়েছি, তা' ভাবলে সত্যই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। কিন্তু যদিচ সে স্বর্গরাজ্যের সীমারেখা এখনও আমাদের দিগ্‌বলয়ের পরপারেই রয়ে গিয়েছে, এবং যদিচ "It may be we shall touch the Happy Isles" ছাড়া অন্য কথা বলবার আমাদের ন্যায্য অধিকার নেই, তথাপি কি অন্ত আছে, প্রতিদিন এই মুক্তি ও সুখসাধনের নবতর প্রণালী উদ্ভাবন চেষ্টার? তাই ধর্ম্মপুত্রের বাক্যের প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছা হয়—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

"ভূতের কথা"।

—————*—————

আজ যে 'ভূতের' কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, সে অশ্বত্থ কি তাল গাছের ভূত নয়; শ্মশানে মশানে যে 'ভূত' বিচরণ করে, তাহাও নয়। তবে আবার কোন্ ভূতের কথা বলিব? যাহা 'ভূত', যাহা 'অতীত', যাহা কাল-সাগরে লীন, তাহারই কথা। তবে কি মনে করেন যে, আমি রাতারাতি একটা প্রকাণ্ড প্রত্নতাত্ত্বিক হইয়া পড়িলাম? তাহাও নয়। সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা হইতে এই প্রত্নতাত্ত্বিক রোগে অভিভূত, বা 'ভূতপ্রাপ্ত' রোগীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়—এমন কি "সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায়" 'ভূতের' কথা ছাড়া অন্য কথা প্রায় স্থানই পায় না। পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে ত প্রত্নতত্ত্ব অবশ্য অনুশীলনীয় ও অনুসন্ধেয়। ইতিহাস, পুরাণ, কিম্বদন্তি প্রভৃতির আলোচনায় সুখও আছে, লাভও আছে। নানা উপাদানে, কল্পনার সাহায্যে একটা অতীত জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে বাস করা কম আনন্দদায়ক নয়। তারপরে, বর্ত্তমানকে যখন অতীতই নিয়মিত করিতেছে, তখন অতীতের আলোচনা লাভজনকই বা হইবে না কেন? কোনো জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তির কথা জানিতে হইলে, কি তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো কিছু কল্পনা করিতে হইলেই, তাহার অতীত ইতিহাস ইত্যাদির আলোচনা বা অধ্যয়ন আবশ্যক। অতীত বা 'ভূত'কে সুতরাং কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু অতিরিক্ত

মাত্রায় 'ভূতের' বিষয় আলোচনা করিলে, বা শুধু 'ভূত' লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে যে আমাদিগকে 'ভূতে' পায়, এবং শেষে "রোঝা"র পক্ষেও সে ভূত ছাড়ানো কঠিন হইয়া পড়ে, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। 'স্বর্ণযুগ', 'সত্যযুগ', 'বীরযুগ' (Golden Age, Heroic Age, &c.) সমস্তই অতীতে বা 'ভূতে' সংস্থাপিত। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে বা পুরাণে ভবিষ্যতে ঠিক স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগ না হোক্—কল্পান্তে 'নবীন জগৎ' 'নবীন ভাব' 'নব রহস্যের' (millennium) উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু 'ভূতে'র প্রতি ঝোঁকটাই যেন বেশী।

যুগ বিভাগ বা কল্প-বিভাগ নেহাৎ কাল্পনিক ও অবৈজ্ঞানিক নয়। ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর স্তরে স্তরে বিভিন্ন যুগের চিহ্ন দেখিয়া থাকেন; তাহা হইতেই 'প্রস্তর যুগ', 'লৌহ-যুগ' প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মানব-সভ্যতার যুগ-বিভাগ করিয়া থাকেন, এবং পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যে সমস্ত জীবজন্তু, উদ্ভিদ্, কি খনিজ পদার্থ ছিল, তাহারও কাল ও যুগ বিভাগ করেন। কিন্তু বিজ্ঞান 'ভূতে' কখনও বিশ্বাসবান্ নহেন। ক্রম-বিকাশ বা বিবর্ত্তবাদীরা ভবিষ্যতেই স্বর্ণ-যুগের কল্পনা করেন—তাঁহাদের মতে অতিমানুষ বা দেবতারা ভবিষ্যতেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন; 'ভূতে' তাঁহারা দেখেন শুধু সেই 'মহাভূত' সমাধি,—তাহা পাঁচটিই হোক্ বা চৌষট্টি কি ততোধিকই হোক্।

সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তদ্বিপরীত। বাইবেলে আদি-সৃষ্ট নর-দম্পতি নিষিদ্ধ ফলভক্ষণের পূর্ব্বে ছিলেন 'অপাপ-বিদ্ধ', তৎপরে ক্রমশঃ পাপভারাক্রান্ত হইয়া বংশানুক্রমে পাপপ্রলোভন জগতে সংক্রামিত করিয়াছেন।

অবশ্য 'পুনরুত্থানের (Resurrection) দিনে ত্রাণকর্ত্তা যিশুর কৃপায় সে পাপভার আবার বিমোচন হইবে, এ প্রকার আশার বাণী তাহাতে পাওয়া যায়; তবে সে আশা কবে যে পূরণ হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

আমাদের দেশে ত আমরা ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, এই কয়েকটি যুগ-বিভাগ করিয়া, কল্পনানেত্রে মানবের অধঃপতনের ইতিহাস ও ছবিই বিলোকন করি। সত্য-যুগে—পুণ্যং পূর্ণং, পাপং নাস্তি, পুষ্করনামতীর্থং, মজ্জাগতাঃ প্রাণাঃ, ইচ্ছামৃত্যুঃ, একবিংশতি হস্তপরিমিতো মানবদেহঃ, লক্ষবর্ষ পরমায়ুঃ, সুবর্ণ-নির্ম্মিত ভোজন-পাত্রং। আর সেই সত্যযুগের লক্ষণ হইতেছে—সত্যধর্ম্মরতো নিত্যং, তীর্থানাঞ্চ সদাশ্রয়াঃ, নন্দন্তি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ, সত্যেসত্যপরানরাঃ। সুতরাং আমাদের Superman বা অতিমানুষ ছিলেন সেই সুদূর অতীতে বা সত্য-যুগে। আর আমরা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ক্রমশঃ কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্রকায়, অল্পায়ুঃ, পাপরত মনুষ্যাধমে পরিণত হইয়াছি এবং হইতেছি। কলি-কালে—পুণ্যমেকপাদং, পাপং ত্রিপাদং, সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ, বিংশত্যধিক শতবর্ষ পরমায়ুঃ। আর সেই কলিকালের লক্ষণ হইতেছে—ধর্ম্মঃ সংকুচিতস্তপোবিচলিতঃ, সত্যঞ্চ দূরেগতং, ক্ষৌণী মন্দফলা, নৃপাশ্চ কুটিলাঃ, শাস্ত্রেতরা ব্রাহ্মণাঃ, লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ, স্ত্রিয়োপি চপলাঃ, পাপানুরক্তজনাঃ, সাধু সীদতি, দুর্জ্জনঃ প্রভবতি, প্রায়ঃ প্রবৃত্তে কলৌ। সত্যযুগের ছবি ও কলিযুগের ছবি তুলনা করিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে, আমরা অতীতে কেন এত শ্রদ্ধাবান্। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও কলিকালের কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ আছে, যথা:—

যদা তু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ,
ভবিষ্যন্তি শিবে শাস্তে, তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।
যদা স্ত্রিয়াঃ অতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহেরতাঃ
গর্হিষ্যন্তি স্বভর্ত্তারং, তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥

ইত্যাদি—

বর্ত্তমানে অসন্তোষ মানবচরিত্রের একটি বিশেষত্ব। এই অসন্তোষই মানবের ক্রমোন্নতির একটি প্রধান কারণ, এবং ইহাই আবার কোন কোন জাতির পক্ষে অধোগতিরও কারণ বটে। আমরা 'কলির জীব', সুতরাং আমাদের অধোগতি অনিবার্য্য। আবার প্রলয়ান্তে যখন সত্যযুগোৎপত্তি হইবে, তখন হয়ত আমাদের সৌভাগ্যসূর্য্যের রশ্মি-পাতে এই ভারত-ভূমি আলোকিত হইবে, কিন্তু প্রলয়কালপর্য্যন্ত আমরা 'যে তিমিরে সে তিমিরে'। কোন জাতির পক্ষে 'ভূতে' বা অতীতে অতিশ্রদ্ধা বা অস্বাভাবিক প্রীতি, জাতীয় জীবনগঠনের পক্ষে কতদূর উপযোগী, তাহাই বিশেষভাবে আমাদের আলোচনার বিষয়।

ইংলণ্ডের সভ্যতার ইতিহাসলেখক মহামতি বাকল ভারতের অতীতে বা ভূতে অতিশ্রদ্ধার বিষয় উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।—

Of all the various ways in which the imagination has distorted truth, there is none that has worked so much harm as an exaggerated respect for past ages. This reverence for antiquity is repugnant to every maxim of reason, and is merely the indulgence of a poetic sentiment, in favour of the remote and unknown.

কল্পনা সত্যকে যতপ্রকার উপায়ে বিকৃতি করিতে পারে, তন্মধ্যে অতীত যুগের প্রতি অতিশ্রদ্ধা যে পরিমাণে অনিষ্ট করিয়াছে, তেমনটি আর কিছুতেই করিতে পারে নাই। আর এই প্রাচীনকালের প্রতি ভক্তি, বিজ্ঞানের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার বিরোধী এবং সুধু "সুদূর ও অজ্ঞাতের" প্রতি কবিকল্পনার আসক্তি বই আর কিছুই নয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি যাহা বলিয়াছেন, উহার বঙ্গানুবাদ এই প্রকার হইতে পারে ঃ—

"ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের সময়ের প্রতি দৃষ্টি করিলেও কল্পনার অপ্রতিহত প্রভুত্ব পরিলক্ষিত হইবে। সর্ব্ব প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, গদ্যরচনার প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ ছিল না। উৎকৃষ্ট লেখকগণ প্রায় সকলেই, জাতীয় চিন্তা প্রণালীর অনুকূল বলিয়া, পদ্যরচনায় অবহিত ছিলেন। ব্যাকরণ, ব্যবস্থাশাস্ত্র, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, ভূগোল, দর্শন সম্বন্ধীয় অধিকাংশ গ্রন্থই পদ্যে লিখিত এবং নিয়মিত ছন্দে গ্রথিত।

ভারতীয় সাহিত্যের এই বিশেষত্ব যে কেবল বাহ্য আকারেই প্রকটিত তাহা নয়—তাহার মূল প্রকৃতিতেও সেই বিশেষত্ব পরিস্ফুট। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তিকে দূরে রাখাই যেন সে সাহিত্যের প্রকৃতি, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কল্পনার বাহুল্য ব্যাধিতে পরিণত, এবং প্রত্যেক বিষয়েই তাহার তাণ্ডব-লীলা।

ইহা হইতেই কবিদিগের প্রাচীন 'সুবর্ণযুগের' কল্পনা। সে যুগে মহাশান্তি বিরাজমান, নীচ প্রবৃত্তি প্রশমিত এবং পাপ দূরে গত। ইহা হইতেই ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌গণের মনুষ্যজাতির আদিম সরলতায় ও পুণ্যে এবং পরে সেই উচ্চাবস্থা হইতে অধোগতিতে বিশ্বাস। ইহা হইতেই,

প্রাচীনকালে মানব সুধু ধার্ম্মিক ও সুখী ছিল তাহা নয়, তাহার শারীরিক গঠনও শ্রেষ্ঠ ছিল, সে দীর্ঘবপু ও দীর্ঘায়ু ছিল—আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল ও অধঃপতিত মানবের সেই আয়ু এবং দৈহিক দৈর্ঘ্যলাভ অসম্ভব—এইপ্রকার বিশ্বাসের উৎপত্তি।" আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত যুগ-বিভাগ মহামতি বাকলের উক্তি সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতেছে।

আজকাল আমরা আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করিতেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সমস্ত কারণ নির্ণীত না হইলে, তাহা পরিহার করিতে বা তাহার প্রতিকার করিতে সক্ষম হইব না। আমরা আবার জগতে একটি শ্রেষ্ঠ ও গণ্যমান্য জাতিতে পরিণত হইব—ইহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান ব্যাধি ও তৎপ্রতিকারের বিষয় চিন্তা করিতেই হইবে। এক দিকে যেমন আমাদের প্রাচীন গৌরব ও প্রাচীন সভ্যতার কথা স্মরণ করিয়া হৃদয়ে বল আনয়ন করিব, অপরদিকে যাহাতে ভবিষ্যৎ আশার অরুণালোকে আমাদের হৃদয় উৎভাসিত হইয়া উঠে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিব। একটি বালককে অহর্নিশি 'মন্দ' বলিলে সে 'মন্দ' হইয়াই উঠিবে; আর যদি তাহার ত্রুটি দেখাইয়াও দুইটা আশার বাণী শুনানো যায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই একদিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। "প্রাচীনকালে যাহা ছিল তাহাই ভাল—বর্ত্তমান সুধুই সেই প্রাচীন কালের আবর্জ্জনা"—ইহা যে জাতি ভাবে, তাহার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই তমসাচ্ছন্ন। দিবাবসানে রাত্রি হয়, কিন্তু রাত্রির অবসানের অপেক্ষা করিতে পারিলেই আবার সেই ঊষার অরুণালোক এবং ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন তপনের তীব্র দীপ্তি পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞানবাদী ও প্রাচীন শাস্ত্রবাদীদিগের বিরোধ, সনাতন শাস্ত্র-

বাদীদিগের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, ও বিজ্ঞানবাদীদিগের ভবিষ্যতে আশা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ডারুইন্ ও ওয়ালেছের ক্রম-বিকাশ বা বিবর্ত্ত-বাদ যখন য়ুরোপে প্রচারিত হইল, তখনই সমস্ত ধর্ম্মযাজকেরা উদ্যত-দণ্ড হইলেন। কোথায় সেই ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত, সারল্যে ও সাধুতায় বিমণ্ডিত মানবদম্পতি হইতে লোক সমুহের উৎপত্তি, আর কোথায় মনুষ্যাকৃতি মর্কট (anthropoid ape) হইতে বর্ত্তমান সুসভ্য জাতি সমুহের ক্রম-বিবর্ত্তন! মর্কট ত দূরের কথা, অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য পূর্ব্বপুরুষ হইতে মানবের বর্ত্তমান সভ্যতা বিবর্ত্তিত, ইহা স্বীকার করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত। কিন্তু উন্নতিশীল য়ুরোপে সহজেই বৈজ্ঞানিক মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এবং সেই মত অবলম্বন করিয়া আবার কেহ কেহ ভবিষ্যৎ অতি-মানুষের কল্পনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

মনুষ্যজাতির ইতিহাসে যে অধঃপতনের দৃষ্টান্ত নাই, তাহা নয়। জড়জগতেও সে দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অনেক উদ্ভিদ্ ও জীব জন্তুর কিছুকাল উন্নতি হইয়া পরে অধোগতি হইতে থাকে, বা উন্নতির বেগ প্রতিহত হয়। নৈসর্গিক কারণসমবায়েই এ অবস্থা ঘটে। কিন্তু উন্নতি-কামী মানবের সে অবস্থা ঘটিলে চলিবে কেন?

প্রাচীন অনেক সভ্যজাতির অধোগতি হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, এবং ইতিহাসও তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, যে জাতি আবার 'নবজীবন' লাভ করিতে চায়, তাহার পক্ষে নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা ও নবীন উদ্যমের আবশ্যক। 'ভূতে' শ্রদ্ধাবান্ হইতে হয়—হও, কিন্তু ভবিষ্যতে আশা স্থাপন কর; নচেৎ শোকে ও নিরাশাসাগরে মগ্ন হইয়া, কুল পাওয়ার সম্ভাবনা চিরতরে

চ্যুত হইবে। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধায় যদি ভবিষ্যতের আশার বীজ উপ্ত করিতে পারা যায়, তবেই না উন্নতির সম্ভাবনা। যে জাতির ইতিহাস নাই, যে জাতির অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি একেবারেই নাই, তাহার উন্নতির সম্ভাবনাও যেমন সুদূরপরাহত; আবার যে জাতি কেবল অতিশ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া ভবিষ্যৎ আশা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে জাতির পক্ষেও উন্নতির আশা তদ্রূপ সুদূর-পরাহত।

মহামতি বাকলের কথা লইয়া ইত্যাকার আলোচনা করিতে করিতে, ভারত-গৌরব, ঋষি-কল্প, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি, বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ স্যর্ জগদীশচন্দ্র সেদিন তাঁহার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

তিনি বলিতেছেন ঃ—

"যে মুমূর্ষু, সেইত মৃত-বস্তু লইয়া আগ্‌লাইয়া থাকে; যে জীবিত, তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইয়াছি যে, এই বর্ত্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্লাবিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবল পুরাতন গ্রন্থপ্রকাশ লইয়া থাকিবে না, বর্ত্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি 'জীবন্ত সাহিত্য' গঠিত করিয়া তুলিবে।"

এই আশার বাণী লইয়া বৈজ্ঞানিক অক্লান্তদেহে গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। আশা ভবিষ্যতে, কার্য্য বর্ত্তমানে, শ্রদ্ধা অতীতে।

সেই শ্রদ্ধা অতি-শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়া যদি বর্ত্তমানের কার্য্যকারিণী শক্তিকে পরাভব করে, এবং ভবিষ্যতের আশালোককে ক্ষীণ বা পরিম্লান করে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে,—

"ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ ॥"

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত।



সোনার তরী।

——[::*::]——

সোনার তরী কবির ত্রিশ হইতে বত্রিশ বৎসর বয়সে লেখা। ইহার অনেকগুলি কবিতাতেই প্রত্যক্ষভাবে নদীর প্রভাব আছে। ইহার পদ্মা বর্ষার পদ্মা। প্রথম বর্ষাসমাগমে নদী ছাপাইয়া উদ্বেল আনন্দে আপনাকে লইয়া আপনি মত্ত হইয়া ওঠে, তাহার তীরের বন্ধন যে আছে বারে বারে তাহা ভুলিয়া যায়, আপনার প্রাচুর্য্যের গণ্ডিতে আপনি সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে;—এই বইখানিতে কবির প্রতিভারও সেই অবস্থা। অকস্মাৎ শক্তির পূর্ণতা অনুভব করিতে পারিয়া কবি দুঃসহ আনন্দ বেগে পূর্ণ পালের মত ফুলিয়া উঠিয়াছেন। বর্ষার পদ্মার মত কবি ইহাতে আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত। এক কথায় সোনার তরীর পদ্মায় তীর হইতে নীরের প্রাধান্য; লোকালয় হইতে জলাশয়ের আতিশয্য। ভূতত্ত্বে বলে পৃথিবী প্রথমে জলময় ছিল—কালক্রমে তাহাতে ডাঙ্গা জাগিয়াছে; কবির পৃথিবী এই পুস্তকে জলময়—স্থলের রেখা তাহাতে কদাচিত দেখা যায়। বর্ষার উন্মত্ততার অবসানে যেমন ধীরে ধীরে ডাঙা স্পষ্ট হইতে থাকে, তেমনি দেখিব কবির পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থে জলাশয়ের বিস্তৃতি কমিয়া লোকালয়ের চিহ্ন চোখে পড়িতেছে, কবি নিজেকে লইয়া আর মুগ্ধ না থাকিয়া বিচিত্র পৃথিবীর সহিত পরিচয় সাধনে ব্যস্ত। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। বিশ্বের বৈচিত্র্যকে বিশেষ শক্তি দ্বারা নিজের অন্তরে আনন্দময় রূপ দিয়া

আবার তাহা বিশ্ববাসীকে ফিরাইয়া দেওয়া কবি ও শিল্পীর কাজ, এবং ইহাতেই আর্টের চরম সার্থকতা। মেঘদূতের মূল সূত্রটি লইয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব মেঘদূত কেন চিরন্তন—কালিদাস কেন অপূর্ব্ব। কালিদাসের মেঘ বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত ছিল, শিপ্রা-তীরের কবি স্বয়ং এই উভয়বিধ সর্ব্বাঙ্গীনতা লাভ করিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। পদ্মাতীরের কবি সোনার তরীতে অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ অর্দ্ধেক মাত্র—কেবল নিজেকে লইয়াই সম্মুগ্ধ—পৃথিবীর সহিত তাঁহার প্রেম ও জ্ঞানের পরিচয় স্থাপিত হয় নাই। কয়েকটি কবিতার আলোচনা করিলে আমার কথা উদাহরণের দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

মানস-সুন্দরী কবিতাটি সকলেই পড়িয়াছেন। কেবলমাত্র এই কবিতাটি লিখিলেই অনায়াসে রবীন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারিতেন। কবিতাটির নামেই প্রতীয়মান, কবি নিজের কল্পলোকের অধিষ্ঠাত্রীকে সম্বোধন করিতেছেন। কল্পনার সহিত বাস্তবলোকের সংমিশ্রণ হইয়াছে নিঃসন্দেহ। তবু এ কথা না বলিয়া পারা যায় না যে, বিশেষ ভাবে নারীর মানসমূর্ত্তিকে, অর্থাৎ নারী যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে আপনার এবং অন্তঃপুরবাসিনী—তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া ইহা লিখিত। ইহার সহিত পরবর্ত্তী পুস্তক চিত্রার উর্ব্বশীর কত প্রভেদ। সম্পূর্ণ এক বস্তুকে সম্পূর্ণ দুই স্থান হইতে দেখা হইয়াছে। উর্ব্বশী হইতেছে নারীর বিশ্বগত মূর্ত্তিটি—ব্যক্তিগত নহে; মাতা নহে, কন্যা নহে, বধূ নহে। মানস-সুন্দরীতে কবির নজর ছিল নিজের দিকে, এখানে তাহা পৃথিবীর দিকে।

দেউল কবিতাটিতে কবি যে বিশ্ববিহীন নিস্তব্ধতা ও নিভৃত ভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহা নিজের অন্তরের। বজ্র পড়িয়া হঠাৎ দেউল

ভাঙিয়া "সংসারের অশেষ সুর ভিতরে এল ছুটি।" ইহা কবির আকাঙ্ক্ষার বিষয়—কিন্তু এখনও উপলব্ধ সত্য নহে। বসুন্ধরা কবিতায় তিনি খুলিয়া বলিয়াছেন, "এখনো মেটেনি আশা, এখনো তোমার স্তন-অমৃত পিপাসা মুখেতে রয়েছে লাগি।" কবি জীবধাত্রী ধরিত্রীকে ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে রাজী নন; শিশু যেমন মাতাকে আঁকড়িয়া থাকে, কবি তেমনিভাবে অন্তর্জগৎকে, নিভৃতবাসিনীকে কল্পনার বাহুবেষ্টনে ঘিরিয়া আছেন। সোনার তরীতে বাহির বিশ্বের কথা অল্পই, ইহাতে নিজের হৃদয়কে নিঃশেষে ভোগ করিবার ও জানিবার আকাঙ্ক্ষা একমাত্র লক্ষ্য। বস্তুত নিজের সহিত যোগ স্থাপিত না হইলে, প্রেমের বন্ধন গ্রন্থিযুক্ত না হইলে, পৃথিবীতে বাহির হইয়া কোনো লাভ নাই, কারণ অপরকে জানা যায় নিজেকে জানিবার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই—যেমন বর্ষায় একবার নদী আনন্দে ও জলে উদ্বেল না হইয়া উঠিলে তারপরে ফসল ফলিবে জমির কোন্ রসের অভিজ্ঞতায়? কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—গদ্যপদ্য সংব্যাপ্ত যে কবির জীবন, তাহার সমস্ত সার্থকতা কেবলমাত্র পদ্যে খুঁজিলে মিলিবার নয়। পৃথিবী যেমন বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকাকে লইয়া সম্পূর্ণ, কবির জীবনও তাঁহার কল্পলোক ও বাস্তবের সমাবেশেই গঠিত। বায়ুমণ্ডলে যে সব কাণ্ড ঘটে, তাহার সহিত পৃথিবীর ধূলি রাজ্যের বিশেষ যোগ নাই; তাহার মেঘবিলাস, তাহার বর্ণচ্ছটা, তাহার বিদ্যুৎবিকাশ, তাহার ইন্দ্রধনুর মণিমাণিক্যের কলাপবিস্তার সমস্তই খানিকটা অপার্থিব; কিন্তু সেই মেঘ যখন বৃষ্টিরূপে, সেই বিদ্যুৎ যখন বজ্ররবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তখনই তাহার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। কাব্যটা আমাদের মনের সেই ঊর্দ্ধলোক—সেখানে

এমন সব অলৌকিক ব্যাপার হয়, যাহার সব তথ্য উদ্ঘাটন কবির দ্বারাও সম্ভব নয়। গদ্যের এই ভূমিরাজ্যের কোনো কোনো খবর আমরা বলিতে পারি বটে। সোনার তরীর কবিতাগুলিতে যে সমস্ত আশা, আশঙ্কা, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়াও অতৃপ্তির যে একটা আভাস, নিজের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত মিলিত হইবার যে প্রবৃত্তি,—কবির গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে তাহা দেখা যায়, অশরীরী রূপ কাটাইয়া অনেকটা মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। সোনার তরীর পূর্ব্বে লিখিত অনেকগুলি গল্পে আমরা দেখিতে পাইব, কবি স্বরচিত কল্পলোক ত্যাগ করিয়া গ্রামবাসীদের জীবন-যাত্রার সহিত কিরূপ ভাবে মিশিবার চেষ্টা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত গল্পগুলিও লিরিক-গল্প। এগুলি পাথরের খোদিত মূর্ত্তির মত নিরেট নহে—বুদ্বুদের মত ভঙ্গুর। এক একটি চরিত্রের বৃন্তকে অবলম্বন করিয়া এক একটি আকাশকুসুম ফোটানো। উর্ণনাভ যেমন সামান্য যে-কোনো একটা কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া নিজের শরীরের রস দিয়া জাল বুনিতে থাকে, এও অনেকটা তেমনি তুচ্ছ একটা বিষয়কে আশ্রয় করিয়া আপনাকে লোক এবং লোকালয়ের মধ্যে, অন্তরকে বাহিরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার একটা আকাঙ্ক্ষা মাত্র। খোকাবাবু, সম্পত্তি সমর্পন, দালিয়া, মুক্তির উপায়, একরাত্রি, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, সুভা, মহামায়া প্রভৃতি গল্প ইহার প্রমাণ। তাঁহার অঙ্কিত এই সব চরিত্রের আভাস, কে বলিতে পারে কতদিন কবি তাঁহার পরিচিত অপরিচিত কত লোকের মুখে কতদিন দেখিয়াছেন। তাঁহার রাইচরণ, অর্থলিপ্সু যজ্ঞেশ্বর, বুড়ো জেলে, সন্ন্যাসগ্রস্ত মাখন, সুরবালা, কাদম্বিনী, কাবুলিওয়ালা,

ফটিক চক্রবর্ত্তী, বোবা মেয়ে সুভা, পলায়নপরা মহামায়া, বঙ্গ-সাহিত্যের ধ্রুবলোকে স্থান পাইবার পূর্ব্বে শিলাইদহের নগণ্য পল্লীর অধিবাসী ছিল। কবি ইহাদিগের আশ্রয়ে সমস্ত গ্রাম্যজীবনের সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া নিজের কল্পলোক হইতে বাহিরে আসিবার ইচ্ছাকে কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী রচনাসমূহে আমরা দেখিব কবির জীবন গদ্য ও পদ্যের দুই পক্ষের সাহায্যে কিরূপে সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতার অভিমুখে বহু বঙ্কিম গতিতে অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

৺সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের পত্র।

——:*:——

[আজ দিন চার পাঁচ হল, আমার পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে, ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পদ্যে লেখা একখানি পত্রের সাক্ষাৎ পেলুম। আমার "পদচারণ" উপহার পেয়ে তিনি আধ-মজা করে ঐ পত্রখানি আমাকে লেখেন। সত্যেন্দ্রনাথের হাত থেকে যখন যা বেরিয়েছে, তারই আমার বিশ্বাস ছাপার অক্ষরে ওঠবার অধিকার আছে। এই বিশ্বাসবশতই সে পত্রখানি আমি সবুজ-পত্রে প্রকাশ করছি। আশা করি কেউ মনে করবেন না যে, ওখানি আমি আমার সার্টি-ফিকেট হিসেবে পাঠকের দরবারে পেশ করছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।]

পদচারণের কবি—

মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়

সমীপে—

রসের যে সিধা পেনু ঢোলে চাঁটি পড়ার শবদে,—
পাঠাই রসীদ তার, ঢাকে কাঠি থামিবার পরে;
জানেন্ তো কুঁড়ে গরু চিরদিন ভিন্ন গোঠে চরে,
কুঁড়েমি কায়েমি যার, ত্রুটি তার ঘটে পদে পদে।

ম । বোঝে না কেউ, মনে ভাবে মেতে আছে মদে,
কেউ কয় 'চালিয়ান্!' 'কি অসভ্য!' কেউ মনে করে।
আমি শুধু তুলি হাই,—চিঠির কাগজ নাই ঘরে,—
দোয়াতে মসীর পঙ্ক,—এক ফোঁটা জল নাই গঁদে!

লেফাফা*দূরস্থ অতি, পোষ্টাপিসে বিকিকিনি তার,
লেফাফাদুরস্ত হওয়া তাই আর হ'ল না আমার।

হু হু করে বে-পরোয়া চ'লে যেতে চায় দিনগুলো,
হাঁ হাঁ ক'রে পদে পদে ওদের কি রাখা যায় ধ'রে ?
বিশেষে গরম দেশে,—হাঁফ্ ধরে, নাকে চোকে ধূলো ;
ঢাকে ঢোলে চিঠি তাই লিখি আমি দু'বার বছরে।

গোড়াতে জানিয়ে হাল, ক্ষমা চাই বিনয়-বচনে,
ওগো ছন্দ- * ! পদচারণের কবিবর !
পায়চারি করে চিত্ত তব গুঞ্জ-গীতিকুঞ্জবনে,
তারিফে ফুটিয়ে তারা, পদে পদে, নিত্য নিরন্তর !

ইতি—
ভবদীয়
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

---

* অস্পষ্ট।

সামান্য কারণে।

(য়াথিন্তো বেনাভেন্তের স্পানিশ হইতে)

একাঙ্ক নাটিকা।

পাত্র পাত্রী।

এমিলিয়া।

মানুয়েল।

গণ্থালেথ্।

হার্নান্দেথ্।

একজন ভৃত্য।

প্রথম দৃশ্য।

বৈঠকখানা।

গণ্থালেথ্, মানুয়েল ও ভৃত্য।

ভৃত্য—আর পেড়াপিড়ি করবেন না; আপনাকে বল্‌ছি সেঞোর* বাড়ী নেই, আজ মোটেই ফির্‌বেন না।

গণ—যখন আমি এসেছি, তিনি নিশ্চয়ই বাড়ীতে আছেন; আমি ভিতরের খবর বিলক্ষণ জানি।

ভৃত্য—আমাকে মুস্কিলে ফেল্‌তে চান আপনি—

---

* সেঞোর—ভদ্রলোক; সেঞোরা—ভদ্রমহিলা।

গণ—মোটেই না…এই কার্ডখানা তাঁকে দাওগে।

ভৃত্য—কিন্তু, মশাই…

গণ—কিংবা তাঁর স্ত্রীকে, একই কথা…যেমন করে'ই হোক্ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা কর্‌তেই হবে।

ভৃত্য—দেখুন…

গণ—আর কোন কথা না, আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তেই হবে।

ভৃত্য—মশাই,…আপনার যা খুশী কর্‌তে পারেন; কিন্তু আমি বলে' রাখছি আপনাকে…

গণ—কিছু বলে' রাখবার দরকার নেই তোমার। তোমাকে তিনি হয়ত এরকম হুকুম দিয়েছেন…হুঁ;…সবই জানি আমি,…এ রকম অবস্থায় কি ঘটে;…আর কি করতে হয় সাধারণতঃ, সেটাও জানি; এখনই তুমি দেখতে পাবে—

ভৃত্য—আপনার যেমন অভিরুচি।

(মাসুয়েলের প্রবেশ)

গণ—দেখলে ?

ভৃত্য—সেঞোরের হুকুম আমি তামিল করেছি—কিন্তু সেঞোর…

মানু - আচ্ছা…

(ভৃত্যের প্রস্থান)

গণ—বুঝেছেনত আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার নেহাৎ দরকার কেন ?

মানু—আপনিও বুঝেছেন কারো সঙ্গে আমি দেখা কর্‌তে চাইনে কেন—বিশেষতঃ আপনার মত বন্ধুদের সঙ্গেত নয়ই। আমি

জানি কি বল্‌তে এসেছেন আমাকে...অনাবশ্যক, সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; আমার সঙ্কল্প অটল...ঘটনাটা কি তা' প্রেসিডেণ্ট আপনাকে ব'লেছেন, খবরের কাগজেও পড়েছেন;...আপনাকে আর বেশী কিছু বল্‌বার নেই।

গণ—কিন্তু...

মাত্মু—অনর্থক, সম্পূর্ণ অনর্থক...কেউ বল্‌তে পারবে না এ গোলযোগ আমি ডেকে এনেছি। আপনি জানেন মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করা অবধি আমাকে কত ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে; মন্ত্রীসভায় থাকা মানে আমার পক্ষে ত্যাগস্বীকারের পরম্পরা মাত্র; যতক্ষণ কেবল আমার ব্যক্তিগত মত, এমন কি আমার মনোভাব সম্বন্ধে কথা ছিল, আমি মন্ত্রীর দপ্তর চালিয়েছি,—কিন্তু এখন, আর না; এখন কথা হচ্ছে জনসাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমার কর্ত্তব্য নিয়ে; এই নূতন ত্যাগের দাবী মেনে নেওয়া আর আমার সমগ্র রাষ্ট্রীয় জীবন অস্বীকার করা একই কথা; তার অর্থ আমাদের দলে আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করা; আমার ব্যক্তিত্ব, আমার বিবেকবুদ্ধি অস্বীকার করা; ততদূর যাওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য—কারণ, সেটা আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করার সমান হবে।

গণ—কিন্তু ভাই! অবস্থাটা কি, একবার ভেবে দেখ। ঐ গোলযোগ...

মাত্মু—সে দোষ আমার নয়...আমার সৎপরামর্শ কেউ কানে তুল্লে না, আমি যা' ছেড়ে দিতে রাজি সেটা অগ্রাহ্য করলে—দল আমার সর্ব্বস্ব নয়;...আমি আইডিয়াকে মানুষের চেয়ে বড় বলে' মানি।

গণ—সেই জন্যই মানুষের সঙ্গে রফা করা দরকার, যাতে করে নির্ব্বিবাদে আইডিয়ার অনুসরণ করতে পারেন।

মানু—মিছে বাক্যব্যয় করছেন। আমার সঙ্কল্প অটল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পূর্ব্বানুরূপ ও হার্নান্দেথ্।

হার—ঠিক! আমি জানতেম বাড়ীতেই আছেন আপনি...... চাকরটা ত আমাকে ঢুকতে দিতেই চায় না। ওহে গণ্থালেথ্...

গণ—কি ভাই হার্নান্দেথ্! তুমিও কি আমার মত এসেছ...আমাদের বহুমান্য বন্ধুকে সম্মত করাতে?

হার—আমাদের প্রিয় বন্ধুকে...কিন্তু আপনিই রাজি করিয়েছেন নিশ্চয়...সেটা হতেই পারে না...বর্ত্তমান অবস্থায় সঙ্কট ডেকে আনা—আর সঙ্কট কিনা...তুচ্ছ বিষয়ের জন্য! আপনার ব্যক্তিগত অসন্তোষের কারণ থাক্‌লেও বা বুঝতেম;—বিশেষতঃ আপনি জানেন, গবরমেণ্টে ও মেয়র-আফিসে যথার্থ বন্ধু যাঁরা, তাঁরা আপনার হাতে রয়েছেন।

মানু—কিন্তু আমি যে-সকল গুরুতর বিষয়ের অনুমোদন করেছি, উক্ত বন্ধুগণ যে সে-সকল বিষয়ে আমার মতে সায় দেন না।

হার—কিন্তু কারণটাই ত যথেষ্ট নয়; ব্যক্তিগত ভাবে ত কেউ আপনাকে কিছু দিতে অস্বীকার কর্‌বেন না।

মানু—জনসাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করতে দিতে যে অস্বীকার করছেন।

গণ—কিন্তু জনসাধারণ আপনি বলছেন কা'কে! সংবাদপত্রগুলোকে? ওগুলো পড়া যদি আপনি ত্যাগ করতেন!

মানু—আমার বাবা দুর্ব্বলতাবশতঃ আমাকে কলেজে দেন এবং আমিও দুর্ব্বলতাবশতঃ লেখাপড়াটা শিখে ফেলি···হ্যাঁ, গোড়ায় পড়্‌বার বদ-অভ্যাসটা ঐরকম করেই হয়। বিপদ এলে চোখ মেলে দেখ্‌তে চায় না বলে' অষ্ট্রিচ ডানার নীচে মাথা গোঁজবার যে অভ্যাস করেছে, যে ব্যক্তি শাসনভার নিতে যায় তার পক্ষে সেটা মোটেই সদভ্যাস নয়।

গণ—কিন্তু, প্রিয় বন্ধু, তার চেয়ে আপনার অনেক বেশী চরিত্রবল আছে বলে' আমার বিশ্বাস ছিল।

মানু—আজকাল আপনারা চরিত্রবল বলেন কোনরূপ চরিত্র না থাকাকে, কোনরকম কাজ কর্‌তে বাধাবোধ না করাকে। ও কথা এ স্থলে খাটে না ভাই।

হার—সব-কিছুর উপরে ওঠা, সেটা ঠিক জিনিষ নয়,···সকল বিষয় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা···

মানু—কেন মিছে আপনারা ক্লান্ত হচ্ছেন! আমার সঙ্কল্প অটল।

গণ—কিন্তু প্রিয় বন্ধু···ভেবে দেখুন···আপনি ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুতর করে তুল্‌ছেন, বিরুদ্ধপক্ষের হাতে অস্ত্র যুগিয়ে দিচ্ছেন···

মানু—ঠিক তার উল্টো। আমি আমার সহকারীদের মিটমাট করবার পন্থা সহজ করে দিচ্ছি।

হার—আপনি ত জানেন যে, আপনার পদে নূতন লোক এখন নিযুক্ত

হলে তাতে দলের ভিতরকার অনৈক্য বাইরে সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়বে।

মান্নু—আমি তাই চাই! সব দলকে আলাদা আলাদা করে' দিতে হবে, প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করতে হবে, প্রচ্ছন্ন গোলযোগ ঘুচিয়ে দিতে হবে।

গণ—কিন্তু প্রচ্ছন্ন গোলযোগ ঘোচাবার বিপদ আপনি ত জানেন। বিশেষতঃ সে চেষ্টার ফলে যখন আপনার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে।

মান্নু—আমি বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে' থাকতে রাজি আছি।

হার—একবার দেখুন না যতখানি ছাড়া আপনার পক্ষে সম্ভব, তার শেষ সীমা পর্য্যন্ত আসতে পারেন কি না।

মান্নু—তার শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমি অনেক আগেই এসেছি।

হার—তবু যদি একটা কোন উপায় খুঁজে পান, যা অবলম্বন করা সম্ভব।

মান্নু—আমি সেরূপ একটি উপায়ের প্রস্তাব ত করেছি।

গণ—সেটা সম্ভবপর নয়।

মান্নু—তবে দ্বিতীয় উপায় আর নেই।

হার—একটু সময় দিন আমাদের; সকলে মিলে একটা উপায় আমরা নিশ্চয়ই বের করতে পারব।

মান্নু—না।

গণ—একটা দিন।

মান্নু—না।

গণ—একটি ঘণ্টা মাত্র,—বিরুদ্ধপক্ষের দলপতির সঙ্গে একবার কথা ক'য়ে দেখব, আর তাঁর উত্তর নিয়ে তখনি ফির্‌ব—কিন্তু আরো একটুখানি ছাড়বেন আপনি।

মানু—কখ্‌খনো না। যা ছাড়তে পারি তার শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমি পৌঁচেছি।

হার—আচ্ছা আমাদের সঙ্গে আর একবার কথা না বলে' আপনার সঙ্কল্পের কথা কাউকে জানাবেন না,—এই প্রতিশ্রুতিটুকু আমাদের দেবেন ত?

মানু—আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। উপায় সম্বন্ধে আমার শেষ প্রস্তাব সর্ব্বাংশে গ্রহণ করা না হ'লে আপনাদের প্রত্যাবর্ত্তন অনর্থক।

গণ—সর্ব্বাংশে? আর এক ধাপ এগিয়ে আসুন, বন্ধুবর!

মানু—সামনে এগিয়ে চলা ভিন্ন অন্য কোনরূপ চলা আমার জানা নেই। আর এক ধাপ এগনোর মানে আরো কিছু কম ছাড়া।

হার—আপোষের দিকে এগিয়ে আসুন—আর সকলেও ঐ মুখে এগিয়ে আস্‌বে, তখন সব মিটে যাবে—ইতিমধ্যে......, এক ঘণ্টা সবুর......, এক ঘণ্টা......, আপনি ভেবে দেখুন; ইতিমধ্যে......, আমরা চেষ্টা করে'......

মানু—আমার বিশ্বাস আপনারা কিছুই করতে পারবেন না—আমি যতটা আপনাদের ছেড়ে দিতে পারি, তা আমার কাছ থেকে পেয়েছেন; সেটুকুও ছেড়েছি আপনাদের সদ্ভাবের জন্য কৃতজ্ঞতাবশতঃ।

গণ—আপনি ত জানেন, আমরা আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল।

হার—যতক্ষণ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, ততক্ষণ আমরা আপনার অনুগত থাকব। শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

গণ—প্রিয় বন্ধু·········

(উভয়ের প্রস্থান)

মানু—কারো সঙ্গে আর দেখা করব না—কোন অজুহাতেই কাউকেও আর আস্‌তে দেবে না—বলবে আমি মোটরে করে বেরিয়ে গেছি—একেবারে সহর ছেড়ে মফঃস্বলে গেছি—কোথায় আছি জানিনা—কাউকেও না, যাই হোক্ না কেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

মানুয়েল এবং এমিলিয়া।

এমিলিয়া—মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহ করে' দেখা দেবেন কি?

মানুয়েল—এস, এস!

এমি—এখনও খবরের কাগজ পড় নি?

মানু—কেন?

এমি—কারণ, রোজই তা' পড়ে' পড়ে' তোমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়। যদি আমার মত হ'তে—আমি ও-জিনিষ কখনো পড়িনে।

মানু—তোমাকে মন্ত্রীসভার সভাপতিত্বে বরণ করা উচিত।

এমি—অবশ্য সমাজের ও নাটকের খবর ছাড়া—আর বিজ্ঞাপন।

মানু—ঠিক বলেছ; বিজ্ঞাপনগুলি একবার দেখা যেতে পারে।

এমি—কি হচ্ছে না হচ্ছে জানবার জন্য তোমার মুখ দেখাই যথেষ্ট—আজকের দিনটা ভাল।

মানু—সে কথা সত্য; আজ কোন খবর নেই।

এমি—অত্যন্ত আনন্দের বিষয়! আর বাস্তবিক, কি খবরই বা থাকবে...দিনের পর দিন এমন একঘেয়েভাবে চলা আর কখনো দেখেছ? বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছে—এক্‌সচেঞ্জ পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে।

মান্নু—আমার চেয়ে দেখছি তুমি বেশী খবর রাখ—তবু বল যে খবরের কাগজ পড়িনে।

এমি—বাস্তবিক পড়িনে; আমার দরজীর কাছে শুনেছি—পারী থেকে তারা একটা ফরমাসী মাল পাঠিয়েছে, তার টাকা দেবার সময় হয়েছে, টাকা দিয়েও দিয়েছি আমি—কি বল্‌ছ? দেখ, ব'লো না যেন যে আমি বেশি টাকার দাবী কর্‌ছি—আমি, আমি......হাঁ সেঞ্জোর! সাধারণ মাসিক খরচ থেকে...

মান্নু—আমি ত কোন আপত্তি করছি নে।

এমি—ওঃ, আমি ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত মস্ত বড় একজন মন্ত্রিণী হয়েছি! দেখ, আমি কোনরকম বায়না করি নে—উপ্‌রি খরচের তহবিলে হাত না দিয়ে আমার পোষাকের ব্যয় নির্ব্বাহ!.... তোমার ধারণাই নেই তা'তে কিরকম খরচ লাগে—সমস্ত কাগজগুলো বলে আমার বেশভূষায় সুরুচি ও বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। মন্ত্রীপক্ষের কাগজেও বলে, বিরুদ্ধপক্ষের কাগজও এই কথা বলে।

মান্নু—সামাজিক সংবাদদাতারা চিরদিনই মন্ত্রীপক্ষীয় হয়ে থাকে। স্ত্রীশাসন চিরকালই অত্যন্ত অত্যাচারী এবং তিলমাত্র বিরুদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

এমি—বরং অত্যন্ত উদার, তাই তার বিরুদ্ধাচরণ হতেই পারে না···
কি শিষ্টতার অভাব তোমার !

মানু—পারী থেকে এমন কি আশ্চর্য্য জিনিষ এল, আমরা শুনতে পাই কি ?

এমি—ওঃ ! শীঘ্রই দেখতে পাবে···সে একটা কবিতা,···একটা স্বপ্ন···একটা আদর্শ পোষাক ! সে আর্টের একটি সৃষ্টি ! পুরুষেরা সে সব সুক্ষ্মতত্ত্বরসাস্বাদনের অধিকারী নয়···তবে সমষ্টি হিসেবে বটে ;—কিন্তু ব্যষ্টি হিসেবে···

মানু—কিন্তু সেই ব্যষ্টির একটা অংশ সম্ভবতঃ জিনিষটার দাম।

এমি—দামের কথা বল্‌ছ ? এরকমের পোষাক বরাবরই সস্তা হয়, আর আমার কাছে তাদের দর আলাদা। ঠিক এই জিনিষ অন্যের কাছে তিন হাজারের কমে ছাড়বে না, কিন্তু আমার কাছে নিয়েছে দু'হাজার নয় শ পঁয়তাল্লিশ···, সবসুদ্ধ··· কাষ্টম্ শুল্ক, ডাক খরচা···

মানু—হুঁ ! সস্তা বটে।

এমি—সে একটা প্রকৃত সৃষ্টি..., আর আশ্চর্য্য এই যে, দেখ্‌তে কিছুই নয়..., সেই ত সত্যিকার ফ্যাশন, একেবার সাদামাঠা... হাতে নিয়ে হয়ত বল্‌বে, এর আবার দাম কি,...যে-সে ত এমন জিনিষ বানাতে পারে। কিন্তু যেই সেটা কারো গায়ে ওঠে···তখন...দেখ্‌বে...দেখ্‌বে...

মানু—সে সৌভাগ্য কবে হচ্ছে ?···

এমি—কি যে জিজ্ঞাসা কর ! পরশু সকালে, প্রাসাদে, যখন তুরস্ক যুবরাজের সম্বর্দ্ধনার্থ ভোজ হবে।

মান্নু—পারস্যদেশের—

এমি—তবেই হ'ল...এবার আর বুককাটা পোষাক নিয়ে বক্তৃতা দেবার সুবিধা পাচ্ছ না...

মান্নু—না, আমি আর কিছু বল্‌ছি নে..., ভাল কথা...সে ভোজটা যখন...

এমি—কি! বন্ধ হয়ে গিয়েছে? যুবরাজ আস্‌বেন না?

মান্নু—তিনি আসবেন, হাঁ সেঞোরা,—আর তিনি না এলে আর কেউ আস্‌বে,...কিন্তু সেদিন আর আমি মন্ত্রী থাক্‌ব না।

এমি—কিরকম! কেন, কোন সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে? তাই বা কি করে' হবে? আমার চুল-বাঁধুনী ত আমাকে কিছুই বলেনি!..

মান্নু—সে এখনও এ খবর জানে না...

এমি—সে ত গণ্‌থালেথ্‌ আর হারনাদেখের বাড়ীতেও কাজ করে!...

মান্নু—সঙ্কটটা আংশিক মাত্র—আমি একাই ইস্তফা দিচ্ছি...

এমি—তুমি একা? এমন কি করেছ তুমি, যে তোমাকে একা ইস্তফা দিতে হচ্ছে?

মান্নু—এখন তোমাকে সে কথা বল্‌তে পার্‌ছিনে—কিন্তু যথেষ্ট কারণ আছে...

এমি—আঃ, তাহ'লে তোমার আপন ইচ্ছায়—

মান্নু—তা' নয়ত কি? তুমি কি ভাবছ তারা আমাকে ত্যাগ করেছে?

এমি—তা ছাড়া ত আমি বুঝ্‌তে পারছিনে। ব্যাপারখানা কি—

মান্নু—আমার মতের সঙ্গে গবরমেণ্টের মতের মিল হচ্ছে না...; সকলের উপরে আমার মত...

এমি—আমার বিশ্বাস ছিল তোমার মতই গবরমেণ্টের মত...

মান্নু—কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমারও তাই বিশ্বাস ছিল।

এমি—ওঃ, তাহলে মোটে কাল সন্ধ্যায় এই ব্যাপার ঘটেছে!...আর আমাকে তুমি কোন কথাই বলনি!...

মান্নু—রাত্রে একবার সব ভেবে দেখ্‌ব মনে করেছিলেম।

এমি—ও, তাই সারারাত ছট্‌ফট্‌ করছিলে!...ইস্তফাপত্র তারা গ্রহণ করেছে?

মান্নু—করুক্‌ বা না করুক্‌...

এমি—ওঃ! তাহলে এখনও সেটা পাঠাওনি?

মান্নু—হাঁ, একরকমে...চিঠিতে দস্তুরমতভাবে এখনও পাঠাইনি।... তারা আশা করছে আমাকে নিরস্ত করতে পারবে...তারই চেষ্টা চল্‌ছে...

এমি—নিরস্ত করতে পেরেছে?...

মান্নু—কোনমতেই নয়...আমার সঙ্কল্প অটল। যতখানি ছাড়া যায় আমি ছেড়েছি...

এমি—তুমি যে ধার চেয়েছিলে, তা দিতে চায় না তারা?

মান্নু—হাঁ, তা দেবে...; আমাকে তুষ্ট করবার জন্য তারা উঠে পড়ে' লেগেছে।

এমি—তবে...?

মান্নু—তা'তে কিছু এসে যায় না...ধার নিয়েত কথা নয়...এ হচ্ছে জনসাধারণের নিকট, দেশের নিকট আমার দায়িত্বের কথা... তোমাকে আর কি বোঝাব?—তবে এটুকু জেনে রাখ যে যথেষ্ট কারণ আছে...

এমি—কি জানি...; কিন্তু তোমার একা ইস্তফা দেওয়া...এটা অত্যন্ত বিসদৃশ...লোকে বল্‌বে তোমার কোন কারণই নেই...

মাম্মু—তা'ত বল্‌বেই...

এমি—আরো এক কথা...,সবাই নিজ নিজ পদে বাহাল থাকবে...কি বিশ্রী যে দেখাবে...আর তোমার শত্রুরা আনন্দ করবে...

মাম্মু—আমার শত্রুরা স্বীকার কর্‌বে যে আমার আন্তরিকতা আছে।

এমি—অর্থাৎ তুমি বল্‌তে চাও যে, মিত্রের সঙ্গে সদ্ভাব রাখার চেয়ে শত্রুর সঙ্গে সদ্ভাব রাখা তোমার বেশী পছন্দসই!

মাম্মু-দেখ এমিলিয়া! তোমাকে রাজনৈতিক বন্ধুরূপে কোনদিন দেখ্‌তে ইচ্ছা করিনি, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ত দূরের কথা।

এমি—আমিও তা মনে করিনে...,কিন্তু চিরকাল দেখেছ আমি কেমন সৎপরামর্শদাত্রী গৃহিণী..., সেইরূপেই সর্ব্বদা আমাকে দেখো। এ কথা বল্‌তে পার্‌বে না যে আমি কখন তোমার কাজে হাত দিতে গিয়েছি। তোমাকে সুপারিশ-পত্র দেওয়ার জন্যও কখন বিরক্ত করিনি..., তুমিত জান কত লোকে সেজন্য আমাকে ধরেছে...তোমাকে কোনরকমে বিরক্ত কর্‌ব না বলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অসদ্ভাব পর্য্যন্ত হয়েছে। তুমি মন্ত্রী হবার পরে, কি চেয়েছি তোমার কাছে? কেবল আমার দাসীর বাগ্‌দত্ত বরের জন্য একটা পুলিসের চাকরীর একটু সুপারিশ; আর আমার চুলবাঁধুনীর বোনের যাতে আইনপরিষদের এক সভ্যের কিনেমেটোগ্রাফে চাক্‌রী হয়, তার জন্য একটুখানি সুপারিশ। আমার পদমর্য্যাদার কখন অপব্যবহার করেছি,

সে কথা বল্‌তে পারবে না। আমার জায়গায় আর কেউ হলে একবার দেখতে কি করত। তোমার সহযোগী রুইথ গোমেথের ঘরে ত একজন আছে, সে তার স্বামীকে না ব্রেক-ফাষ্ট, না ডিনার, কোনটাই শান্তিতে খেতে দেয় না...এবং স্বামী যদি তার প্রার্থনা মঞ্জুর না করেন ত সে এ মন্ত্রীর কাছে সে মন্ত্রীর কাছে চেয়ে চেয়ে বেড়াবে।

মানু—এ মন্ত্রী সে মন্ত্রী যদি না থাক্‌ত!

এমি—যার তার কাছে চাইত। তার স্বামী ত তবু মহা খুসী আছে।

মানু—মোটেই না;—কাউন্সিলে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হয়···

এমি—তাই বলে' পদত্যাগ করবার আবশ্যক হয় না। শুন্‌ছ?—ঘণ্টা বাজ্‌ছে। বন্ধুবান্ধবেরা কেউ হয়ত আস্‌ছেন তোমাকে বোঝাবার জন্য; কোন অপরিচিত লোক হয়ত খবর নিতে আস্‌ছে···

মানু—আমি কারো সঙ্গে দেখা কর্‌ব না বলে' দিয়েছি···

এমি—তোমার পদত্যাগের কারণ তাহ'লে বাস্তবিক গুরুতর?

মানু—অত্যন্ত গুরুতর।

এমি—অন্ততপক্ষে সবুর করাও চলবে না?

মানু—কি উদ্দেশ্যে? যা হবার তা হবে···আর তুমিও ত সর্ব্বদা বল যে তোমার ইচ্ছা আমি এ সব কাজের চাপ থেকে মুক্ত হই,···এ সব খেজালতের···

এমি—হাঁ সেঞোর,···হাঁ,···তা বলি বটে; তবে কথা হচ্ছে···

মানু—কথা হচ্ছে?

এমি—একবার আমার মন্ত্রীর-স্ত্রী হবার সাধ মিটুলে!···

মান্নু—যদি তুমি এত জাঁকজমক ভক্ত না হতে! তোমার কথায় মনে হয় যেন আমার মন্ত্রীপদ রাখ্‌তে হয় কেবল লোক দেখাবার জন্য,...কেবল...ওহো, এই দেখ! সেই পারীর পোষাক,... পরশু ঐটে পরে' বাহার দেখাবার সখ...

এমি—কি বল্‌ছ? আমি বড় ভুল করে ফেলেছি!

মান্নু—আর কোন সুযোগ যেন তুমি পাবে না! কোন বল্‌...

এমি—সেটা বল্‌-নাচের পোষাক নয়...ডিনারের;—সেটা এমন ধাঁচের যে ডিনার ছাড়া, এবং রাজবাড়ীর ডিনার ছাড়া, আর কোন সময়ে কাজে লাগ্‌বে না।

মান্নু—সেই সঙ্গে বল যে পার্সী যুবরাজের সম্বর্দ্ধনার ডিনার ছাড়া... সেটাও নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। জানিনে এমন কি বিশেষত্ব আছে সে পোষাকে, যে একটা বিশেষ সময় ছাড়া কাজে লাগ্‌বে না!

এমি—কি যে বল্‌ছ তার ঠিক নেই;—সেটা ঠিক অমনি ধরণের,... আর আমারও সখ ঠিক সেই সময়ে বাহার দেখান। অন্য গবরমেণ্ট ছেড়ে এই গবরমেণ্টে মন্ত্রী হ'তে তোমার এত ইচ্ছা কেন?...সেইটে বল...

মান্নু—বেশ, এইত আমি নিজের ইচ্ছায় ছাড়্‌ছি...

এমি—হার্‌নান্‌দেথ্‌কে ক্ষেপাবার জন্য,...তুমিই আমাকে এ কথা বলেছ...তাহ'লে বুঝ্‌তে পার আর কাউকে ক্ষেপাবার জন্য আমার এত আগ্রহ কেন,...আমি জানি সে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে;...তোমার সহকারী মন্ত্রীদের কা'র স্ত্রী...

মান্নু—কে বল্‌লে?

এমি—হাঁ হাঁ, আমি শুনেছি;...আমাকে বলেছে; বলেছে যে আমার অত্যন্ত বদ্‌রুচি...মন্ত্রীদলের মধ্যে কেবল আমার অল্প বয়েস ব'লে!...

মাসু—আরো বল্‌তে পার, সবচেয়ে সুন্দরী ব'লে...

এমি—ওটা অবশ্য তোমার কথা,...শুনে খুব খুসী হলেম...কিন্তু সে ত যে-কেউ হতে পারে;...কিন্তু মার্জ্জিতরুচি হওয়া—সেটা ঢের বেশি শক্ত কথা।

মাসু—তোমার মার্জ্জিত রুচিও বটে,...যেমনটি হওয়া উচিত...

এমি—তা হোক্,—কিন্তু এবার দেখ্‌বে! এক এক সময়ে আমার বেশভূষা ঠিক হয় নি তা' বুঝতে পেরেছি, বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে...কিন্তু এবারকারের পোষাক একদম সেরা ছাঁদের; এ নিয়ে কুড়িদিন ধরে দরজীর সঙ্গে রোজ আমার লেখালেখি হয়েছে,...নমুনা, নক্সা, বর্ণনাপত্র কেবল যাওয়া আসা করেছে, ...কিছুতে ঠিক কর্‌তে পারছিলুম না কি ক'রে যে মনের কল্পনাগুলোকে রূপ দিতে পারি। "আপনি স্বপ্ন দেখ্‌ছেন" —পোষাকওয়ালা আমাকে এক চিঠিতে লিখ্‌লে...

মাসু—তাই নাকি।

এমি—"সর্ব্বদা আমার কথা মনে রাখবেন,"—প্রত্যেক চিঠিতে আমি তাকে লিখ্‌তেম...

মাসু—তাহ'লে জেন যে ঐ চিঠিপত্র যার হাতে পড়বে...

এমি—সেই পোষাক তোমার জন্য পর্‌তে যাচ্ছি, বুঝ্‌লে? 'তোমার জন্য'! আমি চাই আর কেউ দেখবার আগে তুমি সেটা দেখবে, তুমি তার প্রশংসা করবে।

মান্নু—না, না..., সে সুযোগ ত হচ্ছেই...

এমি—পরশু...

মান্নু—হাঁ, রিয়াল থিয়েটারে সেদিন একটা অভিনয় আছে, সেদিন যদি পর...

এমি—রিয়াল-থিয়েটারের পক্ষে সেটা বড্ড বেশী জমকালো হবে; লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে...

মান্নু- যেন সেইটেই তোমার অভিপ্রায় নয়।

এমি—লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা? মোটেই না! সত্যিকার ষ্টাইল ত সেইখানেই...কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না, অথচ সকলের চোখেই পড়বে...

মান্নু—সেটা কিরকম দাঁড়ায় আমার কাছে পরিষ্কার হল না। যাই হোক্‌, পোষাকেরও গুপ্তরহস্য আছে বটে...

এমি—ঠিক রাজনীতির মত...আজই তার একটার পরিচয় পাওয়া যাবে...

মান্নু—একটার? কোন্‌টির?

এমি—তোমার পদত্যাগ বন্ধ করবার।

মান্নু—একটা পোষাকের জন্য? উপভোগ্য প্রস্তাব বটে!

এমি—পোষাকের জন্য না, আমার জন্য! তুমি কি মনে কর তোমার এই ত্যাগের মূল্য আমি বুঝিনে? যদিও সেটাকে প্রকৃত ত্যাগ বলা যায় না,...কিন্তু তুমিও ত তোমার বন্ধুদের মত সকলের আগে আনন্দ প্রকাশ করবে?

মান্নু—আমার বন্ধুরা করবেন নিশ্চয়..., আর আমাকে লক্ষ্য করে কি হাসিটাই হাসবেন!

এমি—যেন তাঁরা তুচ্ছতর কারণে গুরুতর কোন কাজ কোনকালে করেন নি !

মানু—পোষাক্ পরে' বাহার দেবার খেয়ালের চেয়েও বেশী তুচ্ছ কারণে ?

এমি—একগাছা ফিতে গায়ে লাগাবার বা মুখস্থকরা বক্তৃতা শুনিয়ে দেবার খেয়ালও হতে পারে। সবই অহঙ্কারের পরিতৃপ্তি...; কিন্তু তোমাদের পুরুষদের ধারণা যে তোমাদের অহঙ্কার অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের জিনিষ...আর বাস্তবিক ধর্তে গেলে পদত্যাগ করবার জন্য তোমার এত জিদের কারণ কি ?—না অহঙ্কার।

মানু—আত্মসম্মান !

এমি—অহঙ্কার ! একটা কথা যখন বলে ফেলেছ, সেটা আর না করা চলে না...; তোমার দৃঢ়তার খ্যাতি বজায় রাখ্বার অহঙ্কার। আর সেজন্য তুমি বন্ধুবান্ধবদের মুস্কিলে ফেলতে প্রস্তুত, গবরমেণ্টকে একটা দুস্তর সঙ্কটের মুখে এগিয়ে দিতে প্রস্তুত..., কোন লাভই হবে না...; সকলের ধারণা তুমি দাম্ভিক, একগুঁয়ে, কোন অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে' নিতে পার না... এ দোষ তোমার চিরকালই আছে ..; কাগজগুলো প্রত্যেক দিন তোমার সম্বন্ধে এই কথাইত বলে...

মানু—তবু সেগুলো পড়তে হবে ?

এমি—কখনো কখনো,...হাতে এসে পড়লে..., রোজ সেগুলো তোমার সম্বন্ধে লিখ্বে..."মন্ত্রীর একগুঁয়েমি..., তাঁর একবগ্গা স্বভাব...তিনি একগুঁয়েমিকে দৃঢ়তা বলিয়া ভুল

করেন"...সে কথাও কিছু মিথ্যা নয়; ঐ জন্যই ত বাড়ীতে কেউ দেখা করতে আসে না...

মাসু—এমিলিয়া! তুমি অত্যন্ত অপ্রীতিকর কথা বলতে ভালবাস।

এমি—সত্য কথা চিরদিনই অপ্রীতিকর...তুমি আমাকে আর শুনিও না যে মন্ত্রীসভার আর সকলের কথা কিছু নয়, তুমি যা বল্‌ছ তাই একেবারে বেদবাক্য...আর তা হ'লই বা...; শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের মত মেনে চলেন...তাঁরাও আরেক সময়ে তোমার কথা অনুসারে চল্‌বেন...তুমি লোক হাসাতে যাচ্ছ... তোমার পরামর্শদাতা হয়েছেন তোমার "পরমবন্ধু" পেপে..., তাই তোমার এমন দুর্দ্দশা। বেশী করে দৃঢ়তা দেখাতে গিয়ে এখনই একটা কাণ্ড বাধিয়ে ব'স, তখন যা'তে তোমার অনিষ্ট হয় সেইরূপ পরামর্শ দেবার সুযোগ হবে...পেপের মতলব তুমি মন্ত্রীপদ ছাড়; সে তোমাকে ভয়ানক হিংসে করে।

মাসু—কিন্তু পেপে কতখানি দেখেছে, আর কিই বা পরামর্শ দেবে আমাকে?...

এমি—কি বল তুমি...সে সব দেখেছে, সব জানে...যখন থেকে তোমার আফিসঘরে সে পা দিয়েছে..আমি হলেম ঐ যা' বলেছি...কুরুচিসম্পন্না...হাল-ফেশান খাবার ঘর হচ্ছে পাড়াগেঁয়ে কফিশালার মত দেখ্‌তে, আর তোমার আফিস দেখ্‌তে মুদ্দফরাসের ঘরের মত...মুদ্দফরাসের মত দেখাবার জন্য তুমি এমন দরজীর কাছেই যাও, যে পোষাক পর্য্যন্ত ঠিক করে তৈরী করতে জানে না। সেদিন রাত্রে বল্‌-নাচের নিমন্ত্রণে দূতাবাসে গেলেন; আজকাল হর্ত্তনের মত বুককাটা

জামা কেউ পরে না, সাটিনের চুড়িদার হাতা কেউ পরে না... তোমাকে দিল ঐরকম সাজিয়ে ··, তুমি যে ঐ সব সৌখীন জামা পর, ওগুলো হাস্যকর—দেখ্বে কাগজগুলো ঐ নিয়ে তোমার কেমন ব্যঙ্গচিত্র বের করে···

মানু—এমিলিয়া! এমিলিয়া! আমার সমস্ত স্নায়ু উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে, তাই কোন উত্তর দিলেম না।

এমি—তোমার রাজনৈতিক উৎপাত আমার উপর যতখানি, তার প্রতিশোধ নিতে পার্লে তবে ঠিক হ'ত। তোমার রাজনীতি চর্চ্চার দরুণ—আমার লাভের মধ্যে যত ক্ষতি ও অসুবিধা হয়েছে...তোমার জন্য আমার পরম বন্ধুদের সঙ্গেও বিচ্ছেদ হয়েছে,...আর এমন বিস্তর লোকের সঙ্গে আলাপ কর্তে হয়েছে যাদের দু'চক্ষে দেখতে পারি নে,...যারা কোনরকমে সম্মানের যোগ্য নয়, যারা আলাপের অযোগ্য। প্রত্যেক বিষয়েই এইরকম,...আগাগোড়া ত্যাগস্বীকার...গেল গরমের সময় তুমি মাদ্রিদে একা পড়ে থাক্‌বে বলে হাওয়া বদ্‌লানো হ'ল না, কারণ তোমার পরম সোহাগের কর্ত্তেস্* ছেড়ে যাবার উপায় ছিল না,...এবার বড়দিনের সময় তোমার নানা প্রিয় প্ল্যানের পাল্লায় পড়ে মাকে দেখতে যাওয়া হল না। আর একবার একজনের যাতে একটু সন্তোষ হয়, একটা খেয়াল একজনের হয়েছে ব'লে,...সেটা যেন একটা অপরাধ,···তার জন্য কিনা সে হল কুটচক্রিনী; সে ভয়ানক কি একটা দাবী

* কর্ত্তেস্—Sp. Cortes = আইন সভা।

করছে, একজনের রাষ্ট্রীয় জীবন, একজনের আত্মসম্মান নষ্ট করে দিচ্ছে, ..আরো কত শুনব! তোমার কেবল বলা বাকী রইল যে, রুইথ্ গোমেথ তার স্বামীকে যেমন করেছে, আমিও তেমনি তোমাকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছি;...সেটুকু বাকী থাকে কেন...বল, আমাকে ও কথাও বল...বলে ফেল...

মানু—এমিলিয়া! এমিলিয়া!...

এমি—না, এবার আমিই বলব যে তুমি ইস্তফা দাও...আজই এই মুহূর্ত্তে! কিন্তু ফের আমার কাছে রাজনীতি বা মন্ত্রীর দপ্তরের কথা তুলতে পাবে না...এখান থেকে উঠে ছোট এমন কোন পল্লীতে গিয়ে আমরা বাস করব, যেখানে অন্ততঃ শান্তি মিল্‌বে ...ঐ জিনিষটাই আমি চিরকাল চেয়েছি,...ছোট্ট বাড়ীটি হবে, দু' চারটে মুরগী পায়রা থাক্‌বে,...আর, আর...এইরকমের নরক নয়, এ সব দলাদলি নয়...তোমাকে এ অবস্থায় দেখ্‌বার চাইতে...তোমার আর সকলের উপরে বিরক্তির শোধ আমার উপর দিয়ে তোলবার আগে...

মানু—এ যে বিরুদ্ধপক্ষের কুড়িটা বক্তৃতার চেয়েও সাংঘাতিক... আমি এই চল্‌লেম কংগ্রেসে,...সেনেটে,...এ ছাড়া আর সবই সহ্য করতে পারব...আমার ওভারকোট, টুপি...

এমি—তাহলে ইস্তফা দেবে না?

মানু—না, ইস্তফা দেব না...মন্ত্রীসভায় না থাক্‌লে আর কোন্ ছুতায় অত সময় বাইরে থাক্‌ব...কে আর এক বছরের মধ্যে তোমাকে ঘাঁটাতে যায়! ভোজে যেও, পোষাকের বাহার

দেখিও। এ ধরণের সমস্যার মীমাংসা পেটিকোটের দ্বারা হওয়া এই প্রথম নয়···খুশী হয়েছ?

এমি—হয়েছি, কিন্তু রাগ ক'রো না...যখন পোষাকটা দেখ্‌বে, সব বুঝ্‌বে তখন!

মান্নু—তা বুঝব, কিন্তু কাল থেকে তোমার সমাজসমাচার ছাড়া আর কিছু পড়া চল্‌বে না, কারণ খবরের কাগজগুলো আমার সম্বন্ধে যা বল্‌তে সুরু করবে!

এমি—বিরুদ্ধ দলের কাগজ। তুমি ইস্তফা দিলে মন্ত্রীপক্ষের কাগজও সেইরকম বল্‌ত···ওগুলো ত ঐ বলার উপরেই আছে!

মান্নু—এর পরেও মেয়েরা আবার চায় যে তাদের ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হোক্, যেন তারা সমস্ত দুনিয়াই শাসন করে না!

এমি—আমি ছাড়া! আমি ও সব চাই না···এ বিষয়ে প্রস্তাব উঠ্‌লে তুমি তার বিপক্ষে ভোট দিতে পার।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

সাধুমা'র কথা

———:*:———

[সৌভাগ্যক্রমে এবং ঘটনাচক্রে একটি আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হয়েছে, যার লেখিকা অতীতে ছিলেন বিশিষ্ট বংশের কন্যা ও বধূ, এবং বর্ত্তমানে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসিনী। আধুনিক অর্থে শিক্ষিতা মহিলা না হলেও, নারীসুলভ সরল রেখাপাতে ও গল্পচ্ছলে নিজের জীবনীসহ সেকালের সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ঘরের এমন উজ্জ্বল চিত্র তিনি এঁকেছেন যে, আমাদের পক্ষে তা' যেমন হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, অপর পাঠকের পক্ষেও তাই হবে মনে করে', যথাসম্ভব সংকোচনপূর্ব্বক এই বিস্তৃত আত্মকাহিনী খণ্ডে খণ্ডে সবুজপত্রে প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেছি। স, স]

আমার মাতাঠাকুরাণী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন, তাঁর ধৈর্য্য ও দয়ার বিষয় লেখা আমার ন্যায় অক্ষমা কন্যার অসাধ্য। তবে নারায়ণের কৃপায় যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখব। আমার মা'র প্রথমে একটি কন্যা হয়। সেটি জন্মগ্রহণ করে' মাত্র ১৩ দিন জীবিত ছিল। পরে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম হয়, তাঁর জন্ম হবার পর আমার পিতামহী বড় বেশীরকম আনন্দিত হন। তাঁর জন্ম উপলক্ষ্যে এক মাস নহবৎ বসে, আর দরিদ্রদের অন্নবস্ত্র দান করা হয়। পরে ঐ পৌত্রটীর জন্য একটী ধাত্রী নিযুক্ত করেন। ত্রিতলের উপর সদা সর্ব্বদা রেখে তাঁকে পালন করা হয়। এমন কি, আমার মায়েরও কোলে করবার পর্য্যন্ত সাধ্য ছিল না। অবশ্য পাঠকপাঠিকারা বল্‌তে পারেন যে, সে বিষয় আমি কিরূপে জানলুম? আমার মা'র মুখে

সকলই গল্প শুনেছি, সেজন্য লিখছি। যতটুকু সুখ পেলে মানুষ মনে করে অপরিসীম, তা তিনি পেয়েছিলেন। আবার দুঃখও যাকে বলে অপর্য্যাপ্ত, তাও শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। এ দুটীর কোনটীতেই মাতাঠাকুরাণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। তাঁর সুখের কথার কিছু গল্প শুনেছি। তাঁর পিতা সেকালের হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তাঁর পসার বিলক্ষণ ছিল। উপার্জ্জনও বিস্তর করেন; কিন্তু সঞ্চয়ী ছিলেন না। সমস্তই পরিবারবর্গের ও নিজের ভোজন ও সুখবিলাসে ব্যয় করেন। আমার মাকে অতি সুখে ও যত্নে লালনপালন করেন। মাতাঠাকুরাণীর সাত বছর বয়সে বিবাহের সম্বন্ধ হয়। পানপত্রও খুব সমারোহের সহিত হয়। আর সেইদিন অবধি নিত্যই দুই পক্ষ হতে নানারকম বস্ত্র, অলঙ্কার, বিলাসের বস্তু আর নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রীর আদানপ্রদান চলে। পরে দশ বছর বয়সে সমারোহের সহিত বিবাহউৎসব সম্পন্ন হয়। নববধূও খুব আদরের সহিত দিন যাপন করেন। কিন্তু এ সুখ অতি অল্পদিনই রইল। পরে বারো বছর বয়সেই তাঁর প্রথমা কন্যা হল, পরে আবার তেরো বছর বয়সে একটী পুত্র হয়। পুত্রটী হবার পর হতেই তাঁর মনোকষ্ট আরম্ভ হয়, কারণ আমার পিতামহীর মেজাজ নতুন ধরণের ছিল। তিনি ঐ ছেলেটীকে মা'র কোলে আদবে দিতেন না। এর কারণ আর কিছু নয়, সুধু কর্ম্মফল,—সুখের সংসারে দুঃখ—হরিষে বিষাদ। পিতামহীর মনে এই ভাব যে, এ ছেলে দাই রেখে আমি পালন করব; ও মা'র কাছে গেলে আমার প্রতি বেশী ভালবাসা হবে না; এ ছেলে আমাকে মা বলে ডাকবে। ফলে হ'লও তাই, কিন্তু মার প্রাণ সর্ব্বদাই একবার কোলে

নেবার জন্য উৎসুক হত। আমার ঠাকুরমা যেদিন বড় বো'নের বাড়ী বেড়াতে যেতেন, মা যেন সেদিন একটু আনন্দ পেতেন। ঘরে বস্ত্র অলঙ্কার খাদ্যাখাদ্যের, কোন বিলাসের দ্রব্যের কিছুই অভাব ছিল না। তবে সর্ব্বদা ঘরে রুদ্ধ অবস্থায় থাকাই তাঁর ব্যবস্থা ছিল। আর তার উপর প্রথম কন্যাটী হয়ে মরে' যাওয়ার পরে ছেলেটি হ'ল, তাকে নিয়ে যে একটু আনন্দ করবেন, কি একটু কোলে নেবেন, তাঁর অদৃষ্টে সেটিও ঘটেনি। ঠাকুরমার অনুপস্থিত হওয়া শুনেই মা অমনি আমার দাদাকে একবার ডেকে কোলে নিতেন। একদিন এইরকমে তাঁর স্তনপান করাবার সাধ হয়। সেদিন একেবারে তুমুল কাণ্ড হয়। পুরানো ঝি মা'র কাছে চুপি চুপি মন রক্ষা করে' ডেকে এনে "খোকাকে নাও বৌঠাকরুণ" বলে দেয়। আবার ঠাকুরমা সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আস্‌তেই পুরানো ঝি সংবাদ দাখিল করেছেন—মা, আজ বৌঠাকরুণ খোকাকে দুধ খাইয়েছেন। আমার পিতামহী স্বর্গগতা দেবী। আমার তাঁর নিন্দা করা যদিও অন্যায় হয়, এটি যদিও মনে আছে, কিন্তু লিখতে গেলে সত্যই লেখা উচিত। তিনি কিছু খোসামোদপ্রিয় লোক ছিলেন, লাগানো কথাটা খুব শুন্‌তেন। তিনি যদিও বিদ্যাবতী ও গুণবতী ছিলেন। এমন কি, আমার পিতামহ যখন বায়ুরোগে পীড়িত ছিলেন, তখন তিনি নিজে জমিদারী সংক্রান্ত কাজ পর্য্যন্ত দেখতেন। কিন্তু ঐদিন ঐ কারণে আমার মা'র বিস্তর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। ছেলে কোলে নেওয়া সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। ঝি'র প্রতি কড়া হুকুম জারি হয়—খবরদার আর কখনও খোকা দোতলায় না যায়, ও ছেলেকে মেরে ফেল্‌বে। এখনকার বৌঝিরা কেমন গানবাজনা করে, স্বচ্ছন্দে সুখে বেড়ায়;

কিন্তু আমার মা ঘরের বারাণ্ডায় বেরতে পারেন নি, মনের কষ্টেই দিন গত হয়েছে। যদি কোনদিন ঠাকুরমা কোথায়ও বেড়াতে যেতেন, তবে একবার উঠান দেখবার সাধ হত, বেরিয়ে দেখতেন, ও মনে কত আনন্দ হত। তবু রাস্তা কি গাড়ীঘোড়া দেখবার সম্পর্কও ছিল না। এ উঠানে কি আছে? আছে একটী বোজানো পাতকুয়া, আর একটী জলযুক্ত কুয়া। বৃহৎ উঠান, তিনদিকে রোয়াক, আর একদিকে চৌতলা-সমান প্রাচীর। এই দৃশ্য দেখতে মা'র বাসনা হত। আমার এ গল্প শুনে বড় আক্ষেপ হয়। পরে আরও শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, একদিন ঠাকুরমা তাঁর মাসীর বাড়ী গেলেন, মা অমনি উঠান দেখতে বেরিয়েছেন। একটী দাসীর মেয়ে ছিল, তার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন; একটু পরে উঠে আবার কুয়া ও উঠান দেখছেন। এমন সময় আমার ঠাকুরমা এসে পড়েছেন। তখন যদি দাঁড়িয়ে ঘরে যান, তাহলে নীচে থেকে দেখা যায়। অগত্যা কি করেন, ঝুপ্ করে বসে পড়ে, অমনি শুয়ে পড়ে গড়াতে গড়াতে ঘরে যান। এইরূপ নানাপ্রকার মানসিক কষ্টে কাল যাপন করেন। পরে আমার জন্ম হয়, ও খুব আনন্দোৎসব হয়। ঠাকুরমা খুব ভালও বাসতেন, তবে দাদার মত নয়। সেজন্য আমার পালনভার মায়ের উপরেই ছিল। আমার কাছে একটী চাকর ও একটী ঝি ছিল, আর ঠাকুরমার ও ঠাকুরদাদার দৃষ্টি অষ্টপ্রহর ছিল।

আমার পিতামহী ত্রিতলের উপর শুতেন। যখন আমার পিতামহের খাওয়া হয়ে যেত, পরে তিনিও আহার করে উপরে যেতেন। দোতলার ঘরে ঝি চাবি বন্ধ করে, আমার পিতামাতার সংবাদ এনে দিত। পরে ঠাকুরের প্রসাদী বেলফুলের গড়ে, মিঠা পানের দোনা,

রূপার জপের মালা, গামছা, জলের রূপার ঘটি, আর একজন লণ্ঠন নিত। এই সকল অনুষ্ঠান সমাপন করে, পরে তেতলায় উঠ্‌তেন। আমরা ঠাকুরমাকে দিদিমা বলে ডাক্‌তুম, ঠাকুরদাদাকে কর্ত্তামণি বলে ডাক্‌তুম, এখন হতে সেই নামেই অভিহিত করব।

ভোরবেলা আমি ভূমিষ্ঠ হই। খুব আনন্দ হতে লাগ্‌ল। বাজনায় বাড়ী ভরে উঠ্‌ল। ছেলের কোলে মেয়ে হলুম কিনা। আর লোকে বলে যে, আমার নাকি একটু রূপলাবণ্যও হয়েছিল। আমাদের এক কবিরাজ মহাশয় ছিলেন। তিনি রোজ প্রাতঃকালে ও বৈকালে তুইবার সব বাড়ী একবার একবার ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন, কে কেমন আছে। বাবুরা ও মায়েরা সুধু প্রণাম নিয়েই ক্ষান্ত হতেন, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলি ও দাসদাসী সকলেই—কেউ কবিরাজদাদা ও ছেলে বলে আবদার করত আর হাত দেখাত। আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন ছ'বছরের, আমি কবিরাজ ছেলেকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির করে' তুলতুম। আর মিছে করে বলতুম—ছেলে, আজ আমার বড় গায়ে ব্যথা। মাথা ধরেছে বল্‌লেই বলতেন—হাত দেখি, হুঁ, নাড়ি চঞ্চল, আজ আর ভাত নয়। আমরা তখন হাস্‌তে লাগলুম। আমি ও আমার দাদা দুজনেই কবিরাজ ছেলেকে নিয়ে এইরূপ আনন্দ করতুম। কিন্তু ছেলে এত ভালমানুষ ছিলেন যে, এতে কোনদিন তাঁর একটু রাগ বা বিরক্তির ভাব দেখতে পাইনি। তিনি থাক্‌তেন আর খেতেন আমাদের বাড়ীর আর এক অংশে, আমার পিতার ছোটকাকিমার কাছে, আমার ছোটদিদিমার বাড়ীতে। বাড়ীটি প্রকাণ্ড সাতমহল ছিল। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, বৃহৎ পরিবার হলেই ক্রমে ক্রমে খুঁটিনাটি

সামান্য কারণে পৃথক হয়ে পড়ে। এঁরাও এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হন। আমার পিতামহরা তিন ভাই ছিলেন। আমার কর্তামণি মেজ ছিলেন। এঁরা দুজনে সম্মুখের অংশ আধা আধি পান। পশ্চাৎ ভাগটা ছোটদাদামহাশয়ের ভাগে পড়ে। কিছু লম্বা অধিক ছিল। ঐখানে ঢোলের মহল নামে একটা মহল—তাতে ঐ কবিরাজ মহাশয়ের বাসা ছিল। কবিরাজ মহাশয় সব বাড়ী ঘুরে শেষে বাসায় যেয়ে ছোটমার সঙ্গে দেখা করে, একটু তত্ত্বাবধান করে, পরে এ-বাড়ী ও-বাড়ীর খবরাখবর দিতেন ও গল্পগুজব করতেন। ছোটদিদিমার কথা যখন পেড়েছি, তখন যতটুকু সংক্ষেপে পারা যায় তাঁর দোষগুণ কিছু বলা চাই। তিনি বড়ই চতুরা ছিলেন, এবং একটু বেশীরকম স্পষ্টবক্তা ছিলেন। এজন্য তাঁর সঙ্গে প্রায় সকল লোকের বনিবনাও হত না। আমার দিদিমার কাছে যা শুনেছি তাই লিখছি। এতে গুরুজনের নিন্দাজনিত পাপ আপনারা মাপ করবেন। তাঁর জন্যেই বিবাদবিসম্বাদ বাধে, ও বাড়ীটিতে রাতারাতি বিস্তর রাজ লেগে প্রাচীর উঠে যায়। এমন কঠিন পণ যে রাত্রি প্রভাত হলে কেউ আর কারোর মুখদর্শন করব না। এই সকল ভাব বহুদিন স্থায়ী হয়। তবে প্রথম প্রথম ঝি পাঠানো ও খবর নেওয়াটা ছিল। সেজন্য আমার জন্মাবার পরেই ছোটদিদিমা তাঁর একটা পুরানো ঝিকে পাঠান। সে দেখে গিয়ে কি বলে, ভগবান জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যেমন কবিরাজ ছেলে বলেছেন—ছোটমা, আজ মেজমার ওখানে বাবুর একটা চমৎকার খুকি হয়েছে, যেমন রং তেমনি একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আর বাটাপানা মুখ, ঠিক চাঁদের মত মেয়েটা। এ সকল অসহ্য কথা ছোটদিদিমার সহ্য করা

সুকঠিন হয়। তিনি একটু আওয়াজটা উচ্চে চড়িয়ে বল্লেন—হ্যাঁ, এই যে স্বর্ণ দেখে এসে বল্‌লে যে সর্পমাথা কোটরচোখী পেঁচামুখীর মত এক কন্যা হয়েছে, শুনেছি বাছা শুনেছি। এখন পাঠক পাঠিকারা শুনুন, এটা অসামান্য রূপের বর্ণনা বটে। দুটোর মধ্যে যেটা হয় বিশ্বাস করুন, তবে যদি আমার উপর বিচারের ভার পড়ে, তাহলে তা'তে দর্পণের আবশ্যক। তাতে আমি দেখেছি আমি কিছুই নয়,—সুরূপা নয় আর কুরূপা নয়, একটা মানবী মূর্ত্তি এই পর্য্যন্ত।

তবে শুনুন। আমার মা আমায় পেয়ে বড়ই খুসি হন। একেত প্রথম কন্যাটি মারা যায়, আবার ছেলেটীকে নিয়েও আনন্দ কর্‌তে পান নি। সেজন্য আমার দিনের মধ্যে চারপ্রকার সাজ বদল হত। আর দিদিমাও খুব ভালবাস্‌তেন। তিনি আপন হাতে রোজ রূপটান্ মাখাতেন, এটি একটা আগেকার প্রথা ছিল। তাঁরা বল্‌তেন যে এতে শরীর পোষ্টাই আর সুশ্রী হয়। এর অনেক তদ্বির ছিল, ও অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করা হত। বাদাম, পেস্তা, পোস্ত, জাফরাণ, মোমদিস্তা, দুধ, সর, কুসমফুল—এই সকল জিনিষ মোলায়েম করে বেঁটে, দুধ ও ময়দা দিয়ে গোলা হ'ত। তাই মাখানো হত, তার উপর বেসন, তারপর উত্তম সাবান মাখানো হত। এতে আমার শরীরটী খুব ভাল ছিল, তবে ক্রমে ক্রমে অতিশয় স্থূল হল, তা'তে তখনকার দিনে নিন্দনীয় ছিল না, বরং আনন্দই ছিল। তার উপর আবার রংটি সাদার উপর গোলাপী ছিল, সকলের মনোরঞ্জন করেছিল। আবার নাকটা টিকলো ছিল, চোখ দুটি মাঝামাঝি ছিল। ভুরু জোড়াটিত আমার দর্পণে অতি কদর্য্য ঠেকে, কিন্তু সে আমলে আমার

জন্ম হয়, তখন এর বড় বেশী সুখ্যাতি ছিল। ঠোঁট দুটো অবশ্য পাত্‌লাই ছিল, এজন্য আর মুখটা বড় খারাপ দেখায় নি। কিন্তু আমার যখন জ্ঞান হল সুরূপ ও কুরূপ বিচার করবার, তখন দেখতুম যে আমি একটা মানুষ—এই পর্যান্ত। তবে আমার একটা শোভা ছিল কিনা বটে—চাঁচর কেশ। আমাদের মেয়েমহলে বলে কেশেই বেশ। এটা আমার প্রচুর পরিমাণে ছিল। যাই হোক, এর বর্ণনা কিছু বিস্তর হয়ে পড়ল। মোটের উপর পাঠিকাগণ এই বুঝবেন যে, সে আমলে আমার রূপের খুব নাম ছিল। আমার কর্ত্তামণিও এই রূপে ভুলেছিলেন। তিন মাস বয়স থেকেই ছবি তোলা আরম্ভ হয়। আমাকে তিন মাস থেকেই ইডেন পার্কের হাওয়া খাওয়া অভ্যাস করানো হয়। আমাদের একটী দাদা ছিলেন, তিনি আমাদের খাজাঞ্চি ছিলেন। তিনি আমাদের বড় ভালবাসতেন। আর আমরাও তাঁকে খুব ভালবাসতুম ও আদর করতুম। তিনি আমাকে কোলে নিয়ে গাড়ীতে বস্‌তেন। আর গরম জলে বসানো থাকৃত দুধের বোতল, সঙ্গে সুজ্‌নী ও অয়েলক্লথ্ থাকৃত। এত হাঙ্গামা করেও আমায় হাওয়া খাওয়ানো চাই। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমার আদর দিন দিন বৃদ্ধি হতে থাকে। আমার যেটুকু লেখা সাঙ্গ হয়ে গেল, এটুকু এই রূপেই আমার শোনা কথা। এইবার আমার পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এখন থেকে যতটুকু মনে পড়ে সেটুকু লিখ্‌ব।

আমার কর্ত্তামণির তিনটি ঘোড়া ও দুখানি গাড়ী ছিল। সকাল ৪টায় আমার বাবা ও আমি গাড়ী চড়ে মাঠে যেতুম। মা নিজে স্পিরিট ল্যাম্পে চা তৈরী করে দিতেন। আমি ও বাবা দুজনে চা পান করে, গরম কাপড় প'রে, জুতো মোজা ও টুপি এঁটে বেড়াতে

বেরতুম। তখন আকাশে তারা থাকৃত। যখন মাঠে পৌঁছতুম, তখন বেশ ফরসা হয়ে যেত। ছুটাছুটী ও খেলা খুব হত। দু' চার জন ইংরেজ বালিকার সঙ্গেও ভাব হয়েছিল। এইরূপ বেলা আটটা পর্যান্ত খেলা করে কোনদিন একেবারে বাড়ী আসা হত, আবার কোনদিন উইলসেন হোটেলে গিয়ে চা, বিস্কুট, কেক্‌ খাওয়া হত, আর মনের মতন খেলনাও কেনা হ'ত। পরে বাড়ী এসে কাপড় ছেড়ে একটু দৌড়াদৌড়ি হত। দাদাকে গল্প বলা হত, তাঁকে খেল্‌না দেখানো হত। তা ছাড়া বল্‌তুম—আমি ভাই এই দেখলুম, ঐ দেখলুম; এটা কিনেছি, কেক্‌ কিনেছি। হয়ত কোনদিন দাদার জন্যে লুকিয়ে রুমালে কেক্‌ বেঁধে এনেছি। দাদাকে দিতুম। লজেঞ্জুস্‌ ও চকোলেট্‌ প্রায়ই আন্‌তুম। কেক্‌ রোজ আনতুম না, কারণ আমার দাদা পেটরোগা ছিলেন। তাঁর আহারাদির একটু বিশেষ বাঁধাবাঁধি ছিল, কেক্‌ খাওয়া দিদিমা শুন্‌লে বক্‌বেন। কিন্তু আমার ঠিক তার উল্টো। বল্‌লে আপনাদের অবিশ্বাস হবে যে, এত করে খাওয়া বোধহয় এত অল্প বয়সে কেউ খায় না। তা ছাড়া এ বয়সে আমি চঞ্চলাও খুব বেশী ছিলাম; কেউ কোন বিষয় নিষেধও করত না—এইটী আশ্চর্য্যের বিষয়। বেড়িয়ে এসেই কাপড়গুলি গয়ারাম চাকর ছাড়িয়ে দিলে। ঝিকে আমি বড়ই ভালবাসতুম, কারণ সে ছেলেবেলা থেকেই আমার লালনপালনের ভার নিয়েছিল। সে আমার ইজারটী বদ্‌লে সাদা ইজার ও গাউন পরিয়ে দিলে। তখন আর আমায় পায় কে?—আমি কাপড় ছেড়েই, দাদার সঙ্গে একটু দুষ্টামি করে, ছুটলুম অমনি পাশের বাড়ী। সেখানে আমার জ্যেঠামহাশয়ের এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। আমার দুই জ্যেঠাইমা ছিলেন—বড়মা ও মেজমা।

এঁরা আমায় ঠিক মাতৃস্নেহ দিতেন। আমার বড়মা খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল ঠিক কাঁচা সোনার বর্ণ, আর সৌন্দর্য্যে ঠিক দেবীপ্রতিমার মত ছিলেন। অল্পবয়সেই তিনি বিধবা হন। তিনি পূজা অর্চ্চনা নিয়েই বহু সময় অতিবাহিত করতেন। এঁর কাছে আমরা আব্দার বা খেলা করবার বড় ফুরসুত পেতাম না। বৈকালে একটু বসবার ঘরে বসতেন। কিন্তু আমার রোজ বেড়াতে যাওয়া ছিল ব'লে তাঁর কাছে বসা বা খেলা হয়ে উঠত না। তবে কোনদিন যদি বেশী বাদল হত, তাহলে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হত। সেদিন বড়মার কাছে শুয়ে শুয়ে গল্প শুনতুম। হয়ত তাসখেলা দেখতুম, নাহয় রামায়ণ শুনতুম। আর একটু একটু মুখস্থ করতুম—যোগসিদ্ধ মহা-তেজা, জনক নামেতে রাজা, আমি সীতা তাহার নন্দিনী। দশরথসুত রাম, নবদুর্ব্বাদল শ্যাম, বিবাহ করেন পণে জিনি। শুভ বিবাহের পর, গেলাম শ্বশুর ঘর, কতমত করিলাম সুখ, শ্বশুরের স্নেহ যত, শাশুড়ী-গণের তত, নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক। হরষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা, আদেশিল দিতে ছত্রদণ্ড। কুব্জি দিল কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা, মোরে বিধি কৈল লণ্ডভণ্ড। আমি কন্যা পৃথিবীর, স্বামী মোর রঘুবীর, মোরে বন্দী কৈল নিশাচর। সুন্দরাকাণ্ডের গীত, কৃত্তিবাস বিরচিত, সুললিত গীত মনোহর॥ এটুকু আমার প্রথম মুখস্থ বিদ্যার নমুনা।

আমার মেজমা ঠিক তাঁর দু'টী মেয়েকে যেমন ভালবাসতেন ও আদর করতেন—আমাকে তেমনি করতেন; বরং আমি তাঁর কাছে বেশী আব্দার করতুম। দুষ্টামীর জন্য মা'র কাছে ধমক খেতুম কখনো কখনো। সেজন্য তত আব্দার জানাতে সাহস হত না। মেজমার কৈ

মাছে বড় ডিম বেরলে, আমি যদি তখন ও-বাড়ীতে থাক্‌তুম তাহলে সেটা আমার মুখে না দিয়ে তিনি কখনো বড়দিদি কি ছোটদিদিকে দেন নি। আমসত্ত্ব দিয়ে কলা ক্ষীর ভাত কি পরমান্ন মাখ্‌লে আমরা বসে খেতুম। আমরা সবাই মিলে খুব দৌড়াদৌড়ি ও লুকোচুরি খেল্‌তুম। এমন কি, এক এক দিন আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছে হত না। জোর ক'রে চাকর এসে ধরে নিয়ে যেত।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে।

(সিংহল থেকে নেপাল)

(১)

কলম্বো থেকে শান্তিনিকেতন।

[অনেকের বোধহয় মনে আছে যে, বছর পাঁচেক আগে বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত, সংস্কৃতজ্ঞ এবং পুরাতত্ত্ববিৎ আচার্য্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি সস্ত্রীক বাঙ্গলা দেশে এসেছিলেন, এবং নেপালে গিয়েছিলেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অমায়িক ব্যবহারে বাঙ্গালী বন্ধুগণ যেমন আকৃষ্ট, তাঁর পত্নীর সৌজন্য ও সহৃদয়তায় মেয়েরাও তেমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আমাদের সঙ্গে মাত্র দু'দিনের পরিচয়েই তিনি যেন আপনার লোক হয়ে উঠেছিলেন, এবং সুদূর স্বদেশে ফিরে গিয়েও যে এই "ক্ষণিকের অতিথি" আমাদের ভোলেন নি, তার প্রমাণ তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত উল্লিখিত পুস্তকপ্রেরণে ও পুস্তকান্তর্গত বর্ণনেও পাওয়া যায়। সেই অনাড়ম্বর স্বল্পভাষী প্রৌঢ়া রমণীর মধ্যে যে এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লুকানো ছিল, তা' এই পুস্তকপাঠ ভিন্ন আমাদের জানবার উপায় ছিল না। হাল্কা হাতের দু'চার টানে তিনি এই নব নব দৃশ্যঘটনা-বহুল বিদেশভ্রমণের যে জীবন্ত ছবি এঁকেছেন, তা' অনুবাদের মলিন দর্পণে প্রতিফলিত খণ্ডিতাকারেও পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হবে বলে' আমাদের বিশ্বাস। যাঁরা এ দেশের নিছক প্রশংসা শোনবার আশা করবেন, তাঁরা হতাশ হবেন তা আগেই ব'লে রাখছি। কিন্তু পরের চোখে নিজেদের কেমন দেখায় জানবার জন্য যাঁদের কৌতুহল আছে, তাঁরা এই বিদেশিনীর দৈনিক লিপি থেকে অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারবেন এই ভরসায়, লেখিকার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই আমি তাঁর ভ্রমণকাহিনীর কিয়দংশ অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলেম। শুনতে পাই তিনি বাড়ীতে যে চিঠি লিখতেন, এই বইখানি তারই সংগ্রহ।

শ্রী ইন্দিরা দেবী।]

সিংহল।—বন্দরে লাগবার হৈচৈয়ের মধ্যে, মঙ্গলবার ১লা নবেম্বর ১৯২১, ১১টার সময় আমরা জাহাজ থেকে নাবলুম। সিংহলী সুন্দরীর প্রথম নমুনা;—দু'টি মেয়ের পরণে একইরকম ছোট সাদা কুর্ত্তা, গায়ে বেশ চোস্ত বসা, কোমরে বেশ কসে' আঁটা, কুনুই পর্য্যন্ত আস্তিন, লম্বা সায়া; একটু নড়লে চড়লেই বেশের দুই অংশের মধ্যে শরীর দেখা যায়। পুরুষেরা সামাজিক অবস্থা অনুসারে কমবেশী কাপড় পরে; রিক্‌শ বা পুস্‌পুস্‌টানা কুলিদের পরণে এক জাঙ্গিয়া মাত্র, কিন্তু প্রায় সকলেরই একটি করে' ছাতা আছে। আমাদের সভ্যতা যা' কিছু বিস্তার করেছে, এমন কি তামাক এবং মদের চেয়েও, এই জিনিষটিরই আদর বেশি হয়েছে বলে' বোধ হয়। এটি সবরকম কায়দায়, এমন কি পিঠে ঝুলিয়েও লোকে নিয়ে বেড়ায়।

রাস্তায় ছোট ছেলেদের চোখের বাহারে বড় সুন্দর দেখায়; তাদের খালি গা, কখনো কখনো কোমরে একটা ছোট ঘুন্‌সি বাঁধা; কখনো কখনো এই ঘুন্‌সিতে ঝোলানো একটি হর্ত্তনাকার রূপালী পদক আমাদের আদিম পিতার আঙুরপাতার স্থান অধিকার করে।

* * * * *

আমরা এখানকার একটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক—র সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি কেঁচে স্বদেশী পোষাক ধরেছেন, আগাগোড়া সাদারঙের নরম কাশীরেশমের কাপড়, খালি পায়ে চাপ্‌লি জুতা। তাঁর স্ত্রী এলেন, সাদার উপর গোলাপীরঙের এক ইংরাজ রমণী, পরণে ফল্‌সাইরঙের সুন্দর সাড়ী; অবশ্য ইংরাজসমাজ এঁদের প্রতি বিমুখ।

এঁদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে, বারান্দার সিঁড়ির গোড়ায় এসে আমার যেন চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল. আমি থমকে দাঁড়ালুম; ফলের মত রাঙা রাস্তা, নানাপ্রকার সুগন্ধী গাছ, মাটিতে ঝরে'-পড়া ফুলের আস্তর, যেন মশলা-দেওয়া এই সকল তীব্র সৌরভ,—বোধহয় কল্পনার চোখে অমরাবতী দেখতে গেলে এইরকমই দেখে থাকি। সূর্য্য যে আকাশে অস্ত যাচ্ছে, সে আকাশ যেন নাটকের রঙ্গমঞ্চ, সেখানে ভয়াবহ মেঘ দ্রুতবেগে চলাফেরা করছে, তাদের রঙে চোখ ঝল্‌সে যায়,—এমন সময় হঠাৎ সন্ধ্যার ছায়া নামল। মস্ত মস্ত কাকের ঝাঁক এক এক জায়গায় জড় হচ্ছে, বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে, আকাশ অন্ধকার করে' ফেল্‌ছে।

বুধবার, ২রা—আজ সকালে আমরা কলম্বো থেকে ক্যাণ্ডি যাবার প্রচলিত পথে যাত্রা করলাম। এ রাস্তা বিখ্যাত ও বহুবার বর্ণিত :—গ্রাম, থরকাটা ধানের ক্ষেত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের বন, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের সেই ফুলের সৌন্দর্য্য যা'তে মনকে কিছু অভিভূত করে' ফেলে। এক জায়গায় করাতের কারখানায় একটা হাতী কাঠের বোঝা তুলছে; আর কিছুদূরে এক নালায় একটি ছোট্ট কুমীর অঙ্গভঙ্গী করছেন।

* * * * *

বৃহস্পতিবার, ৩রা— শ্রীযুক্ত ক—দের সঙ্গে শেষ বিদায় নিয়ে, ও কিছু সওদা করে' আমরা ভারতবর্ষে যাবার গাড়িতে উঠলুম। কারণ সিংহল ভারতবর্ষ নয়,—এ কথা আমার সঙ্গী [illegible] আমাকে বল্লেন।

আর সে কথাটাও ঠিক। কেননা জলপ্রণালীটুকু পার হয়েই চোখে পড়ল—লম্বাচওড়া কোঁচানো কাপড়, হাতের কব্জায়, উপর হাতে, পায়ের গোছে ও নাকে গয়না, অলঙ্কাররাশি ধারণের জন্য কানের উপর নীচে চারিদিকে বিঁধনো। আমাদের ফ্যাকাসে রঙে যে সোনার জেল্লা খোলে না, এই সব শ্যামলা রঙের উপর সেই সোনা তার স্বাভাবিক তেজ ধারণ করে ও নিজ ভাস্বর দীপ্তিতে পূর্ণমাত্রায় শোভা পায়। ছোট মেয়েরা স্বভাবের সরল বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মাথায় ফুল গোঁজা, ছোট্ট খোঁপার চারদিকে ফুলের মালা জড়ানো। এ দেশ সুন্দর চোখের দেশ, এত বেশি বড় চোখ যেন সমস্ত মুখটাকে গিলে খায়। এ দেশের পেটগুলিও বিলক্ষণ বড়; হতভাগা ছোঁড়াগুল কি খায় তা' মহাদেবই জানেন!

আমরা ঠিক করেছিলুম দক্ষিণের মন্দিরগুলি দেখে যাব, তা' যতই সময় লাগুক; কিন্তু আমার সঙ্গী কাজ আরম্ভ করবার জন্য ব্যস্ত, তাই মাদুরা ছাড়া কিছু দেখা হবে না। সে এক প্রকাণ্ড সহর, সেখানে হোটেল নেই, কেবল যাত্রীদের জন্য ষ্টেশনেই কতকগুলি ঘর ঠিক করা আছে; এখানকার বাসিন্দারাই এখানে একলা রাজত্ব করে।

এক বুড়ো ব্রাহ্মণ সম্ভাবিত যাত্রীর আশায় ষ্টেশনের রোয়াকে অপেক্ষা করছিল। সে আমাদের মত সহজ শিকার পেয়েই চেপে ধরলে, আমরাও তৎক্ষণাৎ মন্দিরে চল্লুম। তার বর্ণনা কে করবে? মন্দির কি একটা?—না, মন্দিরের সার চলেছে, "গোপুরম্"গুলির উপর উচ্চ চূড়া, বোধকরি আটটি হবে; তার ভিত্তির গায়ে এমন এক আঙ্গুলপরিমাণ জায়গা নেই যা হাজার রকমে খোদিত, চিত্রিত, ভূষিত নয়; শত শত সহস্র দেবতার মূর্ত্তি। কিন্তু এগুলি ত কোন্ ছার; সেই

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য থামওয়ালা দালান দেখতে হয়। একটার মধ্যেই বোধহয় অমন হাজার থাম; দেবদেবী ও অবতারের মূর্ত্তি, দেয়ালের মাথায় হাতী, বাঁদর সাপ, মাছ ও বিশ্বের জন্তুজানোয়ারের লম্বা টানা পাড়, রূপকের ছবি প্রভৃতি অনবরত চলেছে, রাশিকৃত হয়েছে, মূর্ত্তি ও গঠনের এমন ভিড় জমিয়ে তুলেছে যে মাথা ঘুরে যায়। মাইলের পর মাইল ধরে' এইরকম জিনিষ—বিস্ময়কর, ভয়ঙ্কর, অমানুষিক, মুগ্ধকর। এই বন্যার মুখে আমাদের গরীববেচারি পাশ্চাত্য কল্পনা-শক্তি থ বনে যায়। * * * * * এও কি সম্ভব যে, এই পাগলের মত দু'হাতে করে' বিলিয়ে-দেওয়া কল্পনার ঐশ্বর্য্য আমাদের পশ্চিমের শিল্পী, আমাদের ভাস্কর, আমাদের কারিগরদের পক্ষে একেবারে গুপ্তরহস্য? আমাদের ওখানে কি এর কোন নক্সা বা নকল বা ছবি নেই? Angkor-এর পরিচয় আমরা সবেমাত্র পেতে আরম্ভ করেছি; কিন্তু কৃষ্ণ-ভারতবর্ষের মন্দির ত ভগ্নাবশেষ নয়, সেই জন্যই তার এমন প্রচণ্ড আকর্ষণ; তার অলি-গলিতে, দরদালানে সর্ব্বদাই আনা-গোনার ভিড়, গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে কিলবিল করছে। একটি দেউড়ির মধ্যে এক ছোটখাটো বাজার বসে গেছে; দোকানদাররা ভক্তদের কাছে ফুল বিক্রী করছে, যে মালা দিয়ে তারা দেবমূর্ত্তি সাজাবে, যে ভস্ম, সিঁদুর, মাখন ও তেল তাদের দেবতাকে মাখাবে, সেই সব সরবরাহ করছে। সবরকম জাতের, সবরকম শ্রেণীর পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলেমেয়ে যাচ্ছে আসছে, স্নান করছে, শুয়ে রয়েছে, বেড়াচ্ছে, পূজো করছে, গল্প করছে, খেলছে; গরু ও কুকুর যেমন রাস্তায় তেমনি এখানেও অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কড়িকাঠে ঝোলানো খাঁচায় টিয়েপাখী চেঁচামেচি করছে; হাজার হাজার পাখী বাসার দিকে

উড়ে চলেছে, কারণ সন্ধ্যা হয়ে এল। এই সব আলো, এই সব ফুল, এই সব অনাবৃত শরীর থেকে কি এক গুরুভার ঘনমধুর গন্ধ উঠে যেন গলা চেপে ধরছে।

আমাদের ব্রাহ্মণটি সবার কাছেই জাঁক করে' বলে' বেড়িয়েছেন যে এই ফরাসী ভদ্রলোকটি মস্ত বড় সংস্কৃত পণ্ডিত, তাই সর্ব্বত্রই আমরা লোকের আনুকূল্য পেয়েছি। একটা ছোট মন্দিরে—অবশ্য সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ—একটি শৈব পুরোহিত আমাদের মালা দিলেন (পঞ্চমুদ্রা, এবং ভাঙ্গানো টাকা অতি যাচ্ছেতাই!)।

* * * * * * * * * *

রবিবার ৬ই মাদ্রাজে কাটিয়ে, আমরা ৮ই সকালে কলকাতা পৌঁছতেই ঠাকুরমশায়ের ছেলে র—র সঙ্গে দেখা হল, এবং তার সঙ্গে তাঁদের সহরের মধ্যস্থিত পুরাণো বাড়ী অথবা পুরাণো প্রাসাদে গেলুম। এইবার আমরা হিন্দু জীবনস্রোতে মগ্ন হলুম।

পাশের একটি প্রাসাদে কবির দুই ভাইপো বাস করেন, অ—এবং গ—; দুজনেই বনেদী ঘরের মস্ত বড় চিত্রকর। তাঁরা এখনো সেকেলে নিয়মানুসারে একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত, অর্থাৎ একত্র থেকে একই সম্পত্তির আয় ভোগ করেন। মেয়েরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন। আমাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। দশ বারোটি সুন্দর ছেলে এক সঙ্গে খেলা করছে। আমি দেখলুম মা, মেয়ে, বউ, বছর সতেরোর একটি অপূর্ব্বসুন্দরী যুবতী, এক ঝাঁক চাকরদাসী, জন পঞ্চাশেক লোক হবে,—সে এক ছোটখাটো রাজ্যবিশেষ।

তার পরদিন আমরা শান্তিনিকেতনে পৌঁছলুম।

(ক্রমশঃ)

নবম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শ্রদ্ধায় স্মরণ।

(নোয়াখালি টাউনহলে ৺আশুতোষ চৌধুরী ও ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের স্মৃতি-সভায় পঠিত)

'Sweetness and Light'—জ্ঞান-জ্যোতি ও স্নিগ্ধতাই ম্যাথু আর্ণল্ডের মতে বৈদগ্ধ্যের গোড়াকার কথা। ম্যাথু আর্ণল্ডের সুরুচি-সম্পন্ন মন ও পরম পরিচ্ছন্ন প্রাণের কাছে জ্যোতিঃ এবং স্নিগ্ধতাই মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ কাম্য বলিয়া ঠেকিয়াছিল। এ দুটি ছাড়া জীবনে ও সমাজে আরো কিছু থাকিতে পারে। কিন্তু ম্যাথু আর্ণল্ডের finely-attuned মনের উপর তৎকালীন ইংলণ্ডের মজ্জাগত Hebraism একটা দুরন্ত আঘাতের মত বাজিয়াছিল; তাই অসম, ছন্দহীন জাতীয় জীবনের তথা ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে বৈদগ্ধ্যের শান্ত ও সুসমাহিত বাণীটি জাগাইয়া তুলিবার জন্য Oxford-এর সুকুমার শিক্ষার অগ্রদূত আর্ণল্ড Hellenism-কে বরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশেও ঠিক এইকালে এই সভ্যতা-সংঘাতের পরমুহূর্তে, তেমনি একটি ক্ষণ আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যখন অনতিপূর্ব্বের পশ্চিমী মোহ ও পরমুখাপেক্ষিতা মার খাইয়া হঠাৎ ঘরে ফিরিবার নামে একেবারে মারমুখো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দেশের আকাশ ও বাতাস যে এত ধূলি ও এত ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার একটি কারণ আমাদের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে ঢুকিয়াছে একটা Hebraic অসহিষ্ণুতা ও একটা Pharisaical fanaticism.

কিন্তু, এই ধূলি ও ধোঁয়ার মধ্যে একটি অম্লান সুপ্রভকান্তি দাঁড়াইয়াছিলেন—তিনি পরলোকগত আশুতোষ চৌধুরী। যৌবনারম্ভে যিনি 'প্রভাত-সঙ্গীত', 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' শ্রবণে বাঙ্গালার কবি-প্রতিভাকে বরণ করিয়াছিলেন; যাঁহার বিদ্যাবত্তা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিদ্যায়তনগুলির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিবে; যাঁহার শাণিত বুদ্ধি একদিন ধর্ম্মাধিকরণকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল; আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্য্যোগ-রাত্রে যিনি প্রদীপ লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; যাঁহার উচ্চারিত একটি বাণী—A subject race has no politics—অন্তত আমাদের সমস্ত নৈরাশ্যকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে; বাঙালা ভাষার ইতিহাসে যাঁহার নিজের কীর্ত্তি রহিল কিনা জানিনা, কিন্তু বাঙালা ভাষার নীরব সেবক মণ্ডলীর মধ্যে যিনি প্রথম এবং প্রধান হইয়া থাকিবেন; যিনি আর্য্য-সঙ্গীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া মুহ্যমান কলা-সরস্বতীর রুদ্ধ কণ্ঠে আজ আনন্দকাকলী জাগাইয়া তুলিয়াছেন;—বাঙালী আজ স্মরণ করিতে গেলে অনেক দিক দিয়াই তাঁহাকে স্মরণ করিবে। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম-তালিকার পিছনে যে অমলকান্তি মনটি বসিয়াছিল, তাহার খোঁজ নিলে বাঙালী তাঁহাকে চিনিবে-ও বেশী, উপকৃত-ও হইবে বেশী। পরলোকগত আশুতোষ চৌধুরীর মনটি ছিল একটি পরম স্নিগ্ধতায় স্নাত, একটি বিমল জ্যোতিতে আলোকিত। সে জ্যোতিতে জ্বালা ছিল না, সে স্নিগ্ধতায় দৌর্ব্বল্য ছিল না। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা এই বাঙালী জাতি যে যে গুণ ও বিশেষত্ব লইয়া জন্মাই বলিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য যে-কোনো জাতির সহিত একই ভূমিতে দাঁড়াইতে পারি না, অন্যান্য জাতির মত কর্কশ কঠিন

নিদারুণ ঊষরতার মধ্যে জীবনের স্রোতকে ডুবাইয়া দিই না, বাঙ্গালী জাতির মজ্জাগত সেই কারুণ্য ও কোমলতা, বুদ্ধি এবং সুরুচি, আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জীবনে যেমন বিকাশলাভ করিয়াছিল, তেমনি করিয়া আর কোনো বাঙালীর জীবনে করিয়াছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার জীবনে এবং চরিত্রে বৈদেশিক প্রভাব কতটা দাবী বসাইয়াছিল জানিনা, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় আশুতোষ চৌধুরী বাঙালার কাল্‌চারের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ,—তাঁহার সৌজন্যে, তাঁহার করুণালোকিত চরিত্রে, তাঁহার সুপ্রভ জ্ঞানদীপ্তিতে, তাঁহার অমলিন শুভ্র জীবনে, বাঙালার বাণী প্রকাশিত হইয়াছে; ঠিক যেমনি করিয়া Oxford-এর বাণী আর্ণল্ডের urbanity-তে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কথাটি মনে রাখিলেই বুঝা যাইবে যে, বিগত কয় বৎসরের তাণ্ডবতার মধ্যে আমরা কেন তাঁহার দেশ-হিতগত প্রাণের ততটা সাক্ষাৎকার লাভ করি নাই; সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝব যে, কেন এই কয় বৎসরে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে বাঙালা পুরোবর্ত্তী না হইয়া পুরোবর্ত্তী হইল গুজ্‌রাট ও অন্ধ্র। বাঙালা পুরোবর্ত্তী হয় নাই—তাই বাঙালার পৌরহিত্যের প্রয়োজন বাড়িয়াছে। আজকার দিনে এই দেশের ধূলি ও ধোঁয়াসমাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডলের অপরিচ্ছন্নতা যদি দূর করিতে হয়, তবে স্বর্গগত এই বিদগ্ধজনের সহজাত sweetness and light-এর চেয়ে বেশী প্রয়োজন আর কোনো কিছুরই নাই।

বাঙালার শ্যাম অঙ্গে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা নিত্য চলিয়াছে, এখানে উগ্রতা ও রৌদ্ররসের দাব-দাহে মানুষের বুক শুষ্ক হইয়া উঠে না, মানুষের মাথাও উষ্ণ হইয়া উঠে না। আমাদের হিন্দুস্থানের

অপরাপর প্রান্তবাসীদের চোখে বাঙালী তাই তাঁহার স্বাভাবিক করুণ কোমলতার জন্য একটু কৃপার পাত্র। কিন্তু, সুজলা বাঙালার বুকের উপরে সর্ব্বগ্রাসী পদ্মার ধ্বংসমন্ত্র নিশিদিন উচ্চারিত হয়, বাঙালার মাথার উপরে চৈত্রের খর-রৌদ্রতাপের শেষে কালবৈশাখীর মেঘ সম্ভারে ধ্বংসদেবতার ডম্বরুধ্বনি গুরুগম্ভীরে বাজিয়া উঠে। প্রলয়ের বাঁশীও বাঙালী বাজাইতে জানে, তাণ্ডবনৃত্যের নিমন্ত্রণেও বাঙালী যোগ দিতে উৎসাহী। বাঙালীর সে যজ্ঞে থাকে না নিরর্থক তিক্ততা। তিক্ততা শক্তিমানের ধর্ম্মও নয়।

এমনি শক্তির স্ফুরণ দেখিয়াছি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে ও চরিত্রে।

যাহা কিছু বিভূতিমান, গীতায় ভগবান তাহারই ভিতরে নিজেকে প্রকাশিত করিতেছেন বলিয়া বলিয়াছেন। নীটশের ভবিষ্যৎকালের স্বপ্ন অতি-মানব (Superman) যদি নিতান্তই স্বপ্ন না হয়, তবে এই বিভূতি-মানবদের মধ্যেই বোধহয় আমরা তাহার ইঙ্গিত দেখিতেছি। বর্ত্তমানকালে স্বদেশে অথবা বিদেশে যদি কেহ এই দেব-দুর্লভ পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হইবার মত ক্ষমতা ও পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকেন, তবে তিনি স্বর্গগত এই মহাত্মা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী। এই সন্ধ্যায় তাঁহার গুণাবলীর হিসাব লইতে গেলে ব্যর্থ হইতে হইবে নিঃসন্দেহ। সেই দিব্যোজ্জ্বল মনীষা, যাহার রশ্মিপাতে আলোকিত হয় নাই এমন গুপ্ত কোণটি কোথাও আর পড়িয়া নাই; সেই অলৌকিক পাণ্ডিত্য, যাহা পৃথিবীর সুধীসমাজে একটি বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছিল; সেই পরম প্রখর বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণধী, যাহা আইনের কূটজালকে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া বাহির হইয়াছে; সেই ব্রাহ্মণবৎ

জ্ঞান-পিপাসা ও অকার্পণ্যে জ্ঞানদান, যাহা দরিদ্র দেশের কাছে আজ বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; সেই ব্রাহ্মণ-সুলভ অকপট ক্ষমা ও তিতিক্ষা, স্নেহ ও করুণা, আবার সেই ব্রাহ্মণোচিত দৃঢ়তা ও দর্প, গৌরব ও গর্ব্ব ;—এইরূপ শত গুণের তালিকা লওয়া অসম্ভব।

দেহমনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'বাঙালী' ছিলেন, এবং এরূপ 'বাঙালী' আর কেহই নাই,—বাঙালীর পক্ষে এ একটা পরম গৌরবের কথা। তথাপি সেই মোটা ধুতি ও মোটা জামার নীচে যে প্রাণটা ছিল, তাহাকে শুধু বাঙালীর বলিয়া দাবী করিলে একটু বিপদ হইতে পারে। লক্ষণসেন ও সিরাজদ্দৌলার আমল হইতে আমরা বাঙালী জাতি বীরত্বের ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়াছি, স্বর্গগত এই মহামানবের জীবনের শিক্ষাটা ঠিক তাহাকে সমর্থন করিয়া চলে কিনা জানি না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে হয়ত লিটন-মুখুয্যের পত্রবিনিময়টা স্থান পাইবে, কিন্তু সে একটা নূতন অধ্যায় হবে নিঃসন্দেহ। তাহার সহিত এক সুতায় গাঁথিতে হইলে আমাদের হয় যাইতে হইবে রাজস্থানের ইতিবৃত্তের সন্ধানে, অথবা আরো দূরে বহু নিন্দিত শ্বেত-দ্বীপে ; প্রতাপ সিংহকে লিখিত পৃথ্বীরাজের পত্র অথবা লর্ড চেষ্টারফীল্ড্-কে লিখিত ডাক্তার জন্‌সনের পত্রই তাহার একমাত্র তুলনা। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মেরুদণ্ডের একটা অখ্যাতি আছে—চর্ম্মের উৎকর্ষতা দেখিলে তাহা আপনা-আপনি নুইয়া পড়ে,—কিন্তু কোনো বাঙালীই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামে এই বাঙালীর একান্ত বিশেষত্বটি আরোপ করিতে পারিবেন না। এ কথাও অবিসংবাদিত যে, আমাদের স্বদেশিকতা যখন পর্য্যন্ত খদ্দরের

সূটের 'সর্ট-কাটুটির' সন্ধান পায় নাই এবং বিলাতী-বিরোধের নামে নিত্যনূতনরকমের স্বদেশী জামার ভঙ্গীও উদ্ভাবন করিতে শিখে নাই, তখন হইতেই সেই সরকারের বেতনভূক্ মানুষটি একটি বিশেষ পরিচ্ছদকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং আজীবন তাহা ত্যাগ করেন নাই। এই সকল গোঁড়ামি আর যাঁহারই হোক, বাঙালীর পক্ষে ততটা সুলভ নয়।

সেই বিরাট মানবকে বাঙালী নামের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করা বাতুলতা। Superman যে, সে কালের ও দেশের বহু অংশেই নিরপেক্ষ। বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর জীবন ও চরিত্রের উপর সেই প্রকাণ্ড পুরুষকারের ছাপ পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু বাঙালী সেই superman-কে একান্ত বলিয়া দাবী করিতে পারে না।

আসল কথা, শক্তি যেখানে আপনার পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত লইয়া স্ফুরিত হইয়া উঠে, সেখানে সে এমনি জ্বলিয়া উঠে, শতদিক ছাইয়া শত খাণ্ডবদাহনের তেজ লইয়া। বিশ্বনিয়মের উপরে যিনি অলঙ্ঘ্য বিধান লইয়া শত সৌরমণ্ডলের গতিপ্রবাহ নিয়মিত করিতেছেন, যে জাতি তাঁহাকে 'শক্তি'রূপে কল্পনা করিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে সেই পরম সত্যটি বুঝা অসম্ভব হবে না, আশা করা যায়। "Force! force! everywhere force! and we are ourselves a force in the midst of it!"—এই না তাপস কার্লাইলের কথা? আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত Hero-দের জীবনের উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন বলিয়াই ত তিনি আপনার শ্রদ্ধার কুসুমে Hero-worship করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। শক্তির স্ফুলিঙ্গ যেখানে জ্বলিয়া উঠিবে

সেখানে মানব সাধিয়া পায়ে পড়িবে, লুটাইয়া বলিবে "নমো নমো নমঃ॥" আশুতোষের প্রদীপ্ত আকাশের নীচে যে-কোনো গ্রহ একবার ভাসিয়া আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সে প্রবলতর শক্তির টানকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া।

বর্ত্তমান সময়ে আর একজন মাত্র এমনি বিরাট মানবাত্মা আসিয়াছিলেন—তিনি রুশদেশের লেনিন্। লেনিনের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জন্মভূমি যত নিপীড়িতাই হোক্, ভারতবর্ষের মত এতটা অপরিষ্কার ছিল না। তাই তাঁর প্রতিভা সর্ব্বাংশে বিকশিত হইয়াছিল। M. Clemenceau—যিনি ফরাসী ভূমিতে Le tigre—শক্তির আধার ছিলেন বটে, কিন্তু আজ বার্দ্ধক্যে ফরাসীর সেই ব্যাঘ্র 'গলিত-নখ-দন্ত নয়নঃ'। ইংলণ্ডের আকাশে একদিন লয়েড্ জর্জ্জও এমনি দীপ্তি লইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা জানি যে Welsh Wizard-এর কণ্ঠের দীপক রাগিণী আজ থামিয়া গিয়াছে, তাঁহার যাদুদণ্ড ভগ্ন। বাঙালার আর আর সন্তানের কথা ভাবিলে যাঁহার নাম মনে পড়ে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর,—যাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা, মাতৃভাষার সেবা প্রভৃতি বহু বিষয়ের কথা ভুলিয়া গেলেও আজ ভুলিতে পারিব না সেই পাণ্ডিত্যাভিমান, যাহা একদিকে চটি ও চাদর মাত্র লইয়া একদিন বিদেশীয় সভ্যতার উদ্ধত বিদ্রূপকে উদ্ধত নীরবতায় মূক করিয়া দিয়াছিল, আর একদিকে নিখিল বঙ্গীয় অর্কফলার আস্ফালন এবং স্মৃতি ও শ্রুতির বুলি কপ্‌চানি ও শাস্ত্রিক গুণ্ডামির ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া অটল দৃঢ়তায় অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত হিন্দু বিধবার দুঃখের কপালে শান্তি-বারি বর্ষন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগের সেই পুরুষকার এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আর একবার দেখিয়াছি,—দেখিয়াছি শক্তির জয়-যাত্রা, বিদেশীয়কে বিস্মিত করিয়া, স্বদেশীয়কে সরাইয়া দিয়া! স্বদেশ-প্রেমিক, পরম হিন্দু, রক্ষণশীল স্যার আশুতোষ বাঙালীর বিধবাদের সম্পর্কে আচরণের যে উত্তরটি দিয়াছেন, বাঙালী সেটি মনে রাখিবে না, কেননা সেটি ভুলিয়া গেলেই তবে তাহার নির্জীব জীবনগতি সহজে চলিতে পারে। বাঙালার বাহিরে যে শক্তি-উপাসক সাধকের পবিত্র নাম আমাদের আজ মনে আসিতেছে, তিনি শিবাজীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ লোকমান্য তিলক। যে বিভূতি আশুতোষের মধ্যে দেখা গিয়াছে,—তাহারই কতকটা প্রকাশিত হইয়াছিল লোকমান্যের জীবনে—আজ যাঁহার নামেরই ছত্রতলে সমস্ত মহারাষ্ট্র সম্মিলিত হয়।

আজিকার দিনে মুদ্রা-যন্ত্রের searchlight এবং flashlight-এর প্রসাদে আমাদের জীবনের ক্ষুদ্রতম কোণটুকুও আর লুপ্ত রহিল না।—এবং তাহার উপর পড়িতেছে দীপ্ত আলোকের বিকৃত দীর্ঘছায়া—কাজেই এ যুগ যেদিন অতীত হইয়া যাইবে, আজকার মহামানবরা হয়ত সেদিনও আর hero-র উচ্চমঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না; কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ, hero-র জীবনের যা মূল,—একটি অনন্যসাধারণ শক্তি,—তাহা আমরা এই যুগের এই বিরাট পুরুষাকারের মধ্যেই ব্যক্ত দেখিলাম।

এই শোক-নিবিড় সন্ধ্যায় বেদনাবিধুর হৃদয়ে আমরা প্রণাম করি স্বর্গগত সেই মহাপুরুষদ্বয়কে, যাঁহাদের একজন এই ছন্নছাড়া fanatical দেশে Hellenism-এর বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন, যিনি

বাঙালীর অমলিন শুভ্র দীপটিকে বাড়াইয়া তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন,—তিনি নমস্য কেননা তিনি কমনীয়;—আর প্রণাম করি তাঁহাকে, যিনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ-তাপসের বিদ্যার স্বচ্ছ দীপটি লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন অজ্ঞান যাত্রীর জ্ঞান-বর্ত্তিকাটি জ্বালাইতে সাহায্য করিবার জন্য, যিনি বিমাতৃ-মন্দিরে জননী বঙ্গভাষার বিগ্রহ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রণম্য তিনি, কেননা তিনি শক্তিমান, বিভূতিসম্পন্ন॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শ্রীগোপালচন্দ্র হালদার।

গাছ।



গাছের পাতা।—পাতার ভিতর গাছসবুজ আছে বলেই যে তা সবুজ দেখায়, তা তোমরা জান; কিন্তু পাতা চ্যাপ্টা হওয়াতে যে গাছের কতখানি সুবিধা হয়েচে, তা বোধহয় জাননা। পাতা যদি চ্যাপ্টা না হয়ে একটা নীরেট তাল হত, তাহলে সে যতখানি জায়গা জুড়ে সূর্য্যের আলো ধরত, চ্যাপ্টা পাতাও ততখানি জায়গা জুড়ে সূর্য্যের আলো ধরে—অথচ সেই নীরেট তাল গড়তে গাছের যতখানি মালমসলা লাগ্‌ত, পাঁচশো চ্যাপ্টা পাতা গড়তেও ততখানি লাগেনা। একই খরচে এক গুণ খাবার রাঁধার চেয়ে গাছ পাঁচশো গুণ খাবার রাঁধে।

পাতার উপর-পিঠকে বলে সোজা পিঠ, আর তলার পিঠকে উল্টো পিঠ। সোজা পিঠের রং যে উল্টো পিঠের চেয়ে বেশী সবুজ, তার মানে আর কিছুই নয়,—সোজা পিঠে আলো পড়ে বেশী, কাজেই সেই পিঠেই বেশীর ভাগ গাছ সবুজ আলো ধরবার জন্য গিয়ে জড় হয়।

পদ্মপাতার কিন্তু সোজা পিঠের চেয়ে উল্টো পিঠের রংই বেশী ঘোরালো। সোজা পিঠের রং সবুজ, উল্টো পিঠের রং বেগুনী মেশানো ঘোর সবুজ। এরকম হবার মানে কি?—মানে এই যে, পদ্মপাতা দিনরাতই ঠাণ্ডা জলে ভাসে। পাছে তার গায়ের সব তাতটুকু জলের মধ্যে চলে যায়, তাই তার উল্টো পিঠের রংকে সে

যতদূর পেরেচে ঘোরালো করেছে। তোমরা সকলেই জান, সাদা কোটের চেয়ে কালো কোট বেশী গরম—কেননা ফিকে রঙের ভিতর দিয়ে যত শীগ্‌গির তাত বেরিয়ে যায়, ঘোরালো রঙের ভিতর দিয়ে তত শীগ্‌গির যায় না। পদ্মগাছ না পড়েশুনেও মানুষের মতন পণ্ডিত। তা ছাড়া সবুজের সঙ্গে ঘোর বেগুণী রঙের মিশ খাইয়ে সে আর একটা বুদ্ধির নমুনা দিয়েছে। বেগুণী রঙের একটা গুণ এই যে, সে আলোকে ভেঙ্গে তাত করে নিতে পারে। পদ্মপাতার উপর-পিঠে যতখানি আলো পড়ে, তার খানিকটা তলার পিঠে গিয়ে ঠেকতেই তাত হয়ে যায়।

একটা অশথপাতাকে যদি সূর্য্যের দিকে তুলে ধর, তাহলে দেখতে পাবে যে, তার সারা গা-টাই যেন সরু সূতোর জালে ভরা। ঐ সূতোগুলোই হচ্ছে পাতার শির ;—মাঝখানকার মোটা শিরটা বোঁটা থেকে ডগা পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে, আর তার গা দিয়ে বেরিয়েছে রাশি রাশি কুচো শির। ছিটে বেড়ার দেওয়ালের কঞ্চিগুলো যেমন মাটিগুলোকে ধরে রাখে, শিরগুলোও তেমনি পাতার অন্য জিনিষ-গুলোকে ধরে রেখেছে। তা যদি না ধরে রাখত, তাহলে একটু হাওয়াতেই পাতাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে তস্‌নস্‌ হয়ে যেত। তা'ছাড়া গাছের শিকড় দিয়ে টানা রস, যা গুঁড়ির ভিতর দিয়ে পাতায় এসে পৌঁছয়, তা ঐ শিরগুলো দিয়েই পাতাটাময় চারিয়ে যায়।

পাতার চেহারা হাজার রকমের হয়, কিন্তু বেশীরভাগ পাতারই মুখ ছুঁচলো—তার মানে ছুঁচলো পাতার মুখ দিয়ে শীগ্‌গির জল ঝরে পড়ে। পাতার উ জল দাঁড়িয়ে থাকলে পাতার অনেক ক্ষতি—কি ক্ষতি, তা পরে বুঝবে।

পাতার ছুঁচলো মুখ আবার অনেক সময় কাঁটার মত শক্ত হয়—যেমন খেজুরের। তাতে হয় এই যে পাতাখেকো জন্তুরা মুখ দিতে সাহস করে না। আবার অনেক পাতার কিনার করাতের দাঁতের মত কিরকাটা—যেমন আনারসের। এ সব পাতাও গরুছাগলদের ভয়ের জিনিষ।

রঙ্গন, জিনিয়া, গন্ধরাজের মত গোটাকয়েক গাছ ছাড়া সব গাছেরই পাতায় বোঁটা আছে। কিন্তু বোঁটা থাকবার দরকার কি?—বোঁটা থাকবার দরকার এই যে, ঝড়ঝাপটার সময় বোঁটা নুইয়েই পাতারা এপাশ ওপাশ করে। এ ছাড়া আলোর দিকে মুখ ঘোরানো, কি ঝাঁজালো রোদের সময় খাড়া নীচের দিকে ঝুলে পড়া—এ সব কাজ পাতা সহজে করতে পারত না, যদি না তার লগ্‌বগে বোঁটাটিকে এপাশ-ওপাশ কি উপরনীচে ঘোরাতে পারত। অনেক সময় এও দেখা গেছে যে, একটা আওতায়-গজানো পাতা বোঁটাকে দুমড়ে নিয়ে উল্টো দিকে গিয়ে ফলাটাকে আলোতে মেলে ধরেচে। আঁব কি অশোকের কচি পাতা বেশী রোদ সহ্য করতে পারে না বলে খাড়া নীচের দিকে ঝুলে থাকে—তখন তাদের বোঁটাগুলোও ধনুকের মত বেঁকে থাকে; কিন্তু যেই পাতাগুলো পুরুষ্ট হয়ে ওঠে, অম্‌নি তাদের বোঁটাগুলো সোজা হয়ে উঠে ফলাগুলোকে আলোর নীচে চিৎ করে ধরে।

অনেক পাতার বোঁটাই পাতার ফলাটাকে গুঁড়ির সঙ্গে আট্‌কে রাখে, কিন্তু ঘাস, বাঁশ, তাল, নারকোলের মত গোটাকয়েক গাছ আছে, যাদের বোঁটার শেষে একটা চওড়া চামড়ার মত পেটো আছে—আর সেই পেটোই পাতাকে গুঁড়ির সঙ্গে আটকে রাখে। সুপুরী গাছের পাতার সঙ্গে তার পেটোটা খসে পড়ে—যার উপর চড়ে ছেলেরা

গাড়ী গাড়ী খেলে। কিন্তু তালগাছের পাতার পেটো গুঁড়ির গায়ে এমন জড়িয়ে থাকে যে খসেনা। খেজুরগাছের গুঁড়ি অত মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না, আর তাকে অত মোটাও দেখাত না, যদি না তার পাতার পেটোগুলো তার চারদিকে ঘাঘরার মত লেগে থাকত। দুর্ব্বাঘাসের নরম খড়কে-গুঁড়িটিত পেটো না থাক্‌লে কোন্ কালে রোদে শুকিয়ে যেত। কলাগাছের পাতা পেটো দিয়ে গাছের সঙ্গে আটকানো থাকে বলেই সে তবু কিছু জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মোটা খোলা বা বাস্‌নাগুলোই হচ্ছে পেটো, আর ভিতরকার থোড়ই হচ্ছে গুঁড়ি।

অনেক পাতার গোড়ায় দুটী করে ছোট্ট পাতা দেখা যায়, যাদের সখিপাতা বলে। যে সব পাতার পেটোটা বিশেষ কাজে লাগেনা, তাদেরই পেটোটা বদ্‌লে সখিপাতা হয়ে যায়। ঐ সখিপাতা কখনো পাতাটি বড় না হতেই খসে পড়ে, কখনো বরাবর থেকে যায়।

সব পাতার সখিপাতা সমান বড় হয় না। বট, অশথের সখিপাতা এত বড় যে, হঠাৎ দেখলে সখিপাতাকেই আসল পাতা বলে মনে হয়। সখিপাতা পাতারই জুড়ীদার হয়ে গাছের খাবার রাঁধে। তাছাড়া কোলকুঁড়িকে ঢাকনী-খোসার মত ঢেকে রাখে।

তেঁতুল, নিম, গোলাপ, বাব্‌লা, বক, কৃষ্ণচূড়া, আমলকী, লজ্জাবতী, নারকোল, খেজুর, শিমুল, বেল, সজনে, ছাতিম, ঘোড়াযুগ— এই সব গাছের কুচো কুচো পাতা দেখতে এক একটা আলাদা পাতার মত হলেও, আসলে তা নয়। এক এক গোছা কুচো পাতা মিলে এক একটা গোটা পাতা। এই জন্য এরকম গোটা পাতাকে গোছা পাতা বলে। গোছা পাতার কুচো কুচো পাতাগুলো যে সরু ডালটী

থেকে বেরিয়েছে বলে মনে হয়, সেটিও আসলে ডাল নয়, গোছা পাতার বোঁটা।

তোমরা ভাবতে পার যে, কোন্‌টা গোছা পাতা আর কোন্‌টা অনেকগুলো একানে পাতা, তা চিনব কি করে। তোমরা যদি একটু ভেবে দেখ, তাহলে নিজেরাই ঠিক করতে পারবে। ধর আতা-পাতা আর গোলাপ-পাতা। এর মধ্যে কোন্‌টা গোছা পাতা আর কোন্‌টা নয়? তোমরা জান যে, গাছের ডাল দিন দিন বাড়ে, আর তার গা থেকে নতুন নতুন পাতা বেরোয়। এখন দেখ আতা-পাতা গুস্তিতে বাড়ে, কি গোলাপ-পাতা। আতা-পাতাই বাড়ে। গোলাপের যে পাঁচটী কি সাতটী কুচো পাতা একসঙ্গে ছিল, তা আর গুস্তিতে বাড়ল না। তাহলেই বুঝলে আতা-পাতার কুচো পাতাগুলো একানে পাতা, আর গোলাপের কুচো পাতাগুলো গোছা পাতা। এ ছাড়া পাতা যখন ঝরে পড়ে, তখন গোলাপের গোছাসুদ্ধ পাতাই ঝরে পড়ে, আর আতার এক একটা পাতা আলাদা আলাদা ঝরে পড়ে। ফি পাতার কোলে একটী করে কোলকুঁড়ি থাকে তা' তোমরা জান। আতা-পাতার ফি পাতাটীর গোড়ায় কোলকুঁড়ি দেখতে পাবে, গোলাপ পাতায় তা পাবে না। তারপর গোলাপের গোছাপাতাকে টেনে ছিঁড়লে তার বোঁটার সঙ্গে একটু ছালই উঠে আসবে, কিন্তু একগোছা আতার পাতাকে টেনে ছিঁড়লে তার বোঁটার মত ডালের সঙ্গে খানিকটা কাঠ পর্য্যন্ত উঠে আসবে—কেননা ডাল গুঁড়ির সঙ্গে যেমন ভাবে লেগে থাকে, বোঁটা তেমনভাবে থাকে না। কিন্তু গোছাপাতা হয় কেন? একটা পাতাই একগোছা কুচো পাতা না হয়ে একটা মস্ত বড় একানে পাতা হলে দোষ ছিল কি?

একটা কলাপাতা যখন গাছ থেকে বেরোয়, তখন একটা গোটা পাতা হয়েই বেরোয়, কিন্তু গাছের গায়ে যখন হাওয়ার ঝট্‌কা এসে লাগ্‌তে সুরু হয়, তখন গোটা পাতাটি ফালি ফালি হয়ে বোঁটাশিরের দু'পাশ থেকে ঝালরের মত ঝুলতে থাকে। এতে লাভ হয় এই যে, ঝড়ের পূরো ধাক্কাটা গাছের গায়ে লাগতে পারে না, পাতার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। গোছা পাতার আর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে পাতা উপরকার সমস্ত আলোটুকু আট্‌কে রেখে নীচের পাতাগুলোকে আওতায় ফেলে না। উপরের কুচো কুচো পাতার ফাঁক দিয়ে নীচের পাতাগুলোতে বেশ আলো লাগে।

উপরের পাতা যাতে নীচের পাতাকে না একেবারে আওতা করে, সেজন্য গাছের আর এক ফন্দীও আছে। অনেক গাছের পাতায় বড় বড় ফোকর দেখতে পাবে। ঐ ফোকরের ফাঁক দিয়ে গলে আলো নীচের পাতায় পড়ে। আমেরিকায় গরম দেশে একরকম কচুজাতের গাছ জন্মায়, যাকে সে দেশের লোকেরা বলে' 'সুখাদ্য রাক্ষস', কিন্তু আমরা বলব ফোকর-পাতা কচু—কেননা তার পাতার সারা গায়েই ফুটো।

একটা গাছের দিকে চাইলে মনে হয় তার পাতাগুলো এলো-মেলো ভাবে সাজানো—কিন্তু তা নয়। ফি পাতাটি এম্‌নি ভাবে সাজানো যাতে সে নিজে সব চেয়ে বেশী আলো পায়, অথচ অন্য পাতাকে সব চেয়ে কম আওতা করে। বট, অশথ, ছাতিমের মত কতকগুলো গাছ এমন ভাবে পাতা মেলিয়ে রাখে যে, তাদের তলায় দাঁড়ালে এক ফোঁটা রোদের মুখ দেখা যায় না—পাতাগুলো এতটুকু জায়গা নষ্ট না করে এমন গায়ে গায়ে ঘেঁসে থাকে যে, দূর থেকে

দেখ্‌লে] মনে হয় গাছটি তার ডালপালার উপর সবুজ রংয়ের তাঁবু খাটিয়ে রেখেছে।

উপরের পাতা যাতে নীচের পাতাকে না আওতা করতে পারে, সেইজন্য যে কত গাছের পাতা কতরকম কায়দায় সাজানো থাকে তার ঠিকানাই নেই। দু একটা নমুনা দিচ্চি। যে সব গাছের ফি গাঁট থেকে একটি করে পাতা বেরোয়, তাদের নীচের গাঁটের পাতাটি যদি ডানদিকে থাকে ত উপরের গাঁটের পাতাটি বাঁ দিকে থাকে— তার উপরের গাঁটের পাতাটি আবার ডানদিকে থাকবে। জবা, কাঁটাল, পেঁপের মত কতকগুলো গাছ আছে, যাদের পাতা ঘোরানো সিঁড়ির মত ঘুরে ঘুরে ওঠে। গন্ধরাজ গাছের ফি গাঁট থেকে দুটি করে পাতা বেরোয়। পাতা দুটি পাশাপাশি হলেও উল্টো দিকে মুখ করে থাকে। তুলসী, রক্তদ্রোণ, ঘলঘস গাছেরও ফি গাঁট থেকে দুটি করে পাতা বেরোয়, কিন্তু তাদের নীচের গাঁটের পাতা দুটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে থাক্‌বে। ডালিম, ছাতিমের ফি গাঁট থেকে অনেকগুলো করে পাতা বেরোয়, তাই সেগুলো ঘাগরার মত গোল হয়ে গুঁড়ির গায়ে সাজানো থাকে।

পাইন, সাইপ্রেস, জুনিপারের মত যত দেওদার জাতের গাছ আছে, তাদের নীচের পাতাগুলো হয় বড় বড় আর লম্বা বোঁটাওয়ালা; উপর পাতাগুলোর বোঁটাও ছোট, ফলাও ছোট। তাছাড়া ও সব গাছ ঠিক জাহাজের মাস্তুলের মত খাড়া উপর দিকে ওঠে, আর গুঁড়ির দুপাশ দিয়ে এক এক জোড়া করে আড়াআড়ি ডাল এক এক জোড়া ছড়ানো হাতের মত বেরোয়। কিন্তু ডালগুলোর মজা এই যে, নীচের ডালগুলোর চেয়ে উপরের ডালগুলো লম্বায় ছোট—কাজেই উপরের

ডালের পাতা নীচের ডালের পাতাকে আওতা করতে পারে না। রোদের সময় দূর হতে একটা পাইন গাছের দিকে চাইলে মনে হয় একটা ঝক্‌ঝকে সবুজ গির্জ্জে মাটি থেকে আকাশের দিকে ঠেলে উঠেচে।

পুঁই, আমরুল, কল্মীশাকের গাছ যদি সোজা সামনের দিকে বেড়ে যেত, তাহলে হয়ত সামনের পাতার ছায়া পিছনের পাতার গায়ে, পিছনের পাতার ছায়া সামনের পাতার গায়ে পড়তে পারত—তাই ঐ সব গাছ প্রায়ই সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে।

গাছ যে শুধু আলো ধরবার জন্যই তার পাতাগুলোকে কায়দা করে সাজায়, তা নয়; তার অন্য মানেও আছে। আমরা সকলে দেখেছি যে, ঝেঁকে বৃষ্টি এলেও বড় গাছতলায় দাঁড়ালে অনেকটা মাথা বাঁচানো যায়। তার মানে তার পাতাগুলো খোলার চালের খোলার মত এমন এ ওর গায়ে চাপানো যে, সব জল গড়িয়ে কিনারের পাতা দিয়ে ঝরে পড়ে। এতে করে হয় এই যে, গাছের ঠিক গোড়ায় ততটা জল পড়ে না, যত পড়ে একটু তফাতে। এই গোড়া থেকে একটু তফাতে জল পড়াই গাছের দরকার—কেননা সেই জায়গার নীচেই গাছের শিকড়ের ডগাগুলো জলের জন্য হাঁ করে বসে আছে। এই জন্যই গাছের গোড়ায় জল দিতে হলে, ঠিক গোড়ায় জল না ঢেলে একটু তফাতে ছিটিয়ে দিলেই বেশী কাজ হয়।

গাছের পাতা যে ছাতির মত গোল করে সাজানো থাকে, তার আর এক মানেও আছে। গ্রীষ্মকালের রোদে মাঠের জমি কেমন শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয় তা তোমরা দেখেছ—ঐরকম ফেটে গেলে

কি তাতে আর একটুও রস থাকে? গাছ নিজের পাতার ছায়া দিয়ে নিজের গোড়ার মাটিকে ঠাণ্ডা ও ভিজে রাখে।

আঁকড়া আর কাঁটা যে গাছের কত দরকারী জিনিষ তা তোমরা জেনেছ, কিন্তু কেবল কোলকুঁড়ি বদ্‌লেই যে আঁকড়া কাঁটা হয় তা নয়, পাতা বদ্‌লেও হয়। ফণীমন্‌সার গুঁড়ির গায়ে যে কাঁটা দেখেছ, সে তার রূপচোরা পাতা। লাউ, কুমড়ো, শঁশার আঁকড়াগুলোও যে এক একটা পাতা, তা তাদের কোলকুঁড়ি থেকেই বোঝা যায়। পাতার মত পাতার এক একটা ভাগও অনেক সময় কাঁটা কি আঁকড়া হয়ে যায়। শিয়ালকাঁটা পাতার কুচো শিরগুলোই ফলার কিনার দিয়ে কাঁটা হয়ে বেরোয়। চীনে (রেঙ্গুন) লতার পাতা ঝরে গেলে তার বোঁটাটাই কাঁটা হয়ে পড়ে, যেমন ঈশের মূলের ঐটেই হয়ে যায় আঁকড়া। কুল, বাবলা, মনসার সখিপাতা ছুটো গোড়াগুড়ি থেকেই কাঁটা হয়ে থাকে, যেমন কুমারিকার সখিপাতা ছুটো গোড়াগুড়ি থেকেই আঁকড়া হয়ে বেরোয়। উল্ট-চণ্ডাল পাতার মুখটা লম্বা হয়ে আঁকড়া হয়ে যায়—আর মটরের গোছা পাতার ডগায় যে আঁকড়া দেখতে পাও, তাও পাতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রূপচোরা পাতা যে শুধু আঁকড়া আর পাতার চেহারাই ধরে, তা নয়। দরকারমত আরো নানান্ রকমের চেহারা ধরে। পাড়া-গাঁয়ের জলা বিলে যে ঝাঁঝি দেখা যায়, তাদের মধ্যে একরকমের ঝাঁঝি আছে, যার কতকগুলো পাতা জলে ডুবে চুলের মত সরু হয়ে যায়—দেখলে ঝুপো শিকড় বলে মনে হয়। কিন্তু ঐ সরু সরু পাতা হবার মানে আছে। গাছ যে বিষ-গ্যাস বাতাস থেকে টানে, তা বাতাসে তেমন বেশীমাত্রায় নেই। কাজেই অনেক মেহনৎ করে

জোগাড় করে নিতে হয়। কিন্তু জলেও বাতাসের খানিকটা বিষ-গ্যাস মিশে আছে। এখন ওই ঝাঁঝি দেখলে যে তার তলার দিকটা যখন জলেই ডুবে থাকে, তখন জলের বিষ-গ্যাসই বা সে ছেড়ে দেবে কেন? তাহলে ত হাওয়ার পাতার মেহনৎ অনেকটা কমে যায়। কাজেই সে তার দু চারটে পাতাকে জলের তলায় চালান করে দিলে, আর যাতে একটা পাতাই অনেকখানি জল হাতড়াতে পারে, তাই তাকে দু'একশো সরু সরু চুল-পাতায় চিরে দিলে।

কলমী গাছের দু একটা পাতা যে ঢাকনীশুদ্ধ কলসীর মত হয়ে যায়, তা তোমাদের আগেই বলেছি। আলুপেঁয়াজের উপরকার খস্‌খসে খোসা যে পাতা ছাড়া কিছুই নয়, তাও তোমরা জেনেছ। পাতা বদ্‌লে যে আর দুরকমের জিনিষ হয়, তার কথা এখন বলব। গাছের ফুলও পাতা বদ্‌লে হয়। ফুলের পাপড়ীর গড়ন ও পাতার গড়ন আলাদা হয় বলে, আবার সবুজ রঙের বদলে পাপড়ীতে অন্য রং দেখা দেয় বলে ভেবোনা যে পাতা আর পাপড়ী আলাদা জিনিষ। পাতা যে কেন রঙীন পাপড়ীতে বদলায়, তা একটু পরেই বুঝবে। পাতা আর ফুল যে একই জিনিষ, তা বেশ বোঝা যায় লালপাতা আর বাগান-বিলাস গাছের দিকে চাইলে। লাল পাতার কুচি কুচি ডাঁটির মত ফুলের ঠিক তলাতেই যে দুচারটে পাতা আছে, তাদের গড়ন ঠিক পাতার মতই; দেখলেই বুঝবে ফুলের পাপড়ী নয়—কিন্তু রং হয়ে গেছে সিঁদুরের মত টক্‌টকে—ঠিক ফুলের পাপড়ীর যেমন হয়! বাগানবিলাসের ম্যাজেণ্টা রঙের পাতাগুলোও ফুলের পাপড়ী নয়—পাতাই। এই সব পাতা, পাতা আর পাপড়ীর মাঝামাঝি; এরাও

পাতা বদ্‌লে হয়। ফুলের রঙীন পাপড়ীরও যে কাজ, এদের কাজও অনেকটা তাই।

তোমরা জান মোচাই কলাগাছের ফুল, কিন্তু সমস্ত মোচাটা নয়। যা আমরা কুটে রেঁধে খাই, তাই হচ্চে কলার ফুল; আর যা মোচার খোলা বলে ফেলে দিই, তাই হচ্চে বাগানবিলাসের রঙের পাতার মত পাতা। মোচার খোলার কাজ হচ্চে কলাফুলের নরম পাপড়ীকে আগলে ঢেকে রাখা। সুপুরী নারকোলের মুচি (ফুলের ছড়া) যে কোসার মত ঠোঙায় ঢাকা থাকে, সেও রূপচোরা পাতা; তারও কাজ মোচার খোলার মত ফুলকে আগলানো। এই সব পাতা—যা না পাতা, না পাপড়ী—তাদের নাম হচ্চে ফুল-বন্ধু পাতা, বা এককথায় ফুলপাতা।

পাতা বদ্‌লে ফুল হয় বলে তোমরা যেন মনে ভেবনা যে, গুঁড়ি বদ্‌লে পাতা হয়। অনেকে কিন্তু তা ভাবে। তারা ভাবে এক তাল সোনাকে যেমন পিটে পিটে পাত তৈরী করা যায়, গাছও তেম্‌নি ডালকে চেপ্টা করে করে তৈরী করে। এটা কিন্তু একেবারেই ভুল। শিকড়, গুঁড়ি, পাতা, তিনই আলাদা আলাদা জিনিষ। শিকড় বদ্‌লে যেমন গুঁড়ি হয় না, গুঁড়ি বদলেও তেম্‌নি পাতা হয় না। একটা বীচিকে চিরে অনুবীণ দিয়ে দেখ্‌লে দেখতে পাবে, তার মধ্যে শিকড়, গুঁড়ি, পাতা তিনটা ভাগই আছে।

গুঁড়িই যে ডালপাতার ভার বয়, এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু এমন গাছও আছে, যার পাতাই সমস্ত গাছটার ভার বয়। হরিণ-শিঙে নকসাপাতার গাছ এইরকম। তার একটা পাতা ব্রাকেটের মত হয়ে সমস্ত গাছটাকে মাথায় করে রাখে। গুঁড়ির চেয়ে পাতা জোরাল হলে, কেন পাতা গুঁড়ির কাজ করবে না?

পাতার আর একটা মজার কথা বলচি। ঘলঘস গাছ আওতায় গজালে তার পাতাগুলো হয় জ্বলজ্বলে সবুজ আর লম্বা লম্বা, কিন্তু ফাঁকায় গজালে পাতাগুলো হয় ম্যাড়মেড়ে সবুজ আর ছোট ছোট। এর মানে কি ?—এর মানে এই যে, আওতার পাতা আলো পায় কম, কাজেই যা পায় তার একটুও যাতে না ফস্‌কে যায়, তার জন্য নিজেকে যতদূর লম্বা চওড়া করতে পারে করে, আর যতখানি গাছসবুজ ফলার উপর এনে জড় করতে পারে, তাতে ত্রুটী করে না। আলোর পাতা এম্‌নিই যথেষ্ট আলো পায়, কাজেই তা ছোট হলেও তেমন লোকসান নেই, তাতে গাছসবুজ কম থাকলেও লোকসান নেই। তা ছাড়া পাতার গাছসবুজের দানাগুলো খুব আলোতে নিজেদের যে কায়দায় সাজায়, অল্প আলোতে সে কায়দায় সাজায় না। সাজাবার গুণে কখনো পাতাকে বেশী সবুজ দেখায়, কখনো কম সবুজ দেখায়।

গাছের ফুল।—একটা কেয়াফুলকে নিয়ে যদি নীচমুখ করে ঝাড়া দাও, তাহলে দেখ্‌বে তার ভিতর থেকে হল্‌দে হল্‌দে গুঁড়ো পড়চে। এই গুলোই হচ্চে কেশরের রেণু। আবার একটা রজনীগন্ধা ফুলের পাপড়ীগুলো আর সূতোর মত কেশরগুলো ছিঁড়ে ফেল্‌লেই দেখতে পাবে, তার বোঁটার চাকের উপর একটা ছোট্ট কুঁজোর মত সবুজ জিনিষ। ঐ সবুজ জিনিষের পেটটা নখ দিয়ে একটু টিপলেই মাছের ডিমের মত যে ছোট ছোট দানা বেরিয়ে আসে, সেই হচ্চে গর্ভের রেণু বা গর্ভ-দানা।

এখন এই কেশরের রেণু আর গর্ভদানা, এই হচ্চে ফুলের আসল জিনিষ—কেননা এই দিয়েই গাছ বংশ বাড়ায়। কাজেই কেশর আর গর্ভ হচ্চে ফুলের আসল দরকারী ভাগ। দু চারটে পাপড়ী বদ্‌লেই

যে কেশর আর গর্ভ হয় তাতে ভুল নেই, কিন্তু পাপড়ীগুলো না লাগে গাছের নিজের কাজে—না বাড়ায় গাছের বংশ। তবে পাপড়ীগুলো হয় কেন?—হয় কেন, তা একটু পরেই বুঝবে। তবে তাদের একটা কাজ যে ফুলের গর্ভ আর কেশরকে আগলানো, তা এখানেই বলে রাখতে পারি।

ফুলের ভিতর-পাপড়ীর বাইরে গোটা তিন চার সবুজ পাপড়ী দেখা যায়, যাদের বলে বার-পাপড়ী। এই বার-পাপড়ী কুঁড়িবেলায় ফুলকে মুড়ে রাখে, যাতে ঠাণ্ডা, গরম, পোকামাকড় কিছু না ভিতরে ঢুকতে পারে। ফুল ফুটলেও বার-পাপড়ীর কাজ শেষ হয় না। বার-পাপড়ীই ফুলের ভিতর-পাপড়ীগুলোকে একসঙ্গে গেঁথে রাখে। পদ্ম কি শালুকের মত বড় ফুলের সবুজ বার-পাপড়ী বেশ স্পষ্টই দেখতে পাবে।

ফুলের তাহলে সবশুদ্ধ চারটে ভাগ দেখতে পেলে:—গর্ভ, কেশর, ভিতর-পাপড়ী, বার-পাপড়ী। এই চারটে থাকই যে সব ফুলে আছে, তা নয়। এমন ঢের ফুল আছে, যাদের একটা, কি দুটো, কি তিনটে থাকই নেই। গোলাপ ফুলে অবশ্য চারটে থাকই আছে, কিন্তু চাঁপা, শিউলি, কৃষ্ণকলি, হংসরাজ এই সব ফুলের বার-পাপড়ী নেই। পুঁই, বিটপালম, বেতোশাকের ফুলে ভিতর-পাপড়ী নেই। লাউ, শশা, কুমড়ো, তাল, নারকোল এই সব গাছের কোন ফুলটায় কেশর নেই, আর তিনটে থাকই আছে—কোন ফুলটায় গর্ভ নেই, আর তিনটে থাকই আছে। আপাং, ভেরাণ্ডা, কাঁটানটে, ঘোলমউলী, গুলমখমল, খয়েদয়ে, লাল বিছুটী, মোরগফুল প্রভৃতি গাছের ফুলে কেবল দুটো থাক আছে—কোনটাতে বার-পাপড়ী আর কেশর,

কোনটাতে বার-পাপড়ী আর গর্ভ। চুপড়ী আলু, খাম আলু, সকরকন্দ আলু আর পাটা-সেওলার ফুলেও কেবল দুটো থাক আছে,—হয় ভিতর-পাপড়ী আর কেশর, নাহয় ভিতর-পাপড়ী আর গর্ভ। ধানফুলে গর্ভ কেশর দুই-ই আছে, কিন্তু বার-পাপড়ীও নেই ভিতর-পাপড়ীও নেই। মনসা, লাল পাতা, পিপুল, পান, চৈ, রাংচিতে, নোড়, পিঠুলি, জলবিছুটি, মুক্তোঝুরি, টোকাপানা, সরল, চীর বিলাতী ঝাউ, এই সব গাছের ফুলে তিনটে থাকই নেই—কোন ফুলটায় শুধুই কেশর, কোন ফুলটায় শুধুই গর্ভ।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

সাধুমা'র কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমি দিদিমা কি কর্ত্তামণির কাছে কখনো ধমক পর্য্যন্ত শুনিনি। বাবা বড় দুষ্টামি করলে ধম্‌কাতেন। মার কাছে ৯ বছরের মধ্যে তিন চারবার মার হয়েছিল বেশ মনে আছে। আমার স্বল্প আহারের কথাটা লেখা উচিত। এটা পেটে রেখে গেলে আমার জীবনের ঘটনা লেখা অপূর্ণ থেকে যায়। এমন আশ্চর্য্য খাওয়া আমি যে কেমন করে হজম করতুম জানিনে। আমার যখন ছেলেমেয়ে হ'ল ও তাদের খাবার বন্দোবস্ত করে দিলুম, তখন আমার খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করে দেখলুম, তাদের তিন ভাগ কম। আমায় যে কেন এত খাওয়াতেন, তা এখনো আমি স্থির করতে পারিনি। তবে ভোর থেকে রাত ৯টা পর্য্যন্ত আহারের তালিকা পাঠকপাঠিকাগণ শুন্নুন।

আমার মা ভোরবেলায় আমাকে ও বাবাকে চা করে দিতেন, সে চা মনে করবেন না যে চায়ে দু' চামচ দুধ, আর বাকি চা। মা'র মনে হ'ত, সে চা খেলে আমার গরম হবে। সেজন্য এক পোয়া দুধে এক ছটাক চায়ের জল, আর তার সঙ্গে এক ছটাক মিছরির গুঁড়া, ৪ খানা বিস্কুট—এই খেয়ে মর্ণিংওয়াক করতে যাওয়া হ'ত। পরে সেখানে ছুটছুটী করে উইলসেন হোটেলে বাবা প্রায় রোজ যেতেন, আমিও যেতুম। বাবা কি খেতেন না খেতেন, আমার চঞ্চল মন সেদিকে বড় যেত না। আমার কেক্, লজেঞ্চ এই সব চলত।

গরমিকাল হলে আইস্‌ক্রিম খেতুম। আবার বাবা কোনদিন ধর্ম্মতলার বাজার থেকে বাজার করে যেতেন, ভাল ছাগমাংস, কপি, কলাইশুঁটি, কমলালেবু, আপেল আঙুর ইত্যাদি। বাড়ী গিয়ে কাপড় ছেড়েই আবার বল্কা দুধ মিছরি দিয়ে জ্বাল দেওয়া প্রায় দেড় পোয়া। তখন বেলা ৯-৩০ হবে। পরে ঠাকুরের বাল্যভোগের মাখন, মিছরি, বাসি লুচি ৪ খানা, ক্ষীরের লাড়ু ও সুপারির-পরিমাণ ৪টি; কিন্তু আমার রসনার এতেও বিশ্রাম নেই। মা'দের বাজারের গরম গরম কচুরি জিলাপি এলে, তা থেকেও দুখানা খাওয়া হয়ে গেল। পরে দিদিমার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—একবার বস্‌চি, একবার শুয়ে পড়চি। দিদিমার আমের ঝোড়া এল। তিনি একটা হাতে দিলেন। আমার স্বভাব ছিল দুধে আম পেলেই তাতে একটা ফুটো ক'রে টিপে টিপে খেয়ে বেড়ানো। আবার বাইরে গেলুম, সেখানে খাজাঞ্চি দাদা মদ্‌না আমওয়ালার কাছে খাবার আম দর করছেন। আমি যাবামাত্রই আমওয়ালা বল্‌লে—এই আমটা চেখে দেখতো মা—বলে' ধুয়ে বানিয়ে দিলে, অমনি চেখে দেখা হ'ল। আবার বাড়ীর ভিতর গেলুম, তখন স্নানের জন্য রূপটান গোলা, স্নানের সরঞ্জাম গোছানো হচ্ছে, ঝি ধরে নিলে, বিমুনি খোলা আরম্ভ করে দিলে। একরূপ জোরজবরদস্তি করে স্নানকার্য্যটা সম্পন্ন হ'ল। তখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ হয়েছে। একটু বই নিয়ে বস্‌বার বিছানায় শুয়ে পড়লুম। মা ডাক্‌তে লাগলেন—এস মাথায় তেল দিয়ে দিই। আমার কর্ত্তামণির হুকুম, নাবার পর ম্যাকেসার অয়েল মাখতে হবে। মাথা মুছে, তারপর তেল দিয়ে চুল আঁচড়ানো হল। ভাত এসে পড়ল, বাবার ও আমার। দাদা খেয়ে স্কুল

চলে গেছেন। আমি বাবার সঙ্গেই খেতুম। ভাতের সঙ্গে আমার প্রণয় খুব কম। দুটি চারটি নাড়াচাড়া করে উঠতুম। কৈ মাছের ডিমটা, কি ইলিসমাছের ভাজাটা, কিম্বা গল্‌দার মুড়াটি। আমাদের বাড়ী মাংসটা রাত্রেই হ'ত। দিনে মাছের কালিয়া, ঝোল, মাছভাজা, ঘণ্ট, এই পর্য্যন্ত; কারণ আমার দিদিমা রোজ কালীঘাটে পূজা দিতেন ও প্রসাদী কচি মাংস আনাতেন। এইজন্য রাত্রেই রান্না হত। কিন্তু এখন যেমন পিঁয়াজ না দিলে মাংস রাঁধা হয় না, আমাদের বাড়ীতে সেটি হবার জো ছিল না। পেঁয়াজ কি হাঁসের ডিম আমার বাল্যজীবনে কখনো খাওয়া হয় নি।

পরে আমাদের খাওয়া হয়ে গেল। একটু বই শ্লেট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। মনোযোগ দিয়ে যদি পড়তুম তাহলে যে কিছু শিখতে পারতুম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা যে গান কি যে শ্লোকটি শুনতুম, অমনি কণ্ঠস্থ করে ফেলতুম। কিন্তু মা সরস্বতীর দয়া বড়ই কম। সেজন্য পড়ায় মন মোটেই বসত না। খাওয়ার পর বাবা, মা, আমি ও আমার ছোট ছোট ভাইবোনগুলি সকলেই শুয়ে পড়তাম, বেহারা পাখা টান্‌তে লাগল। দরজা বন্ধ ক'রে টানা পাখার দড়িটা দরজার গায়ে একটা ছেঁদা ক'রে বার ক'রে দিয়েছে। বেহারা বাহিরে বারান্দায় বসে টান্‌ছে। মা ও বাবার যেমন একটু তন্দ্রা এসেছে, আমি অমনি উঠেছি। আমার দিনে ঘুম কখনো আসেনা। আর একটা মতলব কি মাথায় এসে জুট্‌ল, অমনি উঠ্‌লুম দৌড়ে চৌতলার ছাতে। মস্ত উঁচু কাঠের সিঁড়ি চড়বার সময় নড়ে, কিন্তু আমার ভয় ছিল না, বেশ উঠে যেতুম। আবার তেতালার ছাতে এসে, একরকম বুনো

ঘাসে হলদে হলদে ফুল হত, তাই তুলে আমার পিতলের রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর ছিলেন তাঁকে আর অন্যান্য পুতুলদের মালা গেঁথে পরাতুম। আমার ফুল নিয়ে খেলাটা বড় ভাল লাগ্ত। দিদিমার পূজার প্রচুর প্রসাদী ফুল সিঁড়ির একটা কোণে ঢালা থাক্ত।

আমি এইরকমে দুপুরবেলা ঘুরতুম। পরে দুটো বাজলে গুরুমহাশয় আমাকে পড়াতে আস্তেন। গুরুমহাশয়রা চার ভাই ছিলেন, আমাদের যত বাড়ী সব ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন। আমার গুরুমহাশয়ের বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান। তিনি বড় ভালমানুষ ছিলেন।

কিছুদিন পরে আমাব বিবাহের কথা আরম্ভ হ'ল। তখন আমার দিদিমা একদিন আমাকে বলেন যে—তুমি কেবল দুষ্টামি ও খেলা করে বেড়াও, পড়ায় মন দেওনা, পড়া না ক'রলে বর আসবে না, বল্‌বে দুষ্টু মুর্খ মেয়ে, আমরা কেউ বিয়ে ক'রবনা। সেইদিন থেকে আমার মনটা কেমন একটু পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল, মনে হ'ল আমার মা'রা সবাই পড়্তে জানেন, আমারও পড়া শেখা উচিত—শিখ্তেই হবে। আমায় যেদিন দিদিমা এই শিক্ষাটি দিয়েছেন, সেদিন আমার মনে হতে লাগ্‌ল কতক্ষণে গুরুমহাশয় আস্‌বেন? আমার এমন উৎকণ্ঠা হ'তে লাগল যেন সেইদিনই সব দ্বিতীয় ভাগটা শেষ করি। আমি বাইরে আমার পড়্‌বার আয়োজন ক'রে নিচ্ছি। মাদুর পাত্‌লুম। বই, শ্লেট, পেন্সিল, জলের বাটি, স্পঞ্জ সব ঠিক করে বসে লিখ্‌ছি, নইলে কোথায় চাকরদের বল্‌বেন, তখন চাকর খোঁজ করে ধরে আন্‌বে, মাদুর পাত্‌বে, বই শ্লেট সব দেবে, তবুও দুষ্টুমি হ'ত। আবার যেদিন ও-বাড়ীতে বড়দি ছোড়দির কাছে দুপুরবেলা যেয়ে খেলায় মেতে যেতুম, সেদিন কিছুতেই আর আস্‌বার মন হ'ত না।

কিন্তু কি জানি দিদিমা কিরকম ক'রে মানুষকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বল্‌তেন, সবাই তাঁর কথা শুন্‌তে ভালবাস্‌ত। আমার ৯ বছরে বিবাহ হয়। দিদিমা সন্ধ্যাবেলায় বেড়িয়ে আস্‌বার পর, কি তিনি খাবার পর যখন দুপুরবেলায় বিশ্রাম করতেন, তখন আমাকে ডেকে উপদেশ দিতেন। গুরুমহাশয় সেদিন আমার পড়া দেখে খুব খুসী। বল্‌লেন বাঃ! আজতো বেশ, এরকম রোজ কর না কেন, তাহলে খুব শীগ্‌গির শীগ্‌গির বই শেষ হয়।

তখনি একবাটি গরম দুধ ও তার সঙ্গে একটা মিহিদানা এসে পড়ল, একটু খুঁৎখুৎ করে সেগুলি উদরসাৎ করা হ'ল। আমার ২—৪টা পর্য্যন্ত দু'ঘণ্টার লেখাপড়া শেষ হয়ে গেল। সেদিনকার মত ছুটি। পরে আমার কর্ত্তামণি ঠিক ৪টার সময় ফল ও বড়বাজারের জলপান, ছানা, মাখন, বেদানা প্রভৃতি খেতেন। সেগুলি সাজান হ'ত, কিন্তু তিনি অতি অল্পাহারী ছিলেন। আমার উদরেই বেশী যেত। আমার দাদা যেদিন স্কুল থেকে সকাল সকাল আসতেন, সেদিন দুই জনে মিলে খাওয়া যেত। দিদিমা রোজ কর্ত্তামণির ভাত খাবার ও বিকেলে জলখাবার সময় বস্‌তেন।

আমার যে কি আনন্দময় প্রাণ, সে কথা আমার লিখে জানাবার ক্ষমতা নেই, মনে প্রাণে বেশ অনুভব কর্‌তে পারি, আর লোকের কাজগুলিও দৃষ্টি করি। দয়াময় আমার উপর বড়ই দয়া প্রকাশ করেছেন। এজন্য এ কথা লিখ্‌লাম। আমার এখন ৪৪ বছর বয়স, কিন্তু এখনও মন সদাই আনন্দে ভাসছে। আমার পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে যাবার পর আমরা মা'র সঙ্গে তাঁর পিতার বাগানবাড়ীতে গিয়ে ছ'মাস থাকি। আমরা কলকাতা থেকে যেদিন যাই, বাড়ীর গাড়ীতে

গেলুম আমরা তিন বোন, বাবা, আর কোচবাক্সে রামুদাদা, বাবার পুরাণো খানসামা। আর আমার মা গেলেন একটি ঘেরাটোপ-দেওয়া পাল্কিতে। ঝি তিনজন ও দ্বারোয়ান বোটে গেল। আমরা গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করে, কর্ত্তামণি ও দিদিমার চরণধূলি নিয়ে সিঁড়িতে নাম্‌তে যাব, অমনি কর্ত্তামণি ডাক্‌লেন, ডেকে আমায় আদর করে বুকে চেপে চক্ষের জলে স্নান করালেন। তাঁর প্রাণ এত কোমল ছিল যে, কোন কোন সামান্য কারণে চক্ষু জলে পূর্ণ হয়ে যেত, আর ছোট ছেলের মত ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদ্‌তেন। আর এখন আমি যাচ্ছি, তাতে তাঁর কাঁদ্‌বারই কথা। আমাকে আর দাদাকে প্রাণের মত দেখতেন। আমিও কেঁদে ফেল্‌লুম। এদিকে কর্ত্তামণিকে ছাড়তেও ইচ্ছা হয় না, আবার বাগানে যাবারও খুব ইচ্ছা। কি করি, তখন যাবার সব ঠিক। মা'র পাল্কি পর্য্যন্ত চলেছে। তখন নেমে গাড়ীতে উঠ্‌লুম। কর্ত্তামণি সামনের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তখনও আমায় ডেকে বল্‌ছেন—দেখ, বেশী দেরী ক'র না; ওরা না আসে, তুমি চলে এস। আমিও কর্ত্তামণিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাস্তাটা পার হয়ে গেলুম। পরে বোটে গিয়ে সেই মা গঙ্গার শোভা, পান্‌সি নৌকা ডিঙ্গী দেখে মন ভুলে গেল। মনের কথা যদি ঠিক লিখ্‌তে হয়, তবে মন পূর্ণানন্দ পাচ্ছে না। কারণ আজ দাদা, কর্ত্তামণি ও খাজাঞ্চি দাদার সঙ্গ ছেড়ে আস্‌তে হ'ল। ও-বাড়ীর দিদিদের জন্যেও মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

কিছুক্ষণ এইরকম হ'তে লাগ্‌ল, কিন্তু নতুন নতুন প্রকৃতির দৃশ্য পেতে লাগলুম; তখনি মন আনন্দে নৃত্য করে উঠ্‌ল। আর মনের যে মলিন ভাব ছিল, সেটি দূর হয়ে গেল। প্রথম দিন আমরা

বরানগরে গিয়ে পৌঁছিলুম, অল্প বেলা ছিল বলে মাঝিরা নোঙর ফেলে দিলে। রামুদাদা ও একজন মাঝি নেবে গিয়ে দুধ নিয়ে এল। এর ভেতর লুচি ভাজা ও ছোকা হল, খেতে বেশ লাগল। আবার রাত্রে দুধ ও সন্দেশ খাওয়া হ'ল। তবে সন্ধ্যার খবর আমি কিছুই জানি নে। বিশেষ সেদিন শরীরটা বড় ক্লান্ত হয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছি। পরদিন আবার ভোরে ঘুম ভাঙতেই কলের বাঁশী শুনছি। পরে মুখ ধুয়ে বসে বসে রাঁধাবাড়া, মাছ কেনা ইত্যাদি দেখ্‌ছি। পরদিন কোন্নগরে পৌঁছিলাম। আমার মাতামহ দেখতে ঠিক মহাদেবের মত ছিলেন, আর স্বভাবও ঠিক শিবের অনুরূপ ছিল। মাতামহী কিন্তু তার ঠিক বিপরীত—দেখতেও বটে, স্বভাবেও বটে। তা যাই হোক্, মাতামহী লোককে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। খাওয়ার উদ্যোগেই তিনি ব্যস্ত থাক্‌তেন, আর খাওয়ার তদ্বিরটাও ভাল-বাস্‌তেন। কিন্তু মেজাজ বড় কড়া ছিল। সত্য কথা বলতে কি, আমার সঙ্গে তাঁর বাল্যকালে বড় বনিবনাও ছিল না। অবশ্য সেদিন আমি প্রথম গিয়েছি, আমায় আদর করলেন। তাঁর যখন আমাকে আদর করবার ইচ্ছে হ'ত, তখন বলতেন আয়—নইলে কথা কইতেন না। সুধু যে তাঁর দোষ, তা নয়। আমারও বিবেচনাশক্তি ছিল না। অবশ্য এটা এতদিনে বুঝেছি। তিনি আমায় ভাল ক'রে চুল বেঁধে দিতেন; আমি ভারী চঞ্চলা মেয়ে, সব নষ্ট করে ফেলতুম। আমায় বলতেন—আমার কাছে বসে ফুলের মালা গাঁথ্‌। আমার যেদিন ইচ্ছে হ'ত গিয়ে বস্‌তুম; নাহয়ত কেবল একবার বৈঠকখানা, একবার অন্দর—এই কচ্ছি। আমার মাতামহীর কথাটি আগে এসে পড়েছে। বাগান, বাড়ী, পুকুর কি

বৈঠকখানা সম্বন্ধে কিছুই লেখা হয়নি। বাগানটী বেশ বড়। তার ভেতর তিনটে পুকুর ছিল, অন্দরে দুটো। একটা বিঘে দুই জমি নিয়ে, সেটির নাম ছিল ছোট পুকুর। সেটায় বাসন মাজা, কাপড় কাচা, মালিদের গাছে জল দেওয়া, এই সব হত। আর বকুল বলে যে পুকুরটি ছিল, সেটি বড় সুন্দর। সেটি প্রায় ৪ বিঘে জমির উপর ছিল। তার জল ছিল খুব পরিষ্কার। দু পাশে দুটি বাঁধা ঘাট, ও চারপাশে মেদির ছাঁটা বেড়া ছিল। তার পাড়গুলি ঘন জমাটবাঁধা ঘাসে ভরা, ও ঘাটের দুপাশে মস্ত মস্ত দুটো বকুল গাছ ছিল। গাছে খুব ফুল হত। ফুলগুলি খুব বড় বড় আর সাদা হত। ঘাটের সাম্নে বস্‌বার জন্য মস্ত চবুতারা ছিল। তার চারদিকে আবার বেঞ্চের মত গাঁথা ছিল, আর মধ্যে মধ্যে থাম। থামেতে সব বড় বড় পুতুল ছিল—কেউ কাপড় নিংড়ে ফেলছে, কেউ প্রার্থনা করছে, কেউবা আবার ছেলে কোলে ক'রে আদর কর্‌ছে। এদের মাঝখানে আলো দেবার এক থাম্বা ছিল। তা ছাড়া অনেক ফুলের গাছও ছিল। তবে গোলাপ যুঁই বকুল চামেলি চাঁপা,—এই সুগন্ধী ফুলের গাছ বেশির ভাগ ছিল।

এখনকার ছেলেদের পছন্দ অন্যপ্রকার। তাদের একটা গাছঘর চাইই। নানারকম পাতার গাছ কি জানি আমার মনে তত ভাল লাগে না। ফুলটায় প্রাণে বড় দেবভাব আসে। আর পরতেও বড় ভালবাসতুম। দিদিমা খুব সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি খাওয়ার পর দু এক ঘণ্টা বিশ্রাম করে, অমনি বাগানে চবুতারায় গিয়ে বস্‌তেন। তাঁর সঙ্গে অনেক লোক যেত। তাঁর মেজ ননদ ছিল, তাঁকেও আমরা মেজদিদিমা বল্‌তুম্। তাঁর একটী ছেলে ছিল, তিনি

খুব দেবভক্ত ছিলেন। মার্কণ্ড চণ্ডি অনুবাদ করেছেন, পূজাপাঠ খুব জান্‌তেন। আবার সুন্দর দুর্গামূর্ত্তি গড়েছিলেন। নিজের হাতে গড়ে দুর্গোৎসব করেন। এই মামার একটি বোন ছিলেন। তাঁর কাছে সন্ধ্যাবেলায় নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়তুম।

আমি এক কথা লিখ্‌তে লিখ্‌তে আর এক পথে এসেছি। দিদিমা ফুলের মালা গাঁথবার জন্য গিয়ে বস্‌লেন। মালী মস্ত সাজি ভরে যূঁই, বেল, বকুল এনে দিলে, দিদিমা নানারকম বাহারী করে গাঁথতে লাগলেন। দাদামহাশয়ের জন্যে ফুলনল, আমার জন্য মাথার জাল, মালা বিস্তর গাঁথ্‌তেন। আবার ঐখানে কথা শোনা হ'ত, রামায়ণ কি প্রভাসখণ্ড। কোনদিন বা কেউ গানওয়ালী এসে পড়ত, তার গান শোনা হত। তারপর দিদিমা খুব আমুদে ছিলেন, তাসখেলা চল্‌তে লাগল। দিদিমার অভ্যাস ছিল দু'বেলা সাঁতার দেওয়া। আমরা সকলে ঘাটে বসে দেখতাম। তিনি খুব মোটা ছিলেন, কিন্তু এত জোরে যেতেন যে সকলে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেত। আমার মামারাও বাইরের মস্ত পুকুরে সাঁতার দিতেন। আমার কিন্তু জলে নাব্‌তে বড় ভয় কর'ত। যত লাফাতুম ঘাটের উপর। আমার নিয়ম ছিল ভোরে উঠে বাগানে ফুল কুড়ানো। তারপর ছাতে উঠে উঠানের বেলগাছ থেকে বেল পাড়া হত। বেলগুলি চমৎকার ছিল, যেমন মিষ্টি তেমনি আবার বীচিও নেই। আকারেও বেশ বড় ছিল। আমি সেখানে যাবার পর থেকে আর কেউ বেল কুড়োতে পেত না, আমি কুড়িয়ে এনে মা কিম্বা দিদিমাকে দিতুম। তারপর দুধ খেয়ে বৈঠকখানায় বেড়াতে

যেতুম। বৈঠকখানায় যেতে হ'লে খানিকটা রাস্তা হেঁটে তবে উঠতে হত। পথে কত গরীব লোকের বাস ছিল। তারা আমাদের দেখে খুব প্রশংসা করত। আমরা তিনটী বোনেই যেতুম। আমার চেয়ে তারা আরও সুশ্রী ছিল। তাদের গঠন আমার মত এত স্থূল ছিল না; তারা আমার মত এত চঞ্চলাও ছিল না।

ভগবানের রাজ্যের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এখানে যখন যা চাই তাই পাই। জল, বায়ু, ফল, ফুল, অন্ন, বস্ত্র, আনন্দ, গীত, বাদ্য, আদর ও স্নেহ—সকলই পাই। তবে অভাব ও কষ্ট যে কি, সেটি পরম পিতা আমায় এ পর্য্যন্ত জানতে দেন নি। তবে লোকের কেন দেখি সব জিনিষেরই অপ্রতুল। কত লোকের অন্নবস্ত্রের কিছুরই অভাব নেই, অথচ একদণ্ডও মনে শান্তি বা সুখ নেই। এই বুঝি কর্ম্মফল। আমারও ঠিক এই ধারণা।

দিল্লী সহরে ফাল্গুনী।



[সম্প্রতি দিল্লী সহরে রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" অভিনীত হয়েছে। দিল্লীপ্রবাসী বাঙালীরা এ নাটিকাখানির অভিনয় করেন। দিল্লী থেকে শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় নামক জনৈক ভদ্রলোক আমাকে এই ব্যাপারের একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে সেটি সবুজ পত্রে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছেন। আমি আনন্দসহকারে সে অনুরোধ রক্ষা করছি। প্রবাসী বাঙালী-সমাজেও বাঙলা-সাহিত্যের আদর কতদূর বেড়ে গিয়েছে, এই রিপোর্টই তার প্রমাণ।

দিল্লীতেও অ-নবীনের দল এ অভিনয়ের পরিপন্থী হয়েছিলেন, কিন্তু নবীন দলেরই সেখানে জয় হয়েছে। "ফাল্গুনীর" বিরুদ্ধে প্রাচীনদের প্রধান আপত্তি এই ছিল যে, ওর মানে বোঝা যায় না। বোধহয় সেই কারণে প্রোগ্রামে শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সরকার ফাল্গুনীর মানে বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এঁদের ব্যাখ্যাগুলিও এই সঙ্গে প্রকাশ করছি। পাঠকরা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন যে, এঁদের ভিতর কেউই আমাদের মত পেশাদার সাহিত্যিক নন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সরকার ডাক্তার। অপরটির পরিচয় আমি জানিনে বলে দিতে পারলুম না।

আমি যখন বিলেতে ছিলুম, তখন একদিন লক্ষ্ণৌএর মুসলমান যুবকদের সঙ্গে দিল্লীর মুসলমান যুবকদের মহা তর্ক বাধে এই নিয়ে যে, কোন্ সহরের উর্দ্দু ভাল। সে তর্কের আমি শ্রোতা মাত্র ছিলুম। সে ক্ষেত্রে একটি কথা শুনি যা' আমার আজও মনে আছে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কোন অভিজাতবংশীয় মুসলমান যুবক বলেন যে, দিল্লীর উর্দ্দুর প্রধান গুণ এই যে, সে ভাষা "সাফ আওর চুস্ত।"

দিল্লীপ্রবাসী বাঙালীদের লেখা পড়ে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, দিল্লীর বাঙলাও "সাফ আওর চুস্ত্।"

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'Les Nouvelles Litteraires'-এর ৩রা এপ্রিলের সংখ্যায় ফাল্গুনীর একটি সমালোচনা বেরিয়েছে। সেটির বঙ্গানুবাদ আমি এই সঙ্গে প্রকাশ করছি। পাঠকরা দেখে খুসী হবেন যে, এ কাব্য সম্বন্ধে দিল্লীর সঙ্গে প্যারিসের বড় বেশি মতভেদ নেই।

শ্রীপ্রমথ নাথ চৌধুরী।]

ফাল্গুনের সংক্রান্তির দিন দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের নাট্যকলা বিভাগের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" নাট্য-কাব্য অভিনীত হয়েছে।

বাংলার বাহিরে, এমন কি বাংলাদেশেও, ফাল্গুনী কোথায়ও অভিনীত হয়েছে বলে জানা নেই। এক রবীন্দ্রনাথ নিজেই ফাল্গুনী বোলপুরে এবং কলকাতায় অভিনয় করেছিলেন। একে ত রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন লেখার যে অভিনয় হতে পারে, এ কথা সাধারণে বলে না; তার উপর ফাল্গুনী আবার সবার সেরা—রূপকের চরম। সুতরাং এঁদের এ নির্ব্বাচনে যে সাধারণে খুসী হবেন না, এবং একে সুবুদ্ধির কাজ মনে করবেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু একটা কথা বিবেচনা করতে হবে। রুচিরও ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির স্তর আছে। আমাদের দেশে এমন সময় ছিল, যখন যাত্রার দলে গোঁফ কামিয়ে স্ত্রীলোকের পাঠ অভিনয় করে লোকে বাহবা নিত। ক্রমশঃ থিয়েটারের যুগে রুচির আর একটু উন্নতি হ'ল। তখন লোকে চোখের ও কানের খোরাক ছাড়া মনের খোরাকেরও

খোঁজ করতে লাগ্‌ল। বর্ত্তমান রবীন্দ্র-সাহিত্যে আবার আত্মার খোরাকের কাজ চল্‌ছে। কিন্তু আমাদের দেশের শতকরা নিরনব্বই জন লোকের এই আত্মা প্রভৃতি বড় বড় কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসৎ নেই। লঘু সাহিত্য এখানে বেশী আদরণীয়। আজও আমাদের দেশ তলোয়ারের আস্ফালন এবং বীররসের মোহ কাটাতে পারে নি। সূক্ষ্মের চেয়ে স্থূলের প্রতিই আমাদের আকর্ষণ বেশি। তাই আমার মনে হয় দিল্লীর বর্ত্তমান নাট্য-কলাবিভাগের নেতৃবৃন্দ ফাল্গুনীর মত বই নির্ব্বাচন করে' যে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন, তা' সর্ব্বজনপ্রিয় না হলেও অনন্যসাধারণ। বাঙলার বাইরে যে বাঙ্গালীরা প্রবাসজীবন যাপন করেন, তাঁরা যে শুধু ডাক্তারী, ওকালতী, ব্যবসা ছাড়াও অন্য বিষয় চিন্তা করে থাকেন, এটা আশারই কথা বল্‌তে হবে।

কি প্রাণপাত পরিশ্রম করে যে এঁদের এটিকে সার্থক করে তুল্‌তে হয়েছিল, তার সামান্য ইতিহাস আমি জানি। দিল্লী থেকে মন্মথ বাবুকে পাঠান হ'ল বোলপুরে, গানের সুরগুলি আদায় করে আন্‌তে। রবীন্দ্রনাথের চরণোপান্তে উপস্থিত হলে তিনি সব শুনে বল্লেন, "তুই দু' দিনের মধ্যে ফাল্গুনীকে দিল্লীতে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাস?"

তিনি যে প্রবাসী বাঙালীদের কাছ থেকে এতদিন কোন সাড়াই পান নি, এটি বোধ হয় তারই আভাস। তারপর দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সুরগুলি আয়ত্ত করে তিনি ফিরে এলেন। মাঝির কুটীরের দৃশ্যে সারদা বাবু বল্লেন, কুটীরের উপর দিয়ে একটু বাঁকা ছোট একখানি ডাল থাক্‌বে। ইঞ্জিনীয়ার নৃত্যগোপাল বাবু তিন দিন মাঠে মাঠে ঘুরে ঠিক সেইরকম একটি ডাল আহরণ করলেন।

আর ফুল ঝোপঝাড় গাছপাতা ত সমস্ত দিল্লী সহর ঝেঁটিয়ে, এমন কি আম্বালা থেকেও আনা হয়েছিল। যেখানে যেটুকু হলে ideal-এর কাছাকাছি পৌঁছানো যায় বলে এঁদের মনে হয়েছে, তার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি এঁরা করেন নি। বাইরে থেকে এটুকু জেনেই এঁদের প্রেরণার প্রতি আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

অভিনয় সম্বন্ধে বলার কথা এই যে, অ্যামেচার নাট্যের যে সব সাধারণ খুঁত হয়, তা' এঁদেরও হয়েছিল। প্রত্যেক দৃশ্যের মধ্যে প্রচ্ছদপট উঠ্‌তে বড় বিলম্ব হচ্ছিল, এবং সে জন্য দর্শক-বৃন্দ অধীরও হচ্ছিলেন। কিন্তু ভিতরের লোকদের তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টার অন্ত ছিল না। প্রত্যেক দৃশ্যে সীন আগাগোড়া বদল করতে হয়েছে। সেজন্য কতকটা বিলম্ব অপরিহার্য্য। আর এগুলি details-এর খুঁত, principle-এর নয়। এঁদের সার্থকতা সেইখানে, যেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাদের কচি কচি হাত দু'খানি নেড়ে নেড়ে গেয়েছিল, "দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।" যদি সেদিন কারোর প্রাণ এই দোলায় দুলে থাকে, যদি তিনি অনুভব করে থাকেন যে বাঙলার বাইরে পাঞ্জাবের এই প্রান্তেও আজ বসন্ত নেমে এসেছে, তবে ফাল্গুনী সার্থক হয়েছে। কেবলমাত্র এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিতেই কবির প্রাণপণ চেষ্টা। তাই এদেরও ফুল লতাপাতা, পদ্ধতির পাতাগুলি পর্য্যন্ত বসন্তের রঙে মুড়ে বেরিয়েছিল। প্রথম দৃশ্যে বসন্তের আবির্ভাব খুব মনোজ্ঞ হয়েছিল। শীতের পোষাকে নিখুঁত শিল্পের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল —এটি চিত্রশিল্পী সারদাচরণ উকীলের কৃতিত্ব।

আজ বিংশ শতাব্দীর বস্তুতান্ত্রিক যুগে সহজের স্থান নেই,

আনন্দের স্থান নেই। লোকে হাতে নেড়ে, পায়ে থেঁত্‌লে অনুভব করতে চায় যে, তারা কিছু এমন পেল যা' তারা সকলের সাম্‌নে প্রমাণ করতে পারে। বস্তুর অতীত অ-বস্তুর দেশে যাঁদের দৃষ্টি চলে, যাঁরা সেই সুদূরের গান গাহেন, তাঁদের গান এখনও ভবিষ্যতের আহ্বান। তাই শান্তিনিকেতনের আম্রকাননের মধ্যে ঋষির বীণায় যে সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে, তার আহ্বানবাণী দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে—সমস্ত জগত সেই বাণীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সেই বাণীকে যাঁরা কায়মনো-বাক্যে গ্রহণ করতে চেষ্টা করছেন, তাঁরা আমাদের নমস্য।

দিল্লী,
১১ এপ্রিল, ১৯২৬।

শ্রীঅবনীনাথ রায়।

ফাল্গুনী।

(১)

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথা হচ্চে—চলা-সৃষ্টির কোন্ এক আদিযুগ হতে মানুষ চল্‌তে সুরু করেছে; চল্‌তে চল্‌তে সে জন্মাল, নাচ্‌তে নাচ্‌তে সে জীবন বয়ে চলেছে; আবার চল্‌তে চল্‌তে সে জীবনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। এই চলার বিরাম হলেই বেসুর, অসঙ্গতি, মৃত্যু।

রাজার দরবারে অনেকরকম লোকের ভিড়—কেউ রাজাকে ঠকিয়ে নিতে চায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, বৈরাগ্য-বারিধির শ্লোকের ব্যাখ্যা নিজেদের অভীষ্টপূরণের অনুকূল করে। কবি এসে রাজাকে এই অবস্থাসঙ্কট থেকে উদ্ধার করলেন। কবির সুর রাজার বুকে গিয়ে বাজে, যদিও তার অর্থ তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বল্লেন,—কবি, প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখ, এমন একটা কিছু কর যাতে মনটা বৈরাগ্য-বারিধির দিকে আর না ঝোঁকে। কবি বল্লেন,—হাঁ, আমার হাতে এমন রচনা আছে। এই রচনাটি হচ্চে ফাল্গুনী।

ফাল্গুনীর ভিতরের কথাটুকু প্রাণের কথা—জগতে নিছক বর্ত্তমান থাকার যে আনন্দ, সেইটুকুই হচ্চে এর মূল সুর। এর মধ্যে তত্ত্ব কথা কিছু নেই—কাজেই কেজো লোকদের এ কোন কাজে আসবে না।

বিষয়টা হচ্চে শীতের বস্ত্রহরণ বা বসন্ত-উৎসব। যেমন শীত এসে তার কুয়াসা দিয়ে সমস্ত প্রকৃতির নীলিমাকে ঢেকে ফেলে, তেমনি আমাদের জীবনেও বার্দ্ধক্য এসে যৌবনকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু প্রকৃতিতে শীতের পর আবার বসন্ত আসে—কুয়াসা কেটে যায়, বনস্থলী সবুজ হয়ে ওঠে, ফুল ফোটে, পাখী গান গায়। প্রকৃতির শীত ও বসন্ত আলাদা নয়—শীতই বসন্ত হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে; শীতের ভিতর দিয়ে যিনি অভিব্যক্ত, বসন্তের ভিতর দিয়েও তিনিই অভিব্যক্ত। জীবনেও সেইরূপ মানুষ যদি এই অখণ্ড মূল সুর না হারায়, তবে তার জরা ও বার্দ্ধক্য শূন্যত্ব ও স্থবিরত্বে পরিণত হয় না। সে মানুষ চুলে পাক ধরলেও ছেলেমানুষ থাকে। আর সেই মানুষই বল্‌তে পারে, 'যখন দেখছি বেঁচে আছি তখন জান্‌চি যে বাঁচবই'। এরাই 'নিজের খেয়ালে এমনি হু হু করে চলেছে যে, তাদের বয়সটা কোন্ পিছনে খসে পড়ে গেছে, হুঁস নেই'। প্রকৃতিতে ঋতু পরিবর্ত্তনের মধ্যে যেমন কোন ভেদ নেই,—গ্রীষ্মই বর্ষার ভিতর দিয়ে দেখা দিচ্চে, শরৎই হেমন্তে পরিণত হচ্চে,—তেমনি মানুষের বেলাও জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ভেদ নেই; জীবনের আগটা এবং জীবনের পরটা—সবটাই একটা বিরাট চলা দিয়ে গ্রথিত।

ফাল্গুনীর অভিযান হ'ল বুড়োকে খুঁজে বের করা। এই বুড়ো আমাদের জীবনে-মরণে কাজে-কর্ম্মে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে বলেই তাকে খুঁজে পাইনে। পেছন দিক দিয়ে যখন দেখি, তখন মনে হয় সে ভয়ঙ্কর, অন্ধকারের মত তার বুকে চোখ, সে পেছনে হেঁটে চলে। এই ভয়ঙ্করের আররণ দিয়েই সে ঢাকা। এই আবরণ যার কাছে খুলে যায় সে দেখ্‌তে পায়, সে বুড়োও নয়, ভয়ঙ্করও নয়—সে

বালক—'সে বারে বারেই প্রথম, সে ফিরে ফিরেই প্রথম'। সর্দার এই ছেলে মানুষের দলের মধ্যে সব সময়েই আছে বলে তাকে এরা দেখ্তে পায়নি। তার পরামর্শমত বুড়োকে যখন খুঁজে বের করলে তখন দেখ্লে, সে আর কেউ নয়, সে তাদেরই সর্দার। তাদের এই নিরুদ্দেশের উদ্দেশে যাত্রা, শূন্য মাঠ, মাঝি কোটালের কাছে অনুসন্ধান, মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ ও সন্দেহ, কবি তাঁর অমর ভাষায় বর্ণনা করেছেন। অন্ধ বাউল তার ভিতরকার দৃষ্টি দিয়ে পথ ঠিক দেখ্তে পায়, সে বুড়োকে চেনে, তাই তার আর ভয় নেই। চন্দ্রহাস প্রেম—সে আমাদের জীবনকে প্রিয় করে রেখেচে; সে বুড়োকে চেনেনা, তবে রহস্যটা তার জানা, তাই সে সন্দেহ করে না, আর অকুতোভয়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে। দাদা চৌপদী তৈরী করতেন—কাজের কথাই তাতে লেখা যায়, অ-কাজের কথা তাতে বাজে না। শেষে এদের যৌবনের দলের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন—তাঁর চৌপদীকে এরা বসন্তের আবীরে রাঙিয়ে দিলে।

ফাল্গুনী বিশ্ব-কবির গীতিকাব্য হতে ভাবচুরি—এ প্রকৃতির নাট্য-লীলা থেকে জীবনের নাট্য-লীলায় পটপরিবর্ত্তন। চিরকাল বিশ্বে এই লীলা চল্ছে, কিন্তু মানুষের আপাতদৃষ্টিতে এ ধরা পড়ে না। তাই এ শুধু নাটকের কথা নয়, জ্ঞানের কথা নয়—এ আধ্যাত্ম জীবনের গভীর এক অনুভূতির ইতিহাস।

এতদিন যে বসেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুণে,
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।

এই দেখা যিনি পান, যিনি প্রকৃতই দেখেন পুরাতনটাই নতুন, 'ঋতুর নাট্যে বৎসরে ২. শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়',—তিনিই ফাল্গুনী লিখতে পারেন। তাই বলি ফাল্গুনী শুধু সুন্দর নয়, ফাল্গুনী অনুপম।

শ্রীঅবনীনাথ রায়।

---

(২)

বিশ্বের চিত্তমরুকে শীতল করবার জন্য বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের হৃদয় হ'তে যে অমৃতধারা আনন্দে নৃত্য করতে করতে বেরিয়ে এসেছে, সেই মন্দাকিনী-ধারাই ফাল্গুনী।

যুগযুগান্ত হ'তে মানবহৃদয়ে অবিরত মীমাংসার চেষ্টা হয়ে আসছে—আমরা কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাচ্ছি? মৃত্যু কি? সত্য কি? পথই বা কি? অনেকে অনেক মীমাংসা অনেকরকমে ক'রেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সত্য কি, এবং কি উপায়ে সত্যের উপলব্ধি হয়, তা' এই ফাল্গুনীতে প্রকাশ ক'রেছেন। শুধু আজ ফাল্গুনীতে কেন, বহুপূর্ব্ব হ'তে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমুদ্রে অনেক স্থানে এই জন্মমৃত্যুর মীমাংসা পাওয়া যায়। ফাল্গুনী তার সমষ্টি।

সত্য কি?—"আমরাই চিরকালের", "আমরাই বারেবারে", "আমরাই ফিরে ফিরে", "আমরা আছি", "আমরাই সত্য"। আমরা অনাদি থেকে অনন্তে চলেছি, "চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে"—আমাদের এই চলাটাই সত্য। আমাদের এই চলার পথে কত

গগনতলে জীবনপ্রদীপ জ্বলে ওঠে, আবার নিভে যায়; ঋতুর পর ঋতু বরণ-ডালা নিয়ে এগিয়ে আসে, চলে যায়; মৃত্যুর পর মৃত্যুকে চরণ-ঘায়ে মেরে পার হ'য়ে আমরা চলেছি। অনন্তের যাত্রী আমরা—"আমরা ঠেকব না তো কোন শেষে, ফুরয় না পথ কোন দেশে রে", "মোদের মিলবে না কূল গো, মোদের মিলবে না কূল"। এই চলাটাই আমাদের খেলা, এই চলাটাই আনন্দ, আনন্দই সত্য—"খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নেই"। এই খেলা, এই আনন্দের লীলা বিচিত্র হ'য়ে ফুটে উঠছে বিশ্বে—"খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল", আবার "খেলার আগুন যখন লাগে, ভাঙ্গাচোরা জ্বলে যে হয় ছাই"।

সত্য উপলব্ধির উপায় কি?—"প্রাণের সদররাস্তায় বেরিয়ে পড়্", "থলি থালি আঁকড়ে বসে থাকিস্ নে"। প্রাণের রাস্তায়, প্রেমের পথে, আনন্দের পথে, বেরিয়ে পড়্। যেদিন বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধি হবে, সেইদিন দেখতে পাবে আমরাই সেই আনন্দময় তিনি—যাকে আমরা যুগযুগান্ত থেকে জানবার জন্য চেষ্টা ক'রে আসছি। "আমরাই বারেবারে, আমরাই ফিরে ফিরে," আমরা অনন্তে চলেছি। সেই অনন্ত চলার লীলাতেই তার ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন অবস্থা ফুটে উঠেছে। এই রহস্যভেদ করবার জন্য কবি প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বসন্তের স্পর্শে শীতবুড়োর ছদ্মবেশ যেমন খসে যায়—দেখি শীতই বসন্ত,—প্রেমের স্পর্শে, আনন্দের আলোয় তেমনি দেখতে পাওয়া যায় আমরাই সেই নিত্য তিনি। আপাততঃ যাকে একদিক থেকে দেখা যায় হারানো, তাকেই অপরদিক থেকে দেখা যায় পাওয়া।

পাওয়ার আরম্ভেই হারানো উপস্থিত হয়, আবার সেই হারানোর শেষেই পাওয়ার পরিপূর্ণতা। পুরাতনকে হারানো, আর নূতনকে পাওয়া, দুইই এক—চলার লীলা। "তোমায় নূতন করেই পাব বলে হারাই ক্ষণেক্ষণ, দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন"।

সূচনা—যুগে যুগে মানবহৃদয়কে মৃত্যু সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত করেছে। রাজার চুলে পাক ধরেছে, অতএব তাঁর মন খারাপ হ'য়েছে, মৃত্যুর দ্বার সম্মুখে মনে ক'রে তাঁর আর কিছুই ভাল লাগছে না; রাজকর্ম্ম, আমোদ-আহ্লাদ সব "চুপ"। প্রকৃতির উদ্যানে বসন্তের অভাবে যেমন সব চুপ্‌চাপ্, তেমনি রাজার হৃদয় উদ্যানে আনন্দ অভাবে সব চুপ্‌চাপ্। মন্ত্রী আর শত চেষ্টাতেও রাজার মনকে রাজকর্ম্মে টেনে রাখতে পারছেন না। শীতের শুকনো পাতার মত রাজার মনও শুকিয়ে মড়মড়ে হ'য়ে গিয়েছে; ঝরা পাতায় যেমন রং ধরে, তেমনি রাজার মনেও গেরুয়া রং ধরেছে। তিনি এখন চান একমাত্র শ্রুতিভূষণকে, আর তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি। যাজক ব্রাহ্মণ শ্রুতিভূষণ বৈরাগ্যের দোহাই দিয়ে নিজের স্বার্থের থলিটি পূর্ণ ক'রে, শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা ধরিয়ে রাজাকে বৈরাগ্যের পথ দেখিয়ে বিদায় নিলেন। শ্রুতিভূষণের মন্ত্র—পাবার আশা রেখে ত্যাগ করা; আসক্তিপূর্ণ, নিরাসক্ত নয়। ফাগুনের চঞ্চল হাওয়ার মত সভাকবি কবিশেখর এসে রাজার দুর্ব্বল মনের বৈরাগ্যের ভূষণটি ফাগ মাখিয়ে রঙ্গীন ক'রে দিলেন। শীতে মৃতবৎ গাছপালা ফাগুন হাওয়ায় যেমন নবপল্লবিত হয়, তেমনি শ্রুতিভূষণের বিদায়ের পরই কবিশেখর এসে রাজার মৃতবৎ অন্তঃকরণ নবপল্লবিত ক'রে বল্লেন, "মহারাজ! সাদা চুল, তা ভাবছেন কেন? সাদাই তো সকল

রঙ্গের বাসা, যারা ভোগবতী পার হ'য়ে এসেছে, তারাই আনন্দ-লোকের ডাঙ্গা দেখতে পেয়েছে, তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়; এখনই তো আপনার আনন্দের সময়। ঘরের কোণে বৈরাগ্য আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে না, উঠতে হবে, চলতে হবে, আনন্দের সদররাস্তায় নৃত্য করতে করতে বেরিয়ে পড়ুন"। নদী আনন্দে তার নিরাসক্ত প্রেম বিশ্বে ঢেলে দিতে দিতেই সেই অনন্ত সমুদ্রে মিশে যায়, "তখন তার দেওয়া যেমন ঘোচে, তার পাওয়াও তেমনি ঘোচে"। কবির অমৃতবাণী রাজার প্রাণে গিয়ে বাজল। মানবহৃদয়ে তত্ত্বকথা বা বৈরাগ্যের কথা বড় সহজে বাজে না, কিন্তু প্রেমের কথা, আনন্দের কথা বড় সহজেই প্রাণে বাজে। তখন কবি রাজাকে আবার বল্লেন "আমরা বাঁচবই"। জীবনটাকে যে অমর মৃত্যুর ছদ্মবেশ পরিয়ে বারেবারে নবীন ক'রে নিতে হয়। এই আশ্বাসবাণী পেয়ে নিজের প্রাণের মাঝে ভাবের ঘরে একটু চুরি ক'রে রাজা কবিকে বল্লেন, "যদি বাঁচবই, তবে বাঁচার মত ক'রে বাঁচতে হবে—কি বল"? তখন আবার মন্ত্রীর ডাক পড়ল, রাজকর্ম্মে মন হ'ল, নিরন্নদের অন্নের ব্যবস্থা হ'ল, ইত্যাদি। কবি রাজার ফসলক্ষেত্রে জল দিয়ে সজীব ক'রে তুল্লেন। দুর্ব্বল মনে প্রেমের, আনন্দের আভাষ এলেই সঙ্গে সঙ্গে তর্কযুক্তি এসে বিশ্বাসের মূলে ঘা দেয়। শ্রুতিভূষণ আবার আসছেন, রাজার কাছে খবর এল, রাজা ভীষণ ভাবনায় পড়লেন, তাঁর "দুর্ব্বল মন, তিনি সামলাতে পারবেন না এবং অন্যমনস্ক হ'লেই বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে পড়বেন"; তাই শ্রুতিভূষণ যাতে আর সভায় না আসেন, মন্ত্রীকে মানা ক'রে দিলেন। তিনি কবিকে বল্লেন, "ওহে কবি! তোমার হাতে কোন নাটক, কিম্বা কিছু তৈরি

আছে? শীঘ্র অভিনয় লাগিয়ে দাও, আমার প্রাণটাকে কেবল আনন্দে মাতিয়ে রাখ"। যুক্তিতর্ক ও জ্ঞানের নিষ্পেষণে পীড়িত মানবহৃদয়ের একটা সকরুণ আহ্বান রবীন্দ্রনাথের কাণে এসে পৌঁছল, "আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও"। কবিশেখর বিশ্বপুরাণ থেকে নিয়ে নিত্য আনন্দের মহালীলা নাট্যে দেখালেন, যার ভিতর দিয়ে তিনি সত্য ও সত্যপথ নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন।

গানের কথা—ফাল্গুনী কাব্যনাট্য। এর দুটি অংশ—একটি "গানের" অপরটি "প্রাণের"। প্রথমটিতে আছে প্রকৃতির কথা, দ্বিতীয়টিতে আছে মানুষের।

"গানের কথা" আর "প্রাণের কথা" দুটিই বিশ্ববীণার একতারায় বাঁধা একই সুরে যুগে যুগে বেজে আসছে, কবি বাউল কাল গুণে ফাল্গুনে শুনতে পেয়েই পাশাপাশি এদের রেখে গূঢ় রহস্য ভেদ করেছেন। সমস্ত লীলাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিতটি যুগ-যুগান্তর ধরে নিত্যনবভাবে ফুটে উঠেছে, সেইটিই হচ্ছে ফাল্গুনীর ভিতরকার কথা। "গানের কথার" মর্ম্ম হ'চ্ছে "শীতের বস্ত্রহরণ"। ফাগুনের কাননে কবি বেরিয়ে পড়ে দেখলেন, চিরনবীন বসন্ত এসে গাছ, লতা, পাতা, পশু, পক্ষী সমস্ত জীবের প্রাণকে জাগাচ্ছে। বেণুবনের দখিণ হাওয়ার দোদুল সুরু হ'ল—ব্যাকুলা পারুল, আমের মুকুল, চামেলি, মল্লিকা, করবী, শিমুলের পাতায় পাতায় আনন্দ ফুটে উঠ্‌ল। হারানো বধূটিকে নব সাজে আবার পেয়ে তারাও নবরঙ্গে রঞ্জিত হ'য়ে বরণডালা দিয়ে তাকে বরণ করতে এল। পাখীর নীড়ের দুঃখের আঁধারের ভিতর দিয়ে আনন্দের আলো ভরে উঠ্‌ল, তার প্রাণে শিহরণ সুরু হ'ল, সেও আনন্দে সুরের আবীর বসন্তের

গায়ে ছড়িয়ে দিলে। সমস্ত জলস্থল ভুবনব্যাপী নবীনের জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল।

কাব্যকাননের প্রজাপতি রবীন্দ্রনাথ তরুলতার ভাষা, জলস্থলের ভাষা জানেন, তাই বেণুবন থেকে, ফুলন্ত গাছ থেকে, পাখীর নীড় থেকে যে অনাহত বীণার সুরটি বেজে উঠ্‌ছিল, সেটা তিনি বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছেন।

পুরাতনের ভিতর দিয়ে হারিয়ে নূতনকে নূতন করে পেয়ে তাদের মধ্যে আনন্দের লীলা আরম্ভ হ'ল। তারা দেখলে, বসন্তেই শীতের পরিণতি। যে বসন্ত বারে বারে বিদায় নিয়ে যায়, সেই আবার নূতন হ'য়ে ফিরে আসে। বসন্ত চিরকালের, চিরনবীন, চিরনূতন, তার বিদায় হ'চ্ছে তার ছদ্মবেশ। শীতেবসন্তে পরিচয় হবামাত্র পরস্পর দেখতে পায় তারা এক আত্মা। শীত বুড়োটাই হ'ল নবীন বসন্ত। এই "গানের কথাই" "প্রাণের কথার" চাবি।

প্রাণের কথা—এর চারিটি অংশ—প্রথম সূত্রপাত, দ্বিতীয় সন্ধান, তৃতীয় সন্দেহ, চতুর্থ প্রকাশ। এই চারিটি অংশের ভিতর দিয়ে বিশ্বকবি সত্যের প্রকাশ করেছেন।

আমরা নবীন—"আমাদের পাকবে না চুল গো—আমাদের ঝরবে না ফুল গো"। আমরা চিরকাল নবীনই থাক্‌ব, বুড়ো হব না, মৃত্যুও হবে না, আমরা যে অমর। জীবনের পথে মানব-হৃদয়ে কতরকম ভাবের উদয় হয়, তাদের এক এক ভূমিকায় এই "প্রাণের কথার" ভিতর অবতারণা করা হয়েছে। কি কি ভাবের সাহায্যে সত্যের উপলব্ধি করা যায় এবং সত্য কি, তাই দেখানো হয়েছে। নবীনের দল সকল ভাবের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে। তর্ক, যুক্তি, শাস্ত্র, জ্ঞান, দুঃখ,

ভাবনার ভিতর দিয়ে গেল,—কেউই সত্য কি বলতে পারলে না। শেষে বিশ্বাস আর প্রেম নবীনের দলকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল এবং তাদের সত্যের উপলব্ধি হ'ল; তারা দেখলে—জীবনই মৃত্যুর ছদ্মবেশে থাকে, আমাদের আগে আর কেউই নেই, আমরাই অনাদি অনন্ত, আর সব স্বপ্ন; আমরাই বারে বারে প্রথম, আমরাই ফিরে ফিরে প্রথম, আমরাই চিরকালের।

বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বকবির মূলমন্ত্র—"যা আছে রে সব নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে।"

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

(৩)

ফাল্গুনীর ফল্গুনদী আমাদের চিত্ত মরুর আনন্দধারা,—অসীম শূন্যের রামধনু।

মান্ধাতার আমল থেকে আমরা চলতে সুরু ক'রেছি। এ চলার বিরাম নেই, তবু চলতে হবে—

"কোন্ ক্ষ্যাপামীর তালে নাচে পাগল সাগর-নীর?
সেই তালে যে পা ফেলে যাই, রইতে নারি স্থির॥"

জল চলেছে, স্থল চলেছে, পাহাড় চলেছে, চন্দ্র-সূর্য্য, ফল-ফুল সব চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও চলেছি। আমাদের রাস্তা সোজা। আমাদের পথের ধারে আলোর মেলা—

"চলি গো, চলি গো, যাইগো চলে'
পথের প্রদীপ জ্বলে গো—গগন-তলে"—
চলতে চলতে চলার বাঁশী শুনতে পাই—
"পথিক ভুবন ভালবাসে পথিক জনেরে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে ক্ষণে ক্ষণেরে।"

অন্ধকারে পথ হারিয়ে গেলে অন্ধ বাউল পথ দেখিয়ে দেয়। সে রাত্রে পাখীর ডানার শব্দ শুনে পথ ঠিক করে অন্ধকারের বুকের মধ্যে দেখতে পায় আলো।

চলতে চলতে আমরা সেই মান্ধাতা বুড়োর সেই কালো গুহাটার ভিতর ঢুকে পড়ি—আবার নদীর স্রোতের সঙ্গে ক্ষ্যাপার মত তালে তালে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়ি, নবীন উৎসাহে—

"আমরা ঠেকব না তো কোনো শেষে,
ফুরয় না পথ কোনো দেশে রে!"
"আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগর পানে শিখর হ'তে রে!"

চলার দেশে চলতে চলতে হঠাৎ আমাদের মহারাজের মনটা হ'য়ে গেল খারাপ, কানের কাছে দুটো পাকা চুল দেখে। গ্রামে গ্রামে সে কথা রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ল, প্রজারা শুনে বল্লে—

"সর্ব্বনাশ, মহারাজের মন খারাপ! ভাবনার কথা বটে। দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা তিনি—এত বড় মহারাজ, তাঁরও মন খারাপ? এখন উপায়?

মন্ত্রীদাদা বুদ্ধিমান, কাজের কথা ক'য়ে রাজাকে ভোলাতে গেলেন —রাজার কিন্তু মন ভিজ্‌ল না—তিনি স্থির করলেন বৈরাগ্য সাধন করবেন। শ্রুতিভূষণের ডাক পড়ল, আর তাঁর বৈরাগ্য-বারিধি পুঁথি—ত্যাগের অবতার!

শ্রুতিভূষণ ছুটে এসে পায়ের ধূলা দিয়ে রাজমস্তকে বৈরাগ্যের টীকা এঁকে দিলেন, পুঁথির বুলি বুলিয়ে দিয়ে রাজার মনটীকে করলেন স্থির। দক্ষিণা নিলেন সামান্য—কাঞ্চনপুর জনপদ, ব্রাহ্মণীর আভরণ, আর সুদৃঢ় অট্টালিকা—কারণ এগুলোর অভাবে তাঁর বৈরাগ্যসাধনের ব্যাঘাত অনেক।

পুঁথির মন্ত্র কানে দিয়ে শ্রুতিভূষণ রাজার মনকে এমনই স্থির ক'রে দিলেন যে, রাজা আছেন কি না তা রাজা নিজেই বুঝতে পারলেন না। কাজেই দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের সেই নিদারুণ হাহাকার দরবারের বাইরে থেকেই ফিরে গেল।

কবিশেখর—তরলপ্রাণ, ফুলের ডাকেও সাড়া দেয়, মেঘের ডাকেও কান পেতে থাকে,—খবর পেয়ে এলেন, রাজাকে বোঝালেন —"সে কি মহারাজ, পাকাচুল দুটোকে আপনি ভাবেন কি? এতো সুসংবাদ, ও তো যমের পত্র নয়। নেপথ্যে আপনার জন্য মিলনের যে আয়োজন চলচে, ও যে সেই মিলনের নিমন্ত্রণ—ওটা যে নব মল্লিকার মালা—আপনার আবার বৈরাগ্য কি মহারাজ? সংসারের পথই আপনার বৈরাগ্যের পথ। সংসারে যে কেবলই মরা আর কেবলই চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে ২ কেবলই মরে, কেবলই চলে, সেই ত কবিবাউলের চেলা"—

কবির বাণী রাজার কানে 'গেল না—একেবারে প্রাণে গিয়ে বাজ্‌ল। কবিশেখরের কথাগুলো পুঁথির সঙ্গে মেলে না, ব্যাকরণের সঙ্গেও না—কিন্তু সুরের রং ফুটে উঠল রাজার চোখে—ছোপ দিয়ে কবি রং একেবারে ফলিয়ে দিলেন।

মহারাজ, আপনার দরজার বাহিরে ঐ যে কান্না উঠেছে, ও যে প্রাণের কাছে প্রাণের আবাহন—ওর মাঝখান দিয়ে আপনাকে ছুটতে হবে। কিছু করতে পারব কি না সে পরের কথা, কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, তবে অকর্ত্তব্য হ'ল বলে ভাবনা নয়, ভাবনা মরেছি ব'লে।

ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়া দক্ষিণা পেলে, কবি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গাইলেন, ঝঙ্কার দিলেন—

"অকূল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কি রে তোর ক্ষয়ক্ষতিরে?
যা আছেরে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে!

শ্রীসত্যচরণ সরকার।

ফাল্গুনী *

(ফরাসী হইতে অনুদিত)

ফাল্গুনীর প্রস্তাবনায় কবি রাজাকে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—"এটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভাণ, তা ঠিক বলতে পারব না"। বস্তুত ঠাকুরমহাশয়ের উক্ত রচনা একাধারে এ সবই। আমার মনে হয় যে, ফাল্গুনীর মূলে উপনিষৎ বা ভগবদ্গীতা ততটা নেই, যত না আছে A Midsummer Night's Dream।

শেক্ষপীরের কল্পনা যেমন বনে রাণী Titaniaরূপে প্রস্ফুটিত, এ কাব্যেও তেমনি অন্যরূপে প্রকটিত।

কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বিলাতের মহা নাট্যকার তাঁর ফুর্‌ফুরে কল্পনার খেলা দেখিয়ে কেবলমাত্র আমাদের চিত্তবিনোদন ও চিন্তার ভার অপনোদন করতে চেয়েছিলেন। অপরপক্ষে হিন্দু মহাকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য তাঁর ফাল্গুনীতে আমাদের একটা সার্ব্বজনীন তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া। তিনি পৃথিবীর চিরযৌবনের উৎসব সম্পাদনে রত; যে সকল নীতিবাগীশ কথায় যা বলেন কাজে তার উল্টো করেন, এবং যে "দাদা" কাটাছাঁটা চৌপদীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন, তাদের তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। তিনি ভালবাসেন সেই "সর্দ্দার"কে, যিনি জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করেন; সেই "চন্দ্র"কে

---

* "Le Cycle du Printemps" par Rabindranath Tagore, Les Nouvelles Litteraires, 3 Avril, 1926.

যিনি আমাদের পৃথিবীকে ভালবাস্তে শেখান; এবং সেই অন্ধ "বাউল"কে, যিনি চোখে দেখেন না, কিন্তু সমস্ত শরীর, সমস্ত মন ও সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে দেখেন। তিনি ভালবাসেন তরুণদের, যারা বসন্তের অগ্রদূত, যারা জানে যে শীত হচ্ছে "সেই চিরকেলে বুড়ো—যে ফিরে ফিরে যুবা হয়", যে তার জীর্ণ মলিন কন্থার আড়ালে যৌবনের সকল ঐশ্বর্য্য লুকিয়ে রাখে।

এই নব-যৌবনের দলের সঙ্গে শীতের খোঁজে বেরলে তবে অবশেষে আবিষ্কার করা যায় যে, তার মায়াবী রূপের আড়ালে রয়েছে সর্দ্দারের নবীনতর উজ্জ্বলতর রূপ। আমি সুর ধরিয়ে দেবার জন্য শেক্ষপীরের নাম করেছি বটে; কিন্তু ফাল্গুনীর মধ্যে কতটা মৌলিকতা আছে এবং খেলাচ্ছলে কি গভীর রূপকের অবতারণা করা হয়েছে, সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিম্নলিখিত কথাগুলি আমাদের বড় ক্রিটিক Henri Bremond-এর ঠিক মনের মত :—

"মহারাজ, আমাদের কথা ত বোঝবার জন্যে হয় নি, বাজ্‌বার জন্যে হয়েচে।"

—"যা রচনা করেচ তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব?"

—"না মহারাজ! রচনা ত অর্থ গ্রহণ করবার জন্যে নয়!"

—"তবে?"

—"সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি ত বলেচি, আমার এ সব জিনিষ বাঁশির মত, বোঝবার জন্যে নয়, বাজ্‌বার জন্যে।"

—"তবে তোমার এ রচনাটা বলচে কি?"

—"ও বলচে, আমি আছি! শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ শুন্‌তে পায় জল স্থল আকাশ তাকে বলে' উঠচে 'আমি আছি'!—তারই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে বলে' ওঠে—'আমি আছি'! আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া!"

"কবিত্বের মর্ম্ম" সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে অনুসন্ধান চলছে, আমার বিশ্বাস এই সব কথায় তার অনেক সাহায্য হবে। র নাথ ঠাকুরের এই কল্পনা-লীলা কবিত্বের সারমর্ম্মে ওতঃপ্রোত, তার মধ্যে ফাল্গুনের সুরভিত দখিণ হাওয়া সর্ব্বত্র বহমান।

আমার মনে হয়, ফাল্গুনীর ফরাসী অনুবাদক, ইংরাজী অনুবাদের ভিতর দিয়ে মূল বাঙলা কাব্যের সকল মাধুর্য্য আস্বাদন করতে পেরেছেন।

রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম

—— ❋ ——

Patriotism ও Nationalism দুটিই মানুষের জীবনে খুবই বড় কথা। অথচ রুষ-রাজ্যের মহামনীষী Tolstoy patriotism-কে বেশ একটু সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। আর বাঙলার মহামনীষী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ Nationalism-এর গলদ বার করায় তাঁকে কতই না নিন্দাবাদ ও বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। বাঙলার কোন সুবিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা প্রকাশ্য সভায় তাঁকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন—সূর্য্যের চেয়ে বালির তাত বেশী, এমনি আরও কত কি! আবহমান কাল ধরে যাঁকে মানুষ খাঁটী সোনা বলে' জেনে এসেছে, নিছক সত্য বলে' মেনে এসেছে, তা'তে যদি হঠাৎ কেউ মিথ্যার খাদ আবিষ্কার করে ত তার উপর খড়গহস্ত হ'য়ে ওঠা মানুষের স্বাভাবিক। এর প্রধান কারণ—সত্যের অনাবৃত জ্যোতি সহ্য করবার মত শক্তির অভাব। সে যাই হোক, এখন দেখা যাক্—স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি।

সভ্যতার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে যেমন রাষ্ট্র গড়ে উঠ্‌ছিল, তেমনিই তার মনে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার অঙ্কুর গজিয়ে উঠ্‌ছিল। ফলে পরস্পর এমনই অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেল যে, কোন জাতির স্বদেশপ্রীতি বা জাতীয়তার ইতিহাস বল্‌লে তাদের রাষ্ট্রইতিহাস ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। কাজেই Patriotism

ও Nationalism-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ মানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

ইতিহাসের প্রভাত হ'তে আজ পর্য্যন্ত মানুষের রাষ্ট্রজীবনের দিকে তাকালে দেখ্‌তে পাই যে, রাষ্ট্রনেতারা এতদিন ধরে' মানুষের আর যাই ভালমন্দ ক'রে থাকুক, একটা কথা আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না যে তাঁরা একটা মস্ত বড় মিথ্যাকে সত্যের মুখোষ পরিয়ে বরাবর মানুষকে প্রতারিত করে' এসেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে—রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক থাক্‌তে পারে না ; যদিও থাকে ত সে অতি সামান্য, আর তা'ও রাষ্ট্রেরই প্রয়োজনে, তারই ভালমন্দের খাতিরে,—ধর্ম্মের প্রতি নিছক নিরপেক্ষ শ্রদ্ধায় নয়। এই মিথ্যার অনুকূলে যুক্তি দেখানো হয় এই যে—রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতির উপরে ত একান্ত নির্ভর করছে খাওয়া পরা ও তার আর দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা অসুবিধা ; এ সব ত নেহাৎ স্থূল জীবনেরই লাভক্ষতির কথা। এ সবের সঙ্গে সূক্ষ্ম মনের রাজ্যের, আত্মার রাজ্যের, ধর্ম্মজগতের কি সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে? এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার মূলে রয়েছে সত্য-দৃষ্টির অভাব—অর্থাৎ কিনা জীবনের ঐক্য ভুলে গিয়ে তাকে পৃথক পৃথক করে দেখা।

রাষ্ট্র কি? আর মানুষের জীবনে তার প্রয়োজনই বা কি? সৃষ্টির আদি যুগে মানুষ যখন বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত, সারা বিশ্ব জুড়ে যখন বর্ব্বর জাতির আধিপত্য ছিল, মানুষে আর পশুতে যখন বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না—তখন অবশ্য সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন বালাই ছিল না। ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধিই ছিল—তাও শুধু পেটটা ভরে খাওয়া আর ঘুমানো ছিল তখনকার মানুষের

চরম লক্ষ্য। আর সেই স্বার্থসিদ্ধির একমাত্র উপায় ছিল পশুবল। Might is right-ই ছিল তখনকার ধর্ম্ম, নীতি, আইনকানুন, যা' কিছু সব। যার দেহে শক্তির অভাব হত, তার জীবন-সংগ্রামে বেঁচে থাকা একরকম অসম্ভব হ'ত। আহারবিহার নিদ্রার জন্যে, কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার খাতিরে—কাড়াকাড়ি, মারামারি, রক্তারক্তি এবং আরও কতরকমের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তির সঙ্গে, ঘূর্ণিঝঞ্ঝার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ধস্তাধস্তি ক'রতে ক'রতে তাদের সারাজীবনটা কাটিয়ে দিতে হত। তারপর মানুষের এই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব, এই দুরন্ত প্রবৃত্তি ক্রমেই তা'কে উত্ত্যক্ত ক'রে তুল্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে স্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগল; তখন শান্তি ও শৃঙ্খলার খোঁজে সে পথে বেরিয়ে এল। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌ল, তার মধ্যে এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল যে সৎবুদ্ধি। এই সৎবুদ্ধিই শেখালে ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনার অবাধ উদ্দাম প্রবাহকে সমষ্টির স্বার্থ সাধনার কাছে ধরা দিয়ে বাঁধা পড়তে; ব্যক্তির দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খল মতি গতিকে সমষ্টির ইচ্ছাশক্তির কাছে মাথা নীচু ক'রে শান্ত হ'য়ে থাকৃতে। এই নিয়মের ব্যতিক্রমই হ'ল বিদ্রোহ, এবং সেই বিদ্রোহের শাস্তিবিধানের অধিকার দেওয়া হ'য়েছিল সমষ্টিকে। এই সমষ্টিই হ'ল সমাজ ও রাষ্ট্র। তা'হ'লেই সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মোটামুটি বিচারে আমরা বুঝতে পারচি যে, সভ্যতাপ্রসারের ফলে রাষ্ট্রসাধনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হ'য়ে উঠেছে মানুষের জীবনকে অবাধ ভোগসুখের অধিকারী করা।

আর ধর্ম্ম? এখানে ধর্ম্ম অর্থে অবশ্য কতকগুলো বাঁধাধরা রীতি নীতি আচারব্যবহারের সমষ্টির কথা বলা হচ্ছে না, যা' দেশভেদে,

জাতিভেদে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম ধারণ করে থাকে। কথা হচ্চে সেই ধর্ম্মের, যা' কালের বুকে জ্বলন্ত আলোকনির্ঝরের মত অশ্রান্ত বেগে ব'য়ে চলেছে; বিশ্বের সব আলো নিবে গিয়ে প্রলয় ঘটে গেলেও যার প্রবাহ বন্ধ হ'তে পারে না; পৃথিবীর কি প্রাচীন, কি নবীন, প্রতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই যার অল্পবিস্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে; যা' নিত্য নূতন, চির-পুরাতন; যার অফুরন্ত নিখুঁত সৌন্দর্য্যের যুগ-যুগান্তরেও এতটুকু ক্ষয় নেই; যাকে এক কথায় বলা হয়, চিরন্তন বা সনাতন সত্য। মানবজাতির জন্ম-কাল হ'তে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মানুষের যে ধর্ম্মসাধনা, তার তলে তলে রয়ে গেছে তার এই সত্যানুসন্ধিৎসা। সৃষ্টির উষা হ'তে--সভ্যতার আলোকের সবেমাত্র যখন ক্ষীণ রেখাপাত সুরু হ'য়েছে—তখন থেকে প্রকৃতির দেওয়া কি একটা অনিবার্য্য আকর্ষণে মানুষ মন্দ হ'তে ভালর দিকে, ক্ষুদ্র হ'তে বৃহতের দিকে, অর্থাৎ কিনা মিথ্যা হ'তে সত্যের দিকে ছুটে চলেছে। তাইত Carlyle বলেছেন—Man is everywhere the born enemy of lies। এমন একদিন আসবে, যেদিন সে যথার্থই সত্যের কূলে উত্তীর্ণ হবে,—হোক "পশ্চাতে দানবী মায়া ভীষণ সে টান"। সেদিন তার সব অন্ধকার ঘুচে গিয়ে, সকল ময়লা ধুয়ে মুছে গিয়ে তার অন্তর অনাবিল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও শান্তিতে ভরপুর হ'য়ে উঠবে—এই ত হ'ল মানব-জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা। এখন দেখা যাচ্ছে—রাষ্ট্র যেমন মানুষের বাইরের স্থূলজীবনের ভালমন্দের নিয়ন্তা, ধর্ম্ম তেমনই তার ভিতরের সূক্ষ্মজীবনের সব অমঙ্গল, দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দিয়ে সেখানে মঙ্গল ও যথার্থ সম্পদ প্রতিষ্ঠা করবার নিয়ন্তা। এইবার দেখা যাক,

রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে কি সম্পর্ক, আর সেই সম্পর্কের উপর বিশ্বমানবের কল্যাণ কতখানি নির্ভর করছে।

সকল দেশে সকল যুগে রাষ্ট্রত ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার এবং বিদ্রোহের শাসন করবার ভার নিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে—রাষ্ট্রের নিজের যখন বুদ্ধির বিকৃতি ঘটে, স্বার্থসাধনার ঝোঁকে অন্ধ হয়ে যখন সে অপরের স্বার্থ গ্রাস করতে ছোটে, তার অধিকার ও শক্তির যথেচ্ছা ব্যবহার করতে থাকে, তখন তাকে শাসনে রেখে অপরের স্বার্থরক্ষা করবে কে? প্রাচীন ইতিহাস বলছে—কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে, শাসক-সম্প্রদায় পুরোহিত-সম্প্রদায়ের আদেশ মান্য করে চলত। ফলে রাষ্ট্রের যথেচ্ছাচারিতা ও স্বাধিকারপ্রমত্ততা সংযত ত হয়ইনি, বরং সমাজের বুকে মাথা খাড়া করে' উঠেছিল কত মিথ্যার প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্মনীতির কত উৎপাত, কত shams, hollow mockeries :—যেমন Greek oracle, Pope এর অখণ্ড প্রতাপ, এবং ভারতে ব্রাহ্মণের উপর একটা অন্যায় অসহ্য অন্ধ ভক্তি ও ভয়, যা' জাতিকে শিখিয়েছিল ব্রাহ্মণের সাত খুন মাফ' করতে। যে সম্প্রদায় সমাজের ধর্ম্মশিক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছিল, সেই পুরোহিতসম্প্রদায়ের আদেশ পালন করার পরিণামে জাতি যদি মিথ্যার পূজারী হয়ে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে সেই ধর্ম্মগুরুর দল আর যাই হ'ন; সত্যের সাধক ছিলেন না। তাইত যুগযুগান্তর অতীত হ'য়ে গেলেও রাষ্ট্রের তরণী আজও কূলে উত্তীর্ণ হ'তে না পেরে আঘাটায় আঘাটায় ঘুরে মরছে। এর কারণ কোথাও বা ব্রাহ্মণ হাল ছেড়ে দিয়েছে, আর কোথাও বা হাল ধরে' থেকেও নৌকাকে স্বেচ্ছায় বিপথে বেয়ে নিয়ে চলেছে। তাইত সুদূর অতীত হ'তে আজ পর্য্যন্ত প্রতি রাজা মহারাজা ও রাষ্ট্র-

নেতাদের জীবন এক একটা একটানা paradox হয়ে উঠেছে। যারা নিজেদের রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলার খাতিরে, নিজেদের দেশবাসীকে নিরাপদ কর্‌বার জন্যে কত শত আইনকানুনের প্রবর্ত্তন করে' থাকে, তারাই আবার দিগ্বিজয়ের দোহাই দিয়ে পরের দেশে অমানুষিক অত্যাচারের ঢেউ বইয়ে দিয়ে, পরের শান্তি, শৃঙ্খলা স্বাধীনতা, জীবন ধন সমস্তই অবলীলাক্রমে ভাসিয়ে দিয়ে থাকে। অন্তরের যে প্রবৃত্তির বশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের রাজারা রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্‌তেন—তা সে রামচন্দ্রই করে থাকুন আর যুধিষ্ঠিরই করে থাকুন—সে প্রবৃত্তি কি বর্ত্তমান কালের জার্ম্মাণীর বিশ্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষারই পুরাতন সংস্করণ নয়? জার্ম্মান দিগ্বিজয়ের পথ এবং রাজসূয় আর অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের পথ কি সমভাবেই নিষ্ঠুর রক্তপাতে ও নরনারীর চোখের জলে ডুবে গিয়ে সুদুর্গম হ'য়ে ওঠেনি? প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ যে সত্যধর্ম্মের সন্ধান পায় নি, এ কথা বল্‌লে মিথ্যা বলা হবে। তবে তখন রাষ্ট্রের এই সমস্ত কার্য্য যে সত্যধর্ম্মের অনুমোদন না পেলেও অবাধে স্বচ্ছন্দে অনুষ্ঠিত হত, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তারপর ঐতিহাসিক যুগে কত রাষ্ট্রনেতা দিগ্বিজয়ের দোহাই দিয়ে, সভ্যতাবিস্তারের ছল করে পরের শান্তিনিকেতনে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য-ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করেছে। মুসলমানেরা ধর্ম্মগুরুর প্ররোচনায় দেশদেশান্তরে সত্যধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার ছলে "পশ্চিমে হিস্পানি শেষ পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ" পর্য্যন্ত একচ্ছত্রাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ ছিন্ন করে ফেলাতেই এই সব বিরাট স্বেচ্ছাচার সম্ভব হ'য়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মের নিয়ম

না মেনে চলা খুবই নিন্দনীয়, অথচ জাতির জীবনে প্রয়োজন হ'লে সেইটেই কর্ত্তব্য বলে গণ্য করা হয়েছে। ব্যষ্টির পক্ষে যা অন্যায়, যা অধর্ম্ম, সমষ্টির পক্ষে তাই হয়ে উঠ্‌ল ন্যায় ও ধর্ম্ম। আমি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যা করবার কথা ভাব্‌লেও শিউরে উঠি, তা অবাধে অনুষ্ঠিত হ'তে পারে যখন স্বার্থসিদ্ধিটা হয় জাতিগত। 'সত্যের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করলে অবশ্য এর ভুল ধরা পড়ে। কিন্তু তবুও মানুষ এতকাল ধরে' এই ভুলের বশেই চলে এসেছে। আজ সত্যদ্রষ্টা ঋষি টল্‌ষ্টয় ও রবীন্দ্রনাথের চক্ষে এই ভুল ধরা পড়েছে। তাঁদের সত্যবাণী বিশ্ববাসীর কানে ঠিক তেমনই অদ্ভুত শোনাচ্ছে, যেমন Middle Age-এর মানুষের কাছে শোনাত দর্শনবিজ্ঞানের কোন নবীন তত্ত্ব। সে যুগে সত্যের উপাসককে ঐন্দ্রজালিক বা উপদেবতা বিশ্বাসে তার উপর যথেচ্ছা উৎপীড়ন করা হ'ত, এমন কি সজীব অবস্থায় তাকে পুড়িয়ে মারা হ'ত। বর্ত্তমান যুগে সভ্যতা প্রসারের ফলে ওরকম বর্ব্বরতার পথ রুদ্ধ হ'য়েছে বটে, কিন্তু বচন-বাগীশদের তথাকথিত পাণ্ডিত্যের শুষ্ক তর্কের নীচে সত্যের বাণী যে তলিয়ে যায়; তাইত Tolstoy-এর অন্তরের কথা পশ্চিমের লোকেরা বুঝতে পার্‌লে না, তাঁর বাণী তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কেঁদে ফিরে এসেছে। এখনও পশ্চিমের লোকেরা, যারা সভ্যতার বড়াই করে থাকে; যারা নিজেদের বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডারী বলে অহঙ্কার করে থাকে; তারাই Balance of power-এর দোহাই দিয়ে, দুর্ব্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা কর্‌বার ছলে দেশে দেশে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে—রক্তপাত করে, অগ্নিকাণ্ড করে, লুণ্ঠন করে, লক্ষ লক্ষ জীবন কীটপতঙ্গের মত দলে' পিষে নষ্ট করে

ফেলছে; এতটুকু দ্বিধা নেই, এতটুকু সঙ্কোচ নেই। কেন থাকবে? তারা জানে—"যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই সঙ্কোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যেই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু দামী সাজিয়ে রেখেছে। তারাই নদী সাঁতরে আসবে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিষ ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামী জিনিষের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করবে,—কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালবাসে—তাই আধমরা তপস্বীর হাড়-বেরকরা গলায় সে আপনার বসন্তফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না"। ভোগবিলাসে ডুবে থাকাই যাদের জীবনের উদ্দেশ্য, বস্তুবিশ্বের উপর আধিপত্যবিস্তারই যাদের জীবনের আদর্শ, তারাই শক্তির এই মদমত্ততাকে, এই বাসনার ক্ষুধার জ্বালায় উন্মাদ হওয়াকে সত্যের সাধনা বলে ভ্রম করে থাকে। সত্যের বাণীকে, ধর্ম্মের আইনকানুনকে তারা ত পাগলের প্রলাপ বলে' হেসে উড়িয়ে দেবেই। কেননা তা'দের অন্তরের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, এই বিশ্বাস অচল অটল হ'য়ে আছে,—"এই যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি, এটা হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী। কতকগুলো বড় কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি পেটে খালি হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল, সে কেন এই শক্ত মাটীর পৃথিবীতে জন্মেছিল? আমি যা' চাই তা' আমি খুবই চাই—আমি তা দু'হাতে করে চট্‌কাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে মাখব,

সমস্ত পেট ভরে খাব। * * * * * * * * *

এইগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্যসাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড় বড় কাণ্ডকারখানা চলচে। আর যে সব অবতার স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেইখানকার ভাষায় কথা কইতে থাকেন, তাঁদের কথা বাস্তব নয়; এই জন্যে এত চীৎকারেও সে সব কথা কেবলমাত্র দুর্ব্বলদের ঘরের কোণে স্থান পায়। যারা সবল হয়ে পৃথিবী শাসন করে, তারা সে সব কথা মান্‌তে পারে না, কেননা মান্‌তে গেলেই বলক্ষয় হয়; তার কারণ কথাগুলো সত্যই নয়। যারা এ কথা বুঝতে দ্বিধা করেনা, মানতে লজ্জা করেনা, তারাই কৃতকার্য্য হল; আর যে হতভাগারা একদিকে প্রকৃতি আর একদিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দু' নৌকায় পা দিয়ে দুলে মর্‌চে, তারা না পারে এগতে, না পারে বাঁচতে"।

মিথ্যার এই দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারকে আর বেশীদিন বাঁচতে হচ্ছে না—তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে; সত্যের দুন্দুভি বেজে উঠেছে। মানবজাতির যাঁরা সত্যিকারের নেতা, তাঁদের কানে সে ডাক পৌঁচেছে। মানুষকে তাঁরা ব্যাকুল স্বরে আহ্বান কর্‌ছেন, সত্যের এই ডাকে সাড়া দেবার জন্যে। সত্যই বিশ্বের অবলম্বন। বিশ্বের যা-কিছু—জড়জগৎ, জীব-জগৎ, মনো-জগৎ,—সবই সত্যের নিয়মে আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা। ও নিয়মকে কোথাও এতটুকুও অবহেলা করা চল্‌তে পারেনা, করলেই দুর্গতির আর অন্ত থাকে না! যে সত্য সাধনায় মানুষে জীবনে পূর্ণতা লাভ করে, রাষ্ট্রসাধনা তার থেকে পৃথক কিছু একটা হ'তে পারে না; ও তারই একটা বিশেষ অঙ্গ।

রাষ্ট্রকে পথ চল্‌তে হবে সত্যের অনুমোদনের অপেক্ষা রেখে। এ কথা এখন হয়ত "সোনার পাথরবাটী" গড়ে তোলবার মত অদ্ভুত অসাধ্য সমস্যা বলে মনে হ'তে পারে। কিন্তু বাস্তবিক যে এটা অদ্ভুত বা অসাধ্য সমস্যা নয়, তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য রয়েছে—অশোক মৌর্য্য—সারা বিশ্বের ইতিহাসে যে সম্রাটের জুড়ি মেলেনা। একা অশোকই যুগযুগব্যাপী জগৎজোড়া রাষ্ট্রজীবনের একটানা ধারা অনুসরণ না করে, নিজের আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাসের জোরে, সত্যের একনিষ্ঠ সাধনার বলে, পৃথিবীর এক প্রান্তে এক নবীন মহান আদর্শরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বমানব কিন্তু সেদিন সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়নি। আবার সেই আদর্শ দিকে দিকে ঘোষণা করবার দিন এসেছে। যেদিন সত্যসত্যই পৃথিবীময় এই আদর্শের অনুসরণে দেশে দেশে রাষ্ট্র গড়ে উঠ্‌বে, সেদিন বিশ্ব-মানবের কী এক মহা দিন! সেদিন দেশে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠ্‌বে, আকাশবাতাস আনন্দে মেতে উঠ্‌বে, বেসুরো অনেক কিছু, বেতালা অনেক কিছু সব ঘুচে গিয়ে এক মহা মিলনের সঙ্গীতে সারা বিশ্ব মুখরিত হ'য়ে উঠবে।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কলকাতার দাঙ্গা



কলকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে যে সব কথাবার্ত্তা কওয়া হচ্ছে, তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এখন কারও মাথা নেই, কিন্তু সকলেরই হৃদয় আছে।

হিন্দু মুসলমান কারও কথার ভিতর যে logic নেই, তার কারণ logic জিনিষটে মাথা থেকে বেরয়।

তবে হৃদয়েরও অর্থাৎ রাগদ্বেষেরও একটা logic আছে, যার সন্ধান আরিষ্টটেল কিম্বা গোতম জানতেন না।

সেই হার্দ্যন্যায় বর্ত্তমানে দিব্য প্রকট হয়ে উঠেছে। ও একটা মানসিক রোগ।

রোগেরও একটা লজিক আছে—যা ডাক্তারদের ভাষায় বলতে গেলে, will take its course। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রোগীকে চটপট সারাতে গেলে হয়ত উল্টো উৎপত্তি হবে।

সুতরাং যা হয়েছে তা হয়েছে বলে মেনে নিয়ে দেখা যাক্, সে বিষয়ে কি বলা যেতে পারে।

মৌলবী কলম আজাদ এবং মিষ্টার জে, এম, সেনগুপ্ত আবিষ্কার করেছেন যে, তাঁদের পঞ্চবৎসরব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের ফলে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর যে সখ্য জন্মলাভ করেছে, উক্ত ঘটনার ভিতর সুধু সেই সখ্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আশা করি এই হিন্দু নেতা ও মুসলমান নেতার পরস্পরের সখ্য উক্তজাতীয় নয়।

প্রণয় জিনিষটে খুব ভাল, কিন্তু তা যদি হয় অতি গাঢ়, তাহলে প্রণয়ী-যুগলকে পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশ হতে মুক্ত হবার জন্য বলতে হয়—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!

দ্বিজু রায় বলেছেন যে, একটি আদর্শ দম্পতির দাম্পত্যপ্রণয় যখন চেগে উঠত, তখন "পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত।"

এ কদিন ধরে যে পাড়ার লোকে পুলিশ ডেকেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পাঁচ বৎসর ধরে কঠিন পরিশ্রমের সহিত পলিটিকাল ঘটকালির ফলে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর উক্তরূপ দাম্পত্যপ্রেম স্থাপিত হয়েছে।

"ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে" প্রস্তাবটা রাজনৈতিক হিসেবে খুব চটকদার। কিন্তু যাঁদের রাজনীতির ত্বর সয় না, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি—তার পর? বিয়ে ত আর মৃত্যু নয় যে, তারপর আর কিছু নেই।

ওরকম বিয়ের পিঠ পিঠ কথা ওঠে, "বর বড় না কনে বড়"? তারপরই ঘটে দাম্পত্যকলহ, যার আর এক নাম হচ্ছে অজাযুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

যা হয়েছে তা যে যুদ্ধ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যুদ্ধ মানে মারা ও মরা। যে মরেছে তার কাছে সব যুদ্ধই সমান। ওর ভিতর ছোটবড়র প্রভেদ নেই।

যুদ্ধ হলেই লোকে তার কারণ খোঁজে। য়ুরোপের গত যুদ্ধের কারণ লোকে আজও খুঁজছে। কলকাতার যুদ্ধেরও কারণের তল্লাসের দু' চারটি অনুসন্ধান-কমিটি গঠিত হয়েছে।

সম্ভবত যাঁরা খুঁজছেন তাঁরাই তা ঘটিয়েছেন, কারণ এ বিষয়ে অনেকেই একমত যে, এ ব্যাপারের পিছনে brain আছে।

যদি তাই হয় ত সে brain-এর সন্ধান সহজেই পাওয়া যাবে।

একটা লক্ষণে সে brain সহজেই চেনা যাবে। যে brain থেকে এ বুদ্ধি বেরিয়েছে,তা নিশ্চয়ই brainless brain।

হয় মিস্টার আবদার রহিম, নয় সহিদস্থুরবর্দ্দি বলেছেন যে, এ বিরোধের কারণ দুটি—(১) পলিটিকাল, (২) ধার্ম্মিক।

তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রতি দলের ভিতর দুটি দল আছে—(১) শিক্ষিত দল, (২) মুর্খের দল।

পলিটিক্স্ ত শিক্ষিত দলের একচেটে ; আর যে ধর্ম্মের মানে বিধর্ম্মবিদ্বেষ, সে ধর্ম্ম মুর্খদের একচেটে।

অর্থাৎ ধর্ম্মের দলে brain নেই, আছে শুধু পলিটিক্সের দলে। সুতরাং brain-এর তল্লাস করতে হবে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে। যদি কোথায়ও তা খুঁজে পাওয়া যায়, ত সেখানেই পাওয়া যাবে।

যদি কেউ বলেন যে, ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্সের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ, তাহলে মানতে হয় যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও অশিক্ষিত আর অশিক্ষিতের দলও শিক্ষিত।

সে যাই হোক্, দেখা যাচ্ছে যে, ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্স্ মেশানো হচ্ছে Nitric acid-এর সঙ্গে glycerine মেশানো। ধর্ম্মের গ্লিসারীণ জিনিষটে অতি নিরীহ, কিন্তু পলিটিক্সের অ্যাসিডের সঙ্গে মেশালেই তা মারাত্মক হয়ে ওঠে।

পলিটিক্সের সঙ্গে ধর্ম্ম মেশালে পলিটিক্সের যে শক্তি বাড়ে, সে

বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সে শক্তি হয় প্রলয়ঙ্করী, আর পলিটিসিয়ানদের এমন কোনও বিদ্যে নেই, যার সাধ্য রোধে তার গতি।

Law and order জিনিসটে বাতাসের মত; অর্থাৎ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার মর্য্যাদা মানুষ বোঝে না, বরং হঠাৎ "কাগজ উড়িয়ে নিলে" বলে' তার উপর মানুষে গায়ের ঝাল ঝাড়ে। কিন্তু ঐ জিনিষের অভাবেই মানুষে খাবি খায়।

ও ক্ষেত্রে আর এক বিপদ আছে। বাইরের law and order-এর সঙ্গে সঙ্গেই মনের law and order চলে যায়। এ অবস্থায় ফূর্ত্তি করতে পারে স্বধু তারা, যাদের অন্তরে উনপঞ্চাশ বায়ু আছে। বলা বাহুল্য আমাদের অধিকাংশ লোকের ভিতর তা নেই।

স্নুতরাং আবার কিসে আমাদের ভিতরে বাইরে law and order ফিরে আসে, সে ভাবনা আমরা ভাবতে বাধ্য।

আমি পলিটিকাল ডাক্তার নই, স্নুতরাং এ রোগের ওষুধ আফিং কি ব্র্যাণ্ডি তা বলতে পারিনে।

ইতালিতে মুসোলিনি নামক একজন পলিটিকাল ডাক্তার ক্যাষ্টর অইল প্রয়োগ করে এ অবস্থায় খুব ভাল ফল পেয়েছেন। এ দেশের ছোট পলিটিকাল ডাক্তারদের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

যদি communal গোলমালের সত্য সত্যই জড় মারতে চাও, তাহলে communal representation দূর করতে হবে। এ পলিটিকাল রোগের-মূল বজায় রেখে বাইরে প্রলেপের ব্যবস্থা করবে স্বধু পলিটিকাল হাতুড়ের দল।

৩রা মে, ১৯২৬। বীরবল।

ভারতবর্ষে।

(সিংহল হতে নেপাল)

(১)

শান্তিনিকেতন।

[মাডাম লেভির ফরাসী গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শান্তিনিকেতন বোলপুর স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড অনুর্ব্বর অধিত্যকা, সেখানে গুটিকতক গ্রাম ও এই ইস্কুল যেন মরুভূমিতে সবুজ দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। কিম্বদন্তি এই যে, কবির পিতা, যিনি ছিলেন মহর্ষি বা মহৎ সাধু, এই পথে যাবার সময় এই উদার উন্মুক্ত প্রান্তরের সৌন্দর্য্যে ও বিশাল নির্জ্জনতায় আকৃষ্ট হন। তাঁর তখন সেই বয়স, যখন হিন্দুর মন স্বভাবতঃ বানপ্রস্থ্যের দিকে ঝোঁকে। তিনি তাঁর চাকরদের জানান যে কিছুদিন একলা থাকতে ইচ্ছা করেন, এবং এখানকার একমাত্র গাছের তলায় বসে' ধ্যানধারণায় নিবিষ্ট হন; রাস্তার ডাকাত তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়। কালক্রমে এই স্থানেই তিনি একটি বড় বাড়ী তৈরি করালেন; শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হ'ল। তাঁর কবিপুত্র সেকালের আশ্রমের অনুকরণে এই বাঞ্ছিত ভূমিতে তাঁর ইস্কুল স্থাপন করেন। মহর্ষি মৃত্যুকালে তাঁকে এই বাড়িটি অতিথিশালা বা guest-house করবার জন্য দিয়ে যান এই সর্ত্তে যে, সেখানে মদ্যমাংসের প্রবেশ নিষেধ। চারিদিকে গুটি ত্রিশেক নীচু খোড়ো বাঙ্গালোয় শিক্ষক ও ছাত্রেরা বাস করেন।

পড়ার ক্লাস বসে গাছের তলায়; কেননা আমগাছ, শালগাছ ও তালগাছ পোঁতা হয়েছে, তা'তে ফলও ফলেছে। শ'তিনেক ছাত্র, তার মধ্যে জন চল্লিশেক ছাত্রী, এখানে পরম শান্তিতে বাস করে। সবসুদ্ধ একটি গভীর শান্তসমাহিত প্রসন্ন ভাব বিরাজিত বলে' বোধ হয়; যেন একটি ক্ষুদ্র জগত, বিদ্যাচর্চ্চা এবং জাতীয় ভাবের একান্ত অনুশীলনই যার প্রাণ।

বহু বৎসর যাবৎ কবি বলতে গেলে একলাই এই অনুষ্ঠানের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন; পরে একটি সমিতি স্থাপিত হয়, তাঁরা এই মহৎ কাজে তাঁকে সাহায্য করে' থাকেন। প্রতিদিন ঠাকুরমশায় গাছতলায় বসে' ছেলেদের ইংরাজী ও বাঙ্গলা পড়ান; এমন যে বড়লোক, যাঁকে পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই খণ্ডই গৌরবরবি বলে' মানে, তিনি তাঁর দিনের এতটা সময়, এমন কি তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছেলেদের জন্য উৎসর্গ করছেন—যে ছেলেরা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ গড়ে' তুলবে,—এ দৃশ্য রোজ রোজ দেখা যায় না। বেশির ভাগ লোকের স্বদেশপ্রেম মুখের কথা হলেও, ইনি এই কাজে—পৃথিবীতে অদ্বিতীয় এই কাজে—সেটি প্রকাশ করছেন।

আমাদের আগমন উপলক্ষ্যে একটি মহা উৎসবের আয়োজন হ'ল। আমগাছতলায় সমস্ত শান্তিনিকেতন—ছাত্র, শিক্ষক, ও ছেলেমেয়ে—অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সমবেত হল; কিম্বা দু'টি সিকিচন্দ্রাকারে বলা উচিত (লিঙ্গভেদ এখানে সর্ব্বদাই মেনে চলা হয়)। সামনে একটি নীচু পাথরের বেদীতে আমরা বসলুম। দু'জন অধ্যাপক শ্লোকপাঠ করলেন; ফরাসীর অধ্যাপক আমাদের উদ্দেশে একটি সৌজন্যপূর্ণ বক্তৃতা করলেন; কবিবর তাঁর নূতন অধ্যাপককে

মনোজ্ঞ স্বাগত-বচনে অভ্যর্থনা করলেন, আমাদের কপালে চন্দন দিয়ে দিলেন, আমাদের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। মাটিতে শুভ সূচনার আল্‌পনা দেওয়া হয়েছে; ফুলের গন্ধ তীব্র, আমাদের মন বিচলিত, কেমন যেন একটু দেশছাড়াগোছের ভাব।

সকলেই খেতে উঠে গেল। কিন্তু খাব কি? আমি ত কোন খাবারের নাম জানিনে, আর যদিও জানতুম, তাতে অজানা জিনিষই বোঝাত। অতি মুখরোচক ছোট ছোট কোপ্তা, পাঁচ মিশেলী রকমারী তরকারি, অতিরিক্ত মিষ্টি জিনিষ। পাঁউরুটি একটি বিলিতী সৌখীন দ্রব্য যা' মাঝে মাঝে ভুলে যেতে হয়, কিন্তু এখান থেকে মাইলখানেক দূরে বোলপুরের বাজারে প্রায়ই পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যেই আমাদের একটি মাদ্রাজী খৃষ্টান ছোক্‌রা জুটেছে; পাশ্চাত্য জাতি ও তাদের কায়দাকানুন সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল বলে তাঁর অহঙ্কার। "যদি কেবল ময়দা, সির্কা আর পনীর থাকৃত ত কি সুন্দর 'মেয়নেজ্‌' না বানানো যেত। কিন্তু এই সব হিঁদুলোকেরা" !—বলে' তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক একটি ইঙ্গিতে তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত অধিবাসীকে দেখিয়ে দিতেন, মায় ঠাকুরপরিবার! "আর এই গান্ধী!—ক্যাথলিক খৃষ্টান আমরা—আমাদের কাছে ওদের কিবা ধর্ম্ম! কিন্তু হুজুর কি কাল রাত্রে চাপা শব্দ শুনতে পান নি, যেন কে আস্তে আস্তে জানলায় ঠক্ ঠক্ করছে?—ভূত, হুজুর। লোকে বলে এই জঙ্গলে ঢের ভূত আছে"। এই জোসেফ্ ছোঁড়াটা মিশ কালো, পেরুর মত দেমাকে ভরা, ও সার তত্ত্বে পরিপূর্ণ।

এখানকার সব জিনিষে ও মানুষে কি এক মহা আকর্ষণী শক্তি

আছে। মানুষের মধ্যে আছে ভারি একটি কোমলতা, একটি সৌকুমার্য্য, একটি উদারতম করুণার ভাব, যা' পশুজাতি পর্য্যন্ত প্রসারিত। ব্যঙ্গশ্লেষের মাত্রা খুব কম। এদের শিষ্টতা সুন্দর ও গম্ভীর; পাশ্চাত্য দেশে যে চাপা ভাব এত ক'রে' সাজিয়ে তোলা হয়েছে, এঁদের মধ্যে সে ভাবটির একান্ত অভাব। আর জিনিষপত্রের মর্য্যাদা এত কম! এখানকার খুব উঁচুদরের গৃহসজ্জাও আমাদের নিতান্ত গৃহস্থ লোকের কাছে হাস্যজনক বোধ হবে; এখানে ঘর মানে একটা মস্ত শক্ত খাট, তার কাঠামোটা কাঠের, তার উপর এক পাতলা গদি; কিন্তু তা'তে মশারির মধ্যে নিশ্চিন্তমনে ঘুমনো যায়, জন্তুজানোয়ারের ভয় থাকে না। চৌকী নেই। মেঝের উপর সাধারণতঃ মাদুর পাতা; ওরাঁ আমাদের তাই কতকগুলি দিয়েছেন, আর গোটাকয়েক আসবাবও দিয়েছেন; কিন্তু যেরকম ঋতুপরিবর্ত্তন হয়—ভীষণ শুখো ও গরমের পর ভীষণ বর্ষা ও গরম,—তা'তে কাঠ ও জোড়ের বাঁধুনী নড়বড়ে হয়ে যায়। স্নানাগার হচ্ছে শান-বাঁধানো একটি ঘর, তা'তে বড় বড় গামলাভরা জল, একটি নীচু টুল যার উপর লোকে দাঁড়ের মত বসে, আর একটা জলপাত্র, কতকটা আধ-সেরী মাপের মত দেখতে, তাই দিয়ে যত ইচ্ছে গায়ে জল ছিটনো যায়।

আর রান্নাঘরটি যদি দেখ—তার মাটির উনুন, ও ছোট এক টেবিল; যখন আমি সেখানে এক নজর দিতে যাই, দেখি আমাদের চাকরসঙ্ঘ যৎসামান্য বেশে উপুড় হয়ে সব বসে' আছে, আমার বাবুর্চ্চিপ্রবর তার অফুরন্ত রসুইরসায়নের উদ্যোগে তরকারি কুটছে, তার সহকারী বাসন মাজছে, ও ঝাড়ুদার একেবারে তৎপরতার চরম সীমায় উঠেছে।

আমার স্বামী বলেন পঁচিশ বৎসর আগে এই ভাবেই চল্‌ত। জিনিষপত্রের দর চড়েছে, ব্যবস্থাদি সমানই আছে, অথচ এখন আর কিছুই চেনা যায় না; এই ভীত সঙ্কুচিত জাত, যারা সাহেব দেখবামাত্র একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে চিট্‌কে যেত, তারা এখন ধীরভাবে নিজেদের খুসিমত যাচ্ছে আস্‌ছে, বিদেশীর কোন তোয়াক্কাও রাখে না। এখন সেকাল গেছে বইয়া, যখন ষ্টেসনের ঘরের দরজায় লেখা থাক্‌ত,—য়ুরোপীয় মহিলার জন্য, দেশীয় স্ত্রীলোকের জন্য। গত যুদ্ধের সময় যে বড় বড় নীতিসূত্রের অবতারণা করা হয়েছিল,—জাতির অধিকার, ব্যক্তির অধিকার,—সে সব যেন সেকেলে রূপকথার দৈত্যের মত, যাদের একবার ডেকে তুল্লে আর দমানো যায় না।

আমরা সব সেরা সময়টিতে এখানে এসেছি। এখন শীতকাল। দিনের বেলা গরমে গা পুড়ে যায়, সকালসন্ধ্যা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, রাত্রিবেলা চমৎকার। তবুও সকলে যেন ঠাণ্ডালাগার ভয়ে গায়ে কাপড় জড়িয়ে বেড়ায়, এবং খক্‌খক্‌ কাশিও শুনতে পাওয়া যায়। গরীব লোকের কাপড় যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে আনা হয়েছে; মেয়েদের মোটামুটি পরণ হচ্ছে সাড়ি নামক একটি লম্বা কাপড়ের টুক্‌রো, তাই দিয়ে তারা একাধারে সায়া, গা-ঢাকার কাপড় এবং মাথার ঘোমটার কাজ চালিয়ে নেয়। এর চেয়ে সুন্দর মানানসই লজ্জাবস্ত্র আর হতে পারে না। পুরুষেরা এক লম্বা কাপড়কে বেশ চওড়া পাজামার মত করে পরে নেয়, তার উপর একটি লম্বা পিরাণ ঝোলে। যারা বেশী হিসেবী, তারা শেষোক্তের বদলে আমাদের দেশের ভীষণ কামিজ পরে, এবং এই বেশেই আমার ছাত্র,

এখানকার অতি রোগা ও ফ্যাকাসে ফরাসী অধ্যাপক আমার কাছে এসেছিলেন :—খুব চওড়া শাদা পায়জামা, ঔপনিবেশিক খাকি সোলা-টুপি, এবং ছোট একটি কামিজের ঝুল উড়ছে।

শনিবার ১২ই আমরা নিজস্ব সুন্দর বাড়িটিতে উঠে এলুম ; উঁচু একতলা, চারিদিকে একটা বড় বারান্দা ঘুরে গেছে। ছোট এক সিঁড়ি দিয়ে ছাতে যাওয়া যায়, সেখানে শুধু কাক ও পায়রার বাস। কোন প্রতিবেশী নেই, কেবল সূর্য্যদেব আমাদের চারিপাশে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ান। মাথার উপর কোন চাল নেই। হাজার বারোশ' হাত দূরে ইস্কুলের বাড়ীঘর গাছপালা ; তার অর্দ্ধপথে র—দের বাঙ্গলো।

এই অতিশয় শুখনো বাতাসে অনন্ত দিগন্ত এত পরিষ্কার যে, কুড়ি মাইল দূরের পাহাড়ের গড়ন স্পষ্ট দেখা যায়, যদিও তার নাম আমার জানা নেই। এই ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে আমরাই সব চেয়ে কুঁড়ে ; এখানে সকলে সূর্য্যোদয়ের আগেই উঠে ধ্যানধারণায় নিবিষ্ট হয় ; গান দিয়ে দিন আরম্ভ করা হয়, এবং ছাত্রেরা গান দিয়েই দিন শেষ করে।

সি— এরই মধ্যে কাজ সুরু করে' দিয়েছেন ; তিনি এখানকার অধ্যাপক ও কয়েকটি সিংহলী বৌদ্ধ পুরোহিতের মধ্যে মনোমত ছাত্র পেয়ে গিয়েছেন, তাদের দ্বারা কাজ পাবেন বলে' তাঁর ধারণা। প্রতিদিনই সংস্কৃত পড়ানো হয়, এবং প্রতি রবিবারে বৌদ্ধ সাহিত্য, মূল ও টীকা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়, তাতে কলকাতা থেকে ছাত্র এসেও যোগ দেয়।

আমরা এখন মাসকতকের মত এখানে গুছিয়ে বসে' গেছি, ও

সব বেশ ভালোয় ভালোয় চলেছে, কিন্তু য়ুরোপের প্রথম খবর পাবার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে রয়েছি! দু'দিন ধরে' কোন খবরের কাগজ পাই নি। তা' ছাড়া, ভারতবর্ষ নিজের বাইরে শুধু বিলেতকেই জানে; সিংহল থেকে কলকাতা আসবার পথে, বিভিন্ন কাগজে এই একমাত্র ফরাসী তারেরই বারম্বার পুনরাবৃত্তি দেখলুম যে, বীটের চাষে এবার ঘাঁকতি পড়েছে! সৌভাগ্যবশতঃ কেমাল-ফরাসী সন্ধিপত্রের দরুণ আমাদের দেশের কিছু খবর পাওয়া গিয়েছে।

সামাজিক জীবনের গতি এখানে অপ্রতিহত। আমাদের অতিথিশালা, অর্থাৎ আমাদের বারান্দা অভ্যাগতের স্রোতে ভাসমান; পাথরের মূর্ত্তির মত কাপড়পরা মেয়েরা আমাদের সিঁড়ির কয়টি ধাপের নীচে চাপ্‌লি জুতা ছেড়ে রেখে সর্ব্বদাই আসেন, তাঁদের পায়ের তলা লাল রঙ দিয়ে সযত্নে রঙানো, ও তাঁরা এত লাজুক যে মুখ দিয়ে একটি কথা বের করতে সঙ্কোচ বোধ করেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁদের কারো নাম বা কারো মুখ আমার মনে নেই। কাল আমার কাছে একটি এমন মিষ্টি তিন মাসের কচি ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছিল, মোটাসোটা, বড়সড়, চমৎকার; তার মস্ত বড় চোখ কাজল দিয়ে আরও বাড়ানো হয়েছে, ও কপালের মাঝখানে একটি ছোট কাল টীপ আছে। ধাত্রীহিসেবে একটি মিশমিশে কালো জোয়ান ছোঁড়া সাবধানে গাড়ী ঠেলে নিয়ে এসেছে, তার পরণে এক হেঁটো ধুতি।

হিংস্র জন্তু এখনো কেউ দেখা দেয়নি, বড় জোর গোটাকতক ছোট মাকড়শা; বড় বড় মাথাওয়ালা ছোট ছোট টিকটিকি তাদের চূণকামকরা দেওয়ালের উপর বেশ ফূর্ত্তির সঙ্গে শিকার করে' বেড়ায়। আমাদের অনির্ব্বচনীয় জোশেফ বলে সে নাকি বাড়ীর

ঠিক কাছেই একটা সাপ দেখেছে,—কোব্‌রা অবশ্যই! ছোঁড়াটা বেজায় ফক্কড়।

অবশেষে আজ সকালে ছেলেদের কাছ থেকে চিঠি পাওয়া গেল। চারটি ছোট মেয়ে ও একটি ছেলে সে চিঠি আমাদের দিয়ে গেল, এবং কবিবরের নূতনতম গান শুনিয়ে গেল। কাল সন্ধ্যায় পূর্ণিমা-সম্মিলনীতে আমাদের সকলের কাছে তার প্রথম শুনানি হয়ে গেছে। এখানে বেশ বোঝা যায়, কেন এই সব ঐন্দ্রজালিক সন্ধ্যা উপলক্ষ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৭টা আন্দাজ আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎবাসী সকলে রাত্রির বিশাল আকাশের তলায় সমবেত হয়েছিল,—প্রাচ্য দেশের লোকেই যথার্থ জানে কি রকম করে' বস্‌লে সভা সাজে; চাঁদের সোনালী আলোয় আকাশ অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কবিবর ও সঙ্গীতাধ্যাপক (তাঁর নাতি, বৃহদাকার মনোভিরাম দিনু) গান করলেন, ছেলের দলও তা'তে যোগ দিলে। আমার মনে হতে লাগ্‌ল যে, আমাদের তরুণের দল প্রকৃতির বহু দূরে থেকে মানুষ হয়।

আজ সন্ধ্যাবেলা মেয়েরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁদের বলতে হবে যুদ্ধের সময় আমাদের মেয়েরা কি কাজ করেছে,—অথচ আমার ইংরিজীর অবস্থা তদ্রূপ শোচনীয়!

দুটি কথা।

—:•:—

আছে মনে ?

সেইদিন যে কেমনে

দুটি মম কথা—'মোর ভিজে বনফুল'—

কিশোরী হৃদয়ে তব দিয়েছিল দুল।

সেই শ্রাবণ দিনের ঝর ঝর বরিষণে

মনে হয়েছিল যেন তরুলতা আনমনে,

কাতর পল্লবে

দাঁড়ায়েছে কেমন নীরবে।

স্বপ্নসম, দ্রুত মৃদুপায়,

সিক্ত বেশে এলে মম আঙিনায়।

প্রেমের বিদ্যুৎ হানি'

থমকি' দাঁড়ালে, ওগো মম বর্ষারাণী!

মুক্ত তব এলো চুল

নিজ গৌরবে ব্যাকুল,

কোন্ ভুলে,

ক্লান্ত ঝঞ্ঝাহত

পথভোলা বিহঙ্গদলের মত

নিরুপায় ছিল দুলে' দুল ?

তব রূপে চঞ্চল আকুল,
রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম শুধু—'মোর ভিজে বনফুল।'

বৃন্তহীন তাহাতে উঠিল ফুটি'
লজ্জার গোলাপ দুটি
নবরাগে কম্প্র তব নত আঁখিতলে,
একপলে।
মনে আছে?
ধীরে ধীরে, হে প্রেমচালিতা, এলে কাছে,
দ্বিধায় রাখিলে তুমি আমার হাতের পর
পদ্মদললঘু তব শশিপাণ্ডু কর।

২১ ফাল্গুন, ১৩৩২। জাহাঙ্গীর বকিল।



নবম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

রায়তের কথা।



আমার লেখা "রায়তের কথা" যখন সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেতে। এই কারণে সে প্রবন্ধটি সেকালে তাঁর চোখে পড়ে নি। সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধে সেটি পড়ে, এ বিষয়ে তাঁর মতামত সম্বলিত একখানি চব্বিশপাতা চিঠি আমাকে লেখেন। এ পত্র অবশ্য লেখা হয়েছে ছাপবার জন্য। সেই সঙ্গে তিনি আমাকে যে অপর একখানি পত্র লেখেন, তাতে তিনি পত্রখানি প্রথমে ভারতীতে যেন ছাপা হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়মত "রায়তের কথা" সম্বন্ধে পত্রখানি আমি ভারতী সম্পাদিকার হস্তে ন্যস্ত করি। কিন্তু সে চিঠিখানি ভারতীতে ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে;—পত্র প্রবন্ধের রূপ ধারণ করেছে। আমি পত্রের "তুমি" না থেকে প্রবন্ধের "সে" হয়ে গিয়েছি; ভাষান্তরে পত্রের মধ্যম পুরুষ প্রবন্ধের উত্তম পুরুষ হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য এই সামান্য পরিবর্ত্তনে রবীন্দ্রনাথের কথার চেহারা ফিরে গিয়েছে, যা ছিল সম্বোধন তা হয়ে উঠেছে জনান্তিকে। এই কারণে আমি ভারতীর উত্তমকে আবার রবীন্দ্রনাথের মধ্যমে পরিণত করে তাঁর পত্রখানি স্বরূপে প্রকাশ করছি।

এ লেখা "টীকাসমেত" সবুজ পত্রে প্রকাশ করবার অনুমতি না চাইতেই রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়েছেন। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে আমি তাঁর পত্রের স্বরচিত পাদটীকাও এই সঙ্গে প্রকাশ করছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

রায়তের কথা।

শ্রীমান্ প্রমথ নাথ চৌধুরী,
কল্যাণীয়েষু।

আমাদের শাস্ত্রে বলে সংসারটা ঊর্দ্ধমূল অবাঙশাখ। উপরের দিক থেকে এর সুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলচে। তোমার "রায়তের কথা" প'ড়ে আমার মনে হ'লো যে আমাদের পলিটিক্সও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল এই জিনিষটি শিকড় মেলেছে উপর-ওয়ালাদের উপর-মহলে,—কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই ঊর্দ্ধলোকে।

যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্স। সেই পলিটিক্সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা;—কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলী, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত, তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্চে মরচে, চাষ করচে, কাপড় বুনচে, নিজের রক্তে মাংসে সর্ব্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্চে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হ'ন, মন্দির-প্রাঙ্গনের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করচে, মাতৃভাষায় কাঁদচে, হাস্‌চে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত ক'রে বল্‌চে, "অদৃষ্ট"! দেশের সেই পোলিটিশান্ আর দেশের সর্ব্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্স্ আজ মুখ ফিরিয়েচে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছে থেকে মুখ ফেরায়। বল্‌চে "কালোমেঘ আর হেরব না গো দূতী"। তখন ছিল পূর্ব্বরাগ ও অভিসার, এখন চল্‌চে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয়নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম "চাই" আজ তেমনি জোরেই বলচি "চাইনে"। সেই সঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাসী জন-সাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু "চাইনে, চাইনে" বলবার হুহুঙ্কারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু "চাই" জুড়ি, তার আওয়াজ বড় মিহী। যে অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি, ভদ্রসমাজের পোলিটিক্যাল বারোয়ারী জমিয়ে তুল্‌তেই তা ফুরিয়ে যায়, তারপরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের সুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশ-প্রেমের চর্চ্চা করেচি—দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চ্চার অর্থ যাঁরা জোগান, তাঁদের কারো বা আছে জমিদারী, কারো বা আছে কারখানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান, তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই, অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি, সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন—কী শব্দ-সম্বলে, কী অর্থ-সম্বলে। যদি দেওয়ানী অবাধ্যতা চলত, তাহলে তাদের ডাকতে হত বটে,—সে কেবল খাজনা বন্ধ ক'রে মরবার জন্যে; আর যাদের অন্ন-ভক্ষ্য ধনুর্গুণ, তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ ক'রে হরতাল করবার জন্যে, উপর-ওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিকাল বাঁকা ভঙ্গীটাকে অত্যন্ত তেড়া ক'রে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতবীই থেকে যায়। আগে পাতা হোক্ সিংহাসন, গড়া হোক্ মুকুট, খাড়া হোক্ রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার পরুক কোপ্‌নি,—তারপর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ দেশের পলিটিক্স্

আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই সুরুতেই পলিটিক্সের সাজ ফরমাসের ধুম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে ছেঁটে বদ্‌লে জুড়ে যে-সাজ বানিয়েছে, ঠিক সেই নমুনাটা দরজির দোকানে চালান্ করলেই হবে। সাজের নামও জানি, একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সদ্য মুখস্থ, কেন না আমাদের কারখানা-ঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লামেণ্ট, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি ; এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি ; কেন না গায়ের মাপ নেবার জন্য মানুষকে সামনে রাখবার কথাই একেবারেই নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্যেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তারপরে স্বরাজ যাদের জন্যে। তারা পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের প্রকৃতি, শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্ত্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে তুলেচে, জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারীতে আগে স্বরাজ পাব, তারপরে স্বরাজের লোক ডেকে যেমন করে হোক্ সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিশের পেয়াদা আছে, গলায় ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্‌সো, আর আছে ওকালতীর দ্রংষ্ট্রাকরাল সর্ব্বস্বলোলুপ আদালত।

এই সব কারণে আমাদের পলিটিক্‌সে তোমার "রায়তের কথা" স্থানকাল-পাত্রোচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সাম্‌নের দিকে গাড়ি জোৎবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না—শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোৎবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চাও সে দানা পেলে কিনা, ওর দম কতটুকু বাকি। তোমার মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে তোমাকে বলতে পারে,—আগে গাড়ি টানাও, তাহলেই অমুক শুভলগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই ; তারপরে পৌঁছবামাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে যে, ঘোড়াটা সচল না অচল,

বেঁচে আছে না মরেছে। তোমার জানা উচিত ছিল হাল-আমলের পলিটিক্‌সে টাইম্‌টেবল্‌ তৈরী, তোরঙ্গ গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধান কর্ত্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম্‌টেবলের দোষ নয়, ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। তুমি তার্কিক, এত বড় উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চাও,—ঘোড়াটা যে চলে না, বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। তুমি সাবেক ফ্যাসানের সাবধানী মানুষ, আস্তাবলের খবরটা আগে চাও। এদিকে হাল-ফ্যাসানের উৎসাহী মানুষ কোচবাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘসচে ;—ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলচে, অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার গাড়িতে চড়ে বসা। তোমার "রায়তের কথা" সেই ঘোড়ার কথা—যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

(২)

কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বর্ত্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে সুরু করেচেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্চেন। বোঝা যাচ্চে তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজীর পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে, তখনো দেখা যায় সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে—Made in Europe। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজম্‌, কম্যুনিজম, সিণ্ডিক্যালিজম প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তনের পরখ করচে। কিন্তু আমরা যখন বলি রায়তের ভালো করব, তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ব্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক একটী রক্ত-পাতের ধ্বজা। বলচে পিষে ফেলো, দ'লে ফেলো ; অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক্‌। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠী মারলে সে

মরে। এ কেমন, যেন বৌয়ের দল বলচে শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গা-যাত্রা করাও, তাহলেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেরী করে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে ম'লেই ভব-বন্ধন ছেদন করা যায় না,—স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মার-মুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে—তাদের সে তর সয় না। তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্স্ নিয়ে পার্লামেন্টায় রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল করেচে, তার মধ্যে মাট্‌সিনি গারিবালডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাট্যের পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্ম্মুখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরাণীকে বিসর্জ্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এক প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়—এখনকার গান, ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানীং পশ্চিমে বল্‌শেভিজ্‌ম্, ফাসিজ্‌ম্ প্রভৃতি যে সব উদ্যোগ দেখা দিয়েছে, আমরা যে তার কার্য্য-কারণ, তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকল-নিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সব চেয়ে বড় করে দেখতে বসেচে। বরাহ অবতার পঙ্ক-নিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্ত্তমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেই জন্যেই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের

দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্ব্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বল্‌শেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্ব্বে যে ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল, আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডব নৃত্য করা যায়, তাহলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামী। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামী দেখা দেয় —কিন্তু সেই দেখাদেখি পাগলামী চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্‌টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইসারা চলচে—মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্চে বাঙালীর অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেণ্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

(৩)

আমি নিজে জমিদার, এই জন্য হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা'হলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানব-স্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি—অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্ম্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়-বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়ত শিকারের বিষয়-পরিবর্ত্তন হবে, কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে সব উচ্চ অঙ্গের কথা বলে, তাতে বোঝা যায় তাদের "নামে রুচি" আছে; কিন্তু কাল যখন "জীবে দয়া"র দিন আসবে, তখন দেখব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ নামটা হচ্ছে মুখে, আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে-জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তাহলে তা'কে দ'লে ফেললেও সেই

মরাগাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ মাটি বদল হল না তো।

আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারী। এই কারণেই জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাক্‌তে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিষটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না ক'রে, উপার্জ্জন না ক'রে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে ঐশ্বর্য্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস ক'রে তুলি। যারা বীর্য্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা ব'লে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে, "রায়তের কথা"য় পুরাতন দফ্‌তর ঘেঁটে তুমি সেই সুখ-স্বপ্নেও বাদ সাধ্‌তে বসেচ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ রাজ-সরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্চি, রায়তদের বল্‌চি "প্রজা", তারা আমাদের বল্‌চে "রাজা" ;—মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারী ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলামচোর খেলার গোলাম যা'কেই গতিয়ে দিই—তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠ্‌বে। রক্ত-পিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারিনে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে, জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে? জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারি হওয়া উচিত, যে মানুষ বই পড়ে। যে মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয়, বইয়ের সদ্ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু বই যদি পটোলডাঙার দোকানে বিক্রি

করতে কোনো বাধা না থাকে, তাহলে যার বইয়ের শেল্‌ফ্‌ আছে, বুদ্ধি নেই, সে যে বই কিন্‌বে না এমন ব্যবস্থা কি করে করা যায়? সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ্‌ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্‌ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে-ছবি রচনা করে, লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল ক'রে বসে। অধিকার আছে ব'লে নয়—ব্যাঙ্কে টাকা আছে ব'লে। যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে—মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু চিত্রকরের পেটের দায় যতদিন আছে, ছবি যতদিন বাজারে আস্‌তে বাধ্য, ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

(৪)

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়-যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাক্‌বে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-সত্ত্ব হবেই; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চল্‌বে। এম্‌নি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড় বড় বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ৎ আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম আকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি, জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রফা করাতে বাধ্য করেচি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারৎ পাবে কিনা, সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীল চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল, তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েচে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাক্‌ত, তা হ'লে নীলের বন্যায় রায়তী জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশঃ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তাহলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মৎলব এদের কারো মাথায় যে কোনো দিন আসে নি, তা মনে কর্‌বার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ে এরা আজ নিযুক্ত আছে, তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্চে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো? মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধন স্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে, তাদের মত ভয়ঙ্কর জীব আর নেই। রায়ৎখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্ব্বনেশে, তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে-প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হ'তে হ'তে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে সয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছ্‌রূপ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সঙ্কোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠ্‌তে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড় বড় ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্ব্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ৎ ক্রমেই জমিদার হয়ে উঠ্‌তে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়ীতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে, অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্ত-সীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে

তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জ্জন-গর্জ্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোট মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায়; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে—এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ৎ।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের করে নেওয়াই মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে, সেই আঘাতের দ্বারাই উল্টিয়ে মারা ওকালতী-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড় বড় পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ৎ যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে, ততদিন "উচল" আইনও তার পক্ষে "অগাধ জলে" পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। একদিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু তত বড় স্বাধীনতার অধিকার তারই, যার শিশু-বুদ্ধি নয়। যে রাস্তায় সর্ব্বদা মোটর চলাচল হয়, সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম—কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই, তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়ৎদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকী থাকবে? তোমার লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম।

(৫)

আমি জানি জমিদার নির্ব্বোধ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে, জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশী আটক পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সঙ্কীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও

তেমনি, কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে জমিদারের লোক্সান আছে বলে আনন্দ করবার কোন হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশী কড়া,—যদি তাও না মানো এটা মানতে হবে, সেটা আরেকটা উপরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজ-সরকারের সঙ্গে দেনা পাওনায় জমিদারের রাজস্ব বৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতি স্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক উৎসাহে জমির উন্নতি সাধন সম্বন্ধে একটা মস্ত বাধা; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছকাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এসব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি, তা জীবন-যাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরখায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে? সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভাল জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানিনে—জবাব তৈরী হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে, নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে; যার জন্যে এত জোড়াতাড়া, সে তত কাল পর্য্যন্ত টিঁকবে কিনা সন্দেহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রায়তের কথা।

(টীকা)

রবীন্দ্রনাথ যে আমার "রায়তের কথার" দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এ আমার পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। আমি এ কথাটি তুলি এই আশায় যে বাঙলার বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সহৃদয় লোকেরা এ কথার বিচার করবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে মহামতি শিক্ষিত সম্প্রদায় আমার কথায় কর্ণপাত করেন নি। ফলে এ বিষয়ে তাঁরা হাঁ না কিছুই বলেন নি। সম্ভবতঃ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, আমি পূর্ব্বে যেমন সাধুভাষা বনাম বাঙ্গলাভাষার মামলা তুলেছিলুম এ ক্ষেত্রেও তেমনি পলিটিকাল সাধু মনোভাবের বিরুদ্ধে পলিটিকাল বাঙলা মনোভাবের মামলা তুলেছি। অতএব এ ক্ষেত্রে চুপ করে যাওয়াই শ্রেয়ঃ, নচেৎ তর্কের চোটে আমি লোকের কান ঝালা পালা করে দেব। আমি যে একজন নাছোড় তার্কিক তার পরিচয় যাঁরা বাঙ্গলা জানেন তাঁরা পূর্ব্বে যথেষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু এ নিরবতার যথার্থ কারণ রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন।

আমারও একটা পলিটিক্স্ আছে, যুগধর্ম্মের প্রভাব আমার মনের উপরও পূর্ণ মাত্রায় প্রভুত্ব করে। কিন্তু আমার পলিটিক্সের প্রস্থান ভূমি হচ্ছে বাঙলার জমি, বিলেতের আকাশ নয়। ফলে ও উড়ো পলিটিক্সের মত বিচিত্র ও চমকপ্রদ নয়। মহাভারতে পড়েছি যে একটি হংস বলেছিলেন যে :—

"তোমাদের সাক্ষাতেই আমি উর্দ্ধগতি, অধোগতি, বেগ-গতি, সমগতি, ধীর-গতি, সম্যকগতি, বক্রগতি, বিচিত্রগতি, সর্ব্বদিকে গতি, পশ্চাদগতি, সুকুমারগতি, প্রচণ্ডগতি, দীর্ঘগতি, মণ্ডলাকারে সমগতি, সর্ব্বদিকে সমগতি, বেগে অবরোহণ, বেগে উর্দ্ধগমন, শোভনগমন, মণ্ডকাকারে অধঃপতন, শোভনভাবে উর্দ্ধগমন, শোভনভাবে অধঃপতন, অনেকের সহিত গমন, পরস্পর ঈর্ষাসহকারে গমন,

পরস্পর স্নেহভাবে গমন, গতাগত, প্রতিগত কাক-সমুচিত বহুতর গতিতে বিচরণ করিব।"

আমি দেশের লোকের কাছে উক্তরূপ বিচিত্র শূন্যলীলা প্রদর্শন করতে অঙ্গীকার কস্মিনকালেও করিনি, কারণ পলিটিকাল পরমহংস হবার শক্তি যে নিজদেহে ধারণ করিনে—এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল, এখনও আছে। আর যে পলিটিক্সের শিকড় দেশের মাটিতে-বদ্ধ সে পলিটিক্‌স্ যে উঁচু নজরের লোকের চোখে পড়্‌বে না, সে ত ধরা কথা।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমার কি এমন কোন মন্ত্রদাতা বন্ধু ছিলেন না যিনি আমাকে এই মেঠো পলিটিক্‌স্ থেকে বিরত করতে পারতেন? বন্ধু ভাগ্যে আমি একেবারে বঞ্চিত নই। আর সকলেই জানেন, বন্ধুমাত্রেই বন্ধুর মন্ত্রী যেমন স্ত্রী মাত্রেই স্বামীর প্রাইভেট টিউটার। তবে যে আমার বন্ধুবর্গ আমাকে পলিটিক্সের বহুজনসেবিত শূণ্যমার্গ অবলম্বন করতে পরামর্শ দেন নি, তার কারণ, তাঁরা জানেন যে আমি পলিটিসিয়ান নই, সাহিত্যিক। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে লোকের মুখে লাগাম দেওয়া চলে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়। আর সাহিত্যিককে সামাজিক করবার চেষ্টা যেমন বৃথা তেমনি অনর্থক।—দেশের সাহিত্যিকরা যদি সব পলিটিসিয়ান হয়ে ওঠে, তাহলে পাল্টা জবাব দেবার জন্য সব পলিটিসিয়ান রাতারাতি সাহিত্যিক হয়ে উঠবে। ফলে মনোরাজ্যে কি ভীষণ অরাজকতা ঘটবে তা ভাবতে গেলেও আতঙ্ক হয়। পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু যদি কাব্য লিখতে সুরু করেন আর মৌলানা মহম্মদ আলি দর্শন, আর আমরা তা পড়তে বাধ্য হই, তাহলে কোন সাহিত্যিক না বানপ্রস্থ অবলম্বন করবার জন্য ছট্‌ফট্ করবে। এই সব কারণে আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা আমার মুখে হাত দিতে চেষ্টা করেন নি। "যার কর্ম্ম তারে সাজে"—এ জ্ঞান তাঁদের ছিল। আসল কথা হচ্ছে সাহিত্যিকের পলিটিক্‌স্ একেলেও নয় সেকেলেও নয় তেকেলে'। সুতরাং তা একালের সঙ্গেও খাপে খাপে মিলে যাবে না সেকালের সঙ্গেও নয়, অথচ ও দুকালের সঙ্গেই তার যোগাযোগ আছে।

(২)

আজকাল এমন কোনও কথা বলবার যো নেই, আর পাঁচজনে যাকে একটা ismমেরই ভিতর টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা না করবেন। তা যদি না করেন, তাহলে তাঁরা যে শিক্ষিত তা কি করে প্রমাণ হয়? আমি যে ism নাস্তিক তার পরিচয় বোধ হয় আমার রায়তের কথার পত্রে পত্রে পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথও সোশ্যালিজম, কমুনিজম, সিনডিকালিজম প্রভৃতি কথায় ভয় পান এবং কেন ভয় পান সে কথা তিনি তাঁর পত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। ও সব ধর্ম্ম ভারতবর্ষের নয়। কেন যে নয়, সংক্ষেপে তা বলছি।

কালী, তারা, মহাবিদ্যা প্রভৃতি যেমন একই আদ্যাশক্তির বিভিন্নমূর্ত্তি—সোশ্যালিজম, কমুনিজম, সিণ্ডিকালিজম প্রভৃতিও Capitalism-এরই বিভিন্ন মূর্ত্তি। এ কথা এতই সত্য যে স্বয়ং লেনিন কমুনিজম ওরফে বলসেভিজমের নাম দিয়েছেন State Capitalism.

এই Capitalism জিনিষটে কি? ওর জন্ম হয়েছে industrialism থেকে। যতদিন ইউরোপে industrialism থাকবে ততদিন Capitalism-ও থাকবে, বদল হবে সুধু ওর নামরূপে।

এর থেকে প্রমাণ হয় যে, যেদেশে industrialism নেই সে দেশে সোশ্যালিজম, কমুনিজম, সিণ্ডিকালিজম প্রভৃতি, যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথার সামিল। এ জাতীয় শিরঃপীড়ায় লোক অবশ্য ভীষণ আর্ত্তনাদ করতে পারে যেমন খালিফের অভাবে খিলাফৎ করছে, কিন্তু সে চীৎকার ধ্বনিতে সহজ লোকের কান্না না পেয়ে হাসি পায়।

আমাদের দেশে এই রায়তের সমস্যাটা হচ্ছে non-industrial-সমাজের সমস্যা। এ বিষয়ে Bertrand Russel-এর কটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। রাসেলের তুল্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইউরোপের পলিটিক্সের ভাব-রাজ্যে আর দ্বিতীয় নেই, সুতরাং তাঁর কথা শোনা যাক্।

"In a non-industrial community, liberal ideals, if they could be carried out, would lead to a division of the national wealth between peasant proprietors, handicraftsmen and merchants. Such a society exists at this day in China, except in so far as it is interfered with by foreign capitalists and native military commanders. The latter revert to the right of the sword, the former introduce fragments of modern industrialism."

(Prospects of Industrial Civilization, p. 55.)

বলা বাহুল্য যে ইকনমিকালি ভারতবর্ষ ও চীন সমবস্থ। আমি "রায়তের কথায়" বাঙলার রায়তরা যাতে peasant proprietor হয়ে উঠতে পারে সেই প্রস্তাবই করেছি। এতে শুধু প্রজার নয় সমাজেরও মঙ্গল হবে। আমি রায়তের পক্ষ থেকে যে সব ছোট খাটো অধিকারের দাবী করেছি সে সব অধিকার লাভ করলে বাঙলার রায়তের দল peasant proprietorship-য়ের দিকে আর একটু অগ্রসর হবে। চীনের রায়তের অপেক্ষা বাঙলার রায়তের অবস্থা এক বিষয়ে ভাল। আমাদের দেশে কোনও native military commanders নেই যারা তরবারীর সাহায্যে রায়তের সত্ব অপহরণ করতে পারে। Foreign Capitalist অবশ্য দুই দেশেই আছে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববঙ্গে একদল রায়ত-বন্ধুর সন্ধান পেয়েছেন যারা নাকি শুধু দ'লে ফেলবার পিষে ফেলবার, পক্ষপাতী। পৃথিবীতে যে মতই প্রচার করা যাক না, লোকে তা নিজের বুদ্ধি ও চরিত্র অনুসারে অঙ্গীকার করবে। এবং এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীতে বহু নির্ব্বোধ লোক আছে এবং নির্ব্বুদ্ধিতার সঙ্গে দুষ্টবুদ্ধির সদ্ভাবও অনেক ক্ষেত্রে মেলে। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়ের উপসর্গ জুড়ে দিতে অনেকে লালায়িত। এর জন্য মানুষে দুঃখ করতে পারে, কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে না। ধর্ম্মের অর্থ যে অনেকের কাছে বিদ্বেষ বুদ্ধি

তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার জন্য অবশ্য ধর্ম্ম দায়ী নয়। আর যেখানে মামলা হচ্ছে ধর্ম্মের নয় অর্থের—সেখানে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুর স্ফূর্ত্তি ত হবেই। সে যাই হোক "রায়তের কথা" যে riotএর কথা নয় তা বোঝবার মত ভাষাজ্ঞান আশা করি অধিকাংশ পাঠকেরই আছে।

(৩)

রায়তকে তার দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট জোত হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ আছে। তাই তিনি হস্তান্তর করবার পক্ষে আমার কি বলবার আছে তা শুনতে চেয়েছেন। "রায়তের কথায়" এ বিষয়ে আমি কোনও আলোচনা করি নি। এই মাত্র বলেছিলুম যে, এ ব্যাপারের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব কথা বলবার আছে সে সব কথা আর যার মুখেই শোভা পাক্ বাঙলার অধিকাংশ জমিদারের মুখে শোভা পায় না। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা যা দেখেন, তা প্রজার হিতাহিত নয়—দেখেন শুধু দাখিল-খারিজের নজরের তারতম্য। যে ব্যাপারে নিজের পকেট ভারি হয় তাতে যে অপরেরও হিত হয় এ রকম মনে করায় বিশেষ আরাম আছে। পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ঐ রকম বিশ্বাসের প্রতি মানুষের মন সহজেই অনুকূল।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে, মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কি করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি, কেন না তাঁর জমিদারী সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্ত্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে সেখদের বাঁচানো।—কিন্তু সেই সঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে, বাঙলার জমিদার মাত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্র-নাথ কবি হিসেবেও যেমন জমিদার হিসেবেও তেমনি Unique. আমি সেই সব জমিদারের কথা বলেছি, যাঁরা শতকরা নিরনব্বই।

আমরা হাজার স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও যেমন শিশুকে সকল বিষয়ে সমান স্বাধীনতা দিতে নারাজ তার ভালর জন্য, তেমনি বাঙলার রায়তকে

তার নিজের সর্ব্বনাশ করবার স্বাধীনতা দিতেও নারাজ হতে পারি; রায়ত বেচারার ভালর জন্য। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার মতভেদ নাই। আমি অনেক বিষয়েই liberal অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও সকল লোককে, কথায়, কাজে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ যে তাকে অমানুষ করা এ জ্ঞান আমারও আছে। বিলেতে যখন অবাধ মদ্যপানকে আইনত সবাধ করবার প্রস্তাব ওঠে তখন জনৈক liberal বলেছিলেন যে I would rather have England free than England sober. আমার liberalism অবশ্য অতদূর উচুতে ওঠে না। Drink স্বাধীনতার উপর যদি হস্তক্ষেপ করা না যায় ত, তা sober স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবে। প্রবৃত্তির অধীনতাকে যে অনেকে ইচ্ছার স্বাধীনতা মনে করেন, তার পরিচয় ত নিত্যই পাওয়া যায়।

তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, শিশু ছাড়া আর কারও শৈশব আমার কাছে প্রীতিকর নয়। এক হাত পরিমাণে ছেলেকে কোলে করতে সকলেরই লোভ যায় কিন্তু সেই মাপের প্রাপ্তবয়স্ক লোককে অর্থাৎ বামনকে অঙ্কস্থ করতে সহজ মানুষে সহজেই নারাজ হয়। অনেক লোক যাদের আমরা শিশু বলি তারা মনোজগতে বামন ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনও দেশে বেশির ভাগ লোক এই জাতীয় হয়, তাহলে সেটা অবশ্য এতটা দুঃখের বিষয় যে, কি করে তাদের আবার মানুষ করা যায় সেইটিই হচ্ছে আসল ভাবনার কথা। এ দেশে রায়তের দল, উক্ত হিসেবে বাস্তবিকই শিশু,—কিন্তু এই শিশু-দের কি করে মানুষ করতে হবে সেটা একটা মস্ত সমস্যা, তবে আমি যে সমস্যা তুলেছি তার থেকে পৃথক সমস্যা।

আমি অবাধ হস্তান্তরের পক্ষপাতী এই কারণে যে হস্তান্তর করবার অধিকার হচ্ছে ইংরাজীতে যাকে বলে একটা proprietary right এবং সে right আমার মতে যে জমি চষে তার থাকা উচিত। সে চাষী ক অথবা খ তাতে কিছু যায় আসে না। ক জমিদারের স্বত্ব-স্বামীত্ব ক' মিত্র-খ জমিদারের হাতে যাচ্ছে।

এখন যদি কেউ প্রস্তাব করে যে, জমিদারী কেউ হস্তান্তর করতে পারবে না, তাহলে ক চ ট ত প পঞ্চবর্গ জমিদার পঞ্চমুখে তার প্রতিবাদ করবেন মানব চরিত্র এই যে কোনরূপ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে কোন বিশেষ লোককে চিরকাল বেঁধে রাখা যাবে না। লক্ষীর সঙ্গে মানুষের এমন বিবাহ হতে পারে না যার আর divorce নেই। ইউরোপে মধ্যযুগে মানুষ-নামক জঙ্গমজীবকে সেকালের ভূম্যাধিকারীরা তাঁদের জমিতে শিকড় গেড়ে গাছের মত স্থাবরজীব হতে বাধ্য করেছিলেন, এ ব্যবস্থার নাম serfdom। একালে আমাদের ও নাম শুনলেই ভয় হয়। অপর পক্ষে ক'র জমি খ'র হাতে যাওয়াটা আমরা বিশেষ দুঃখের কথা মনে করি নে।

তবে কথা হচ্ছে ক'র জোত যদি খ'র হাতে না গিয়ে গ'র হাতে যায়? ক'ও চাষী-প্রজা খও তাই, কিন্তু গ হচ্ছেন তিনি যিনি প্রজা কিন্তু চাষী নন, তিনি যিনি জমি চষেন না, কিন্তু তার উপর-টপকা ফল ভোগ করেন—অর্থাৎ জোতদার। "গ" যখন জমি চষে না, তখন সে তা অবশ্য ঘ'কে দিয়ে চষাবে। এই ঘ হবে তখন একজন কোর্ফা প্রজা অথবা আধিয়ার। ফলে এই নূতন জাতের প্রজার উপর অবশ্য সে জমির পূর্ব্ব মালিক ক'র কোন অধিকারই বর্ত্তাবে না, তার সকল অধিকারের মালিক হবে গ। ফলে এই হস্তান্তরের বলে, ঘ'র জোতে দখলী স্বত্বও থাকবে না, তার হস্তান্তরের অধিকারও থাকবে না। অর্থাৎ আমি জমিদারের অধীনস্থ রায়তকে যে সব স্বত্ব-স্বামীত্ব দিতে চাই জোতদারের অধীনস্থ রায়তের তা কিছুই থাকবে না। ফলে হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই রায়তের সকল স্বত্ব জোতদারের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাবে। আর হস্তান্তরের ফলে বহুজোত যে জোতদার আত্মসাৎ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খরিদ বিক্রীর কথা অবশ্য টাকার কথা। সুতরাং যার টাকা আছে সেই যে জোত খরিদ করবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। জমিদার ও রায়তের ভিতর মহাজনের হবে মধ্যস্বত্ব।

কিন্তু এর উপায় কি? ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছি যে land, labour and capital এই তিনের যোগে ধন সৃষ্টি হয়। কৃষীকর্ম্মের কথাই ধরা যাক।

land বাদ দিয়ে শূন্যে চাষবাস হয় না, labour বাদ দিলে ফসল জন্মায় না, জন্মায় ঘাস, আর সে ঘাসও কাটবার জন্য labour চাই। আর হালবলদ মই বিদে, নিড়ুনি বীচন capital-এর অভাবে এ সব কিছুই জোটে না, আর জোটে না চাষের গরুর ও চাষীর খোরাক্। আজ বীজ বুনে কাল যদি পাকা ধান পাওয়া যেত তাহলে ব্যাপার হয়ত অন্যরূপ হত। বাজীকররা অবশ্য আঁটি পোঁতবার অব্যবহিত পরেই ফজলী আম ফলিয়ে দেয়। এ বিদ্যে মূর্খ চাষীদের জানা নেই। আর তা ছাড়া বাজীর আমে সুধু নয়ন তৃপ্ত হয় উদর তৃপ্ত হয় না। Land, labour এবং capital এ তিনের Co-operation যখন চাইই তখন এই তিনের ভিতর যাতে বিরোধ নয় সামঞ্জস্য ঘটে তারই চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য, —অন্তত ততদিনের জন্য যতদিন সোস্যালিজমের কৃপায় land nationalised এবং কমুনিজমের কৃপায় capital inter-nationalised না হয়ে যায়।

এখন এই মহাজনের হাতে জমি যাওয়ার ফলে মহাজনের অস্থাবর সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়। জমি কেনা বেচার অর্থ এই যে, যে জমি বেচে সে স্থাবর সম্পত্তিকে অস্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে আর যে কেনে সে অস্থাবর সম্পত্তিকে স্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ একই জিনিষ সুধু ভিন্নরূপ ধারণ করে। জমিও capital টাকাও capital, দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে একটি স্থূল ও অচল Capital, আর একটি তরল ও চঞ্চল capital। আর এ পৃথিবীর নিয়মই এই যে স্থূল নিত্য তরলে রূপান্তরিত হচ্ছে—আর তরল নিত্য স্থূলে রূপান্তরিত হচ্ছে।

যদি কেউ বলেন যে, চাষী প্রজা যে জোত হস্তান্তর করে সে দেনার দায়ে আর সেই সূত্রে মহাজন জোতদার হয়ে ওঠে, তাহলে বলি জোত খালি মহাজনের দেনার দায়ে বিক্রী হয় না জমিদারের বাকী খাজানার দায়েও বিক্রী হয় আর তখন তা হয় সম্পূর্ণ নির্দ্দয়রূপে। সুতরাং জমির কেনা বেচা যেমন চলছে তেমনি চলবেই,—মহাজন নামক Capitalist-এর হাত থেকে রায়তী জোত

আইনত রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও জমিদার নামক Capitalist-এর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা যাবে না।

এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি সেই রকম আইন হওয়া উচিত যাতে জমিদারের হাত থেকে জোতদারের হাতে গেলে রায়তের স্বত্ব-স্বামীত্ব খর্ব্ব না হয়। মধ্য-স্বত্বকে খর্ব্ব করাই তার উপায়। কি করে তা করা যাবে তার সন্ধান উকিল বাবুদের কাছে পাওয়া যাবে।

(৪)

রায়তের কাছে জমিদার দেবতা হতে পারে কিন্তু জোতদার ওরফে উপ-জমিদার যে উপ-দেবতা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই উপদেবতার উপদ্রব থেকে রায়তকে যে কি করে বাঁচানো যায় সে বিষয় আমি রায়তের কথায় আলোচনা করি নি,—দু কারণে।

প্রথমতঃ আমি আলোচনাটিকে সরল করবার জন্য রাজা প্রজার সম্বন্ধের বিচার করি, তাই যে ব্যক্তি রাজাও নয় প্রজাও নয় অথচ একাধারে ও দুই তার নাম আর উল্লেখ করিনি। দ্বিতীয়তঃ এ জ্ঞান আমার ছিল যে, জাতিভেদের মত মধ্যস্বত্বের অস্তিত্ব হচ্ছে ভারতবর্ষের সমাজ গঠনের বিশেষত্ব। বিলেতে যেমন middle class প্রবল, এদেশে তেমনি middleman-ই প্রবল, শুধু কৃষীকর্ম্মে নয় সিল্প বাণিজ্যেও। যে ধন সৃষ্টি করে ও যে তা ভোগ করে সে দুই ব্যক্তির ভিতর অসংখ্য middleman আছে। কথায় বলে "যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই"। এই বিরাট নেপোর দলের নাম ভদ্রলোক। সমাজের এ ব্যবস্থা আর যে হিসেবেই আমাদের উন্নতির কারণ হোক্ জাতীয় ধনের হিসেবে আমাদের অবনতির কারণ। আমি নিজে এই ভদ্রশ্রেণীভুক্ত, জাতি হিসেবেও পেশা হিসেবেও, তবুও এ স্পষ্ট সত্যটা অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই ব্যবস্থার সঙ্গে আমার জীবনকে দিব্যি খাপ খাইয়েছি, কিন্তু আমার মনকে তদ্রূপ খাপ খাওয়াতে পারি নি। তাই সমাজ-দেহের রোগের কিসে প্রতিকার হয় সে ভাবনা আমি ভাবতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে, আমি এ রোগের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা দিয়েছি সে হচ্ছে ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে symptomatic treatment। তার ফলে জাতীয় হীনতা দূর হবে না। এ জ্ঞানও আমার ষোল আনা আছে। তবে যে লোকের ছোটখাটো কষ্টের কি করে প্রতিকার হতে পারে সে বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করেছি তার কারণ আয়ুর্ব্বেদে আদেশ আছে, মানুষের গায়ে কাঁটা ফুটলেই যদি পারত তা তুলে দিয়ো, দর্শনের সব গভীর তত্ত্বের মীমাংসা না হওয়াতক্‌ ও কাজ করতে নিরস্ত হয়ো না।

আমাদের সর্ব্ব প্রকার জাতীয় দুর্দ্দশার কারণ হচ্ছে জাতির প্রাণ শক্তির অভাব। এই জীবনমৃত জাতির অন্তরে আবার কি করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় সেইটেই হচ্ছে অবশ্য একমাত্র জিজ্ঞাস্য। চারদিকে যে চেষ্টা হচ্ছে তাতে তা হবে না। কারণ অনেকে যা করছেন তা হচ্ছে বিলেত থেকে আমদানী galvanic battery-র shock প্রদান। ও shock-য়ে মরা জানোয়ার হাত পা ছোঁড়ে কিন্তু বাঁচে না। তবে হবে কিসে? এ বিষয়ে মুক্তি কোন দিকে, সে দিক নির্ণয় আমি করতে পারি—কিন্তু সে পথে কাউকে চালাবার শক্তি আমার নেই। তা ছাড়া ধান ভানতে শিবের গীত গাইতেও আমি সঙ্কুচিত। রায়তের কথা আগাগোড়া কত ধানে কত চাল হয় তারই কথা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কাব্য জিজ্ঞাসা।

(প্রথম প্রস্তাব)

ইহুদী ও খৃষ্টানের ধর্ম্মপুঁথিতে বলে বিধাতাপুরুষ তাঁর আকাঙ্খার বলে দ্যৌঃ পৃথিবী, আলো অন্ধকার, সূর্য্য চন্দ্র সব সৃষ্টি করলেন, এবং সৃষ্টির পর দেখলেন যে সে সৃষ্টি অতি চমৎকার। ঐ পুরাণেই বলে সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষকে তৈরী করেছেন তাঁর প্রতিরূপ করে, আর নিজের নিঃশ্বাস বায়ুতে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ মানুষ যেখানে স্রষ্টা তার সৃষ্টির রহস্য বিশ্বসৃষ্টি রহস্যেরই প্রতিচ্ছায়া; অথবা, যা একই কথা, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ছাড়া সৃষ্টিতত্ত্ব আয়ত্তের আর কোনও চাবী মানুষের হাতে নেই। বাইবেলের বিধাতার মত মানুষ অন্তরাত্মার আকাঙ্খার চালনায় যা সৃষ্টি করে, তার চমৎকারিত্ব তার নিজেকেই বিস্মিত করে দেয়। বাহিরের বিশ্বের স্বরূপ ও সৃষ্টি কৌশল আবিষ্কারে যেমন মানুষের বুদ্ধির বিরাম নেই, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ও কৌশলের জ্ঞানেও তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। কেন না সে সৃষ্টিও মানুষের বুদ্ধির কাছে বাহিরের বিশ্বের মতই রহস্যময়।

রামায়ণে কাব্যের জন্ম কথার যে কাব্যেতিহাস আছে তাতে মানুষের সৃষ্টির এই তত্ত্বই কাব্য সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ক্রৌঞ্চ-দ্বন্দ্ব বিয়োগের শোকে যখন বাল্মিকীর মুখ থেকে "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" ইত্যাদি বাক্য আপনি উৎসারিত হল তখন—

তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
শোকার্ত্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া॥

বীক্ষণশীল মুনির হৃদয়ে চিন্তার উদয় হল শকুনির শোকে শোকার্ত্ত হয়ে এই যে আমি উচ্চারণ করলেম এ কি! তখন নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি এর প্রকৃতি চিন্তা করতে লাগ্‌লেন,

চিন্তয়ন্স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্মতিম্।

এবং শিষ্যকে বল্‌লেন—

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমতন্ত্রী লয় সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

এই বাক্য পাদবদ্ধ, এর প্রতি পদে সমাক্ষর, ছন্দের তন্ত্রী লয়ে এ আন্দোলিত; আমি শোকার্ত্ত হয়ে একে উচ্চারণ করেছি, এর নাম শ্লোক হোক।

রামায়ণকার আদি কবির মুখ দিয়ে যে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন সেটি কাব্য রসিক মানব মনের সাধারণ কৌতূহল। মহাকবিদের প্রতিভা এই যে অপূর্ব্ব মনোহর শব্দ গ্রন্থনের সৃষ্টি করে "কিমিদং"—এ কি বস্তু? এর স্বরূপ কি? তার উত্তরে যে আলোচনার উৎপত্তি আমাদের দেশের প্রাচীনেরা তার নাম দিয়েছেন অলঙ্কার শাস্ত্র। সে শাস্ত্রের প্রধান কথা কাব্য জিজ্ঞাসা। কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়? কোন গুণে বাক্য ও সন্দর্ভ কাব্য হয়? আলঙ্কারিকদের ভাষায় কাব্যের আত্মা কি?

কাব্যের আত্মা যা-ই হোক, ওর শরীর হচ্ছে বাক্য—অর্থযুক্ত পদ সমুচ্চয়। সুতরাং কাব্য দর্শনে যাঁরা দেহাত্মবাদী তাঁরা বলেন ঐ বাক্য অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ ছাড়া কাব্যের আর স্বতন্ত্র আত্মা নেই। বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে, সাজ সজ্জায় সাজিয়ে

দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজ সজ্জার নাম অলঙ্কার। শব্দকে অলঙ্কারে, যেমন অনুপ্রাসে, সাজিয়ে সুন্দর করা যায়; অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলঙ্কারে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয় সে এই অলঙ্কারের জন্য। "কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ" (বামন)। এ মতকে বালকোচিত বলে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্য জিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলঙ্কার শাস্ত্র। এবং যেমন অধিকাংশ লোক মতে না হলেও কাজে লোকায়ত মতের অনুবর্ত্তী, দেহ ছাড়া যে মানুষের আর কিছু আছে তাদের জীবনযাত্রা তার কোনও প্রমাণ দেয় না, তেমনি মুখের মতামত ছেড়ে যদি অন্তরের কথা ধরা যায় তবে দেখা যাবে অধিকাংশ কাব্য-পাঠক কাব্য-বিচারে এই দেহাত্মবাদী। তাদের কাব্যের আস্বাদন শব্দ ও অর্থের অলঙ্কারের আস্বাদন। এবং সেই জন্য অনেক লেখক, যাদের রচনা অলঙ্কৃত বাক্য ছাড়া আর কিছু নয়, তারা পৃথিবীর সব দেশে কবি পদবী লাভ করেছে।

অলঙ্কারবাদীদের সমালোচনায় অন্য আলঙ্কারিকেরা বলেছেন কাব্য যে অলঙ্কৃত বাক্য নয় তার প্রমাণ শব্দ ও অর্থ দু রকম অলঙ্কারই আছে অথচ বাক্যটি কাব্য নয় এর বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, আবার সর্ব্বসম্মতিতে যা অতি শ্রেষ্ঠ কাব্য তার কোনও অলঙ্কার নেই এরও উদাহরণ আছে। অর্থাৎ সমালোচকদের ন্যায়ের ভাষায় কাব্যের ওসংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দুই দোষেই দুষ্ট। যেমন "সাহিত্য-দর্পণের" একজন টীকাকার উদাহরণ দিয়েছেন—

তরঙ্গনিকরোন্নীত তরুণীগণ সংকুলা।
সরিদ্বহতি কল্লোলবাহব্যাহততীরভূঃ॥

এ বাক্যের শব্দে ও অর্থে অনুপ্রাস ও রূপক অলঙ্কার রয়েছে, কিন্তু একে কেউ কাব্য বল্‌বে না। বাক্য অনলঙ্কৃত অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্য এর উদাহরণে 'সাহিত্য দর্পণ'কার কুমার সম্ভবের অকালবসন্তবর্ণনা থেকে তুলেছেন।

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌপ্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

এর এখানে ওখানে যে একটু অনুপ্রাসের আমেজ আছে "তরঙ্গ নিকরোন্নীত তরুণীগণের" কাছে তা দাঁড়াতেই পারে না, আর এর অর্থ একবারে নিরলঙ্কার। অকাল বসন্তের উদ্দীপনায় যৌবনরাগে রক্ত বনস্থলীতে রতি দ্বিতীয় মদনের সমাগমে, তির্য্যকপ্রাণিদের অনুরাগের লীলাটি মাত্র কালিদাস ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাকে কোনও অলঙ্কারে সাজান নি। অথচ মনোহারিত্বে পাঠকের মনকে এ লুঠ করে নেয়। অলঙ্কারবাদিরা বল্‌বেন এখানেও অলঙ্কার রয়েছে, যার নাম স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। প্রতিপক্ষ উত্তরে বল্‌বেন ঐ নামেই প্রমাণ অলঙ্কার ছাড়াও কাব্য হয়। কারণ, যেখানে ক্রিয়া ও রূপের অকৃত্রিম বর্ণনাই কাব্য সেখানে নেহাৎ মতের খাতিরে ছাড়া সেই বর্ণনাকেই আবার অলঙ্কার বলা চলে না।

অলঙ্কারবাদকে একটু শুধ্‌রে নিয়ে আর একদল আলঙ্কারিক বলেন অলঙ্কৃত বাক্য মাত্রেই যে কাব্য নয়, আর নিরলঙ্কার বাক্যও যে কাব্য হতে পারে তার কারণ কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'রীতি'। "রীতিরাত্মা কাব্যস্য," (বামন, ২।৬)। "রীতি" হ'ল পদ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী। "বিশিষ্টা পদ রচনা রীতিঃ," (বামন ২।৭)। অর্থাৎ

কাব্যের আত্মা হ'ল তার 'ষ্টাইল'। 'ষ্টাইলের' গুণেই বাক্য বা সন্দর্ভ কাব্য হয়, আর তার অভাবে বক্তব্য বিষয়ের সমতা থাক্‌লেও অন্য বাক্য কাব্য হয় না। স্বীকার করতে হবে পৃথিবীর অনেক কবির কাব্য এই গুণেই লোকরঞ্জক হয়েছে। ভারতচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ তাঁর 'ষ্টাইল'। ইউরোপের অনেক আধুনিক পদ্য ও গদ্য লেখক এই 'ষ্টাইলের' গুণে বা নবীনত্বে 'আর্টিষ্ট' বা কবি নাম পেয়েছেন। অলঙ্কার হচ্ছে এই 'ষ্টাইল' বা 'রীতির' আনুসঙ্গিক বস্তু। অঙ্গে অলঙ্কার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তার অবয়ব-সংস্থান নির্দ্দোষ হয়। 'ষ্টাইল' হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়বসংস্থান।

রীতিবাদের দোষ দেখিয়ে অন্য আলঙ্কারিকেরা বলেন নির্দ্দোষ অবয়বে ভূষণযোগ করলেই সৌন্দর্য্য আসে না, শরীরেও নয়, কাব্যেও নয়।

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবিনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥"
(ধ্বন্যালোক, ১।৪)

"রমণী দেহের লাবণ্য যেমন অবয়বসংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিষ, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গী এ সবার অতিরিক্ত আরও কিছু।" এই 'অতিরিক্ত বস্তুই' কাব্যের আত্মা।

এ 'বস্তু' কি? উত্তরে বস্তুবাদী আলঙ্কারিকেরা বলেন এ জিনিষটি হচ্ছে কাব্যের বাচ্য বা বক্তব্য। "তরঙ্গনিকরোন্নীত" ইত্যাদি যে কাব্য নয় তার কারণ ওর বাচ্য কিছুই নয়, ওর বক্তব্য বিষয় অকিঞ্চিৎকর। অন্য বাক্যের মত কাব্যও পদসমুচ্চয় দিয়ে, শব্দের

সঙ্গে শব্দ সাজিয়ে, কোনও বস্তু বা ভাবকে প্রকাশ করে। কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে ঐ বস্তু বা ভাবের বিশিষ্টতার উপর। সব বস্তু কি সব ভাব কাব্যের বিষয় নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের বস্তু, ও বিশেষ বিশেষ রকমের ভাবকে প্রকাশ করলেই তবে বাক্য কাব্য হয়। যেমন ভাব কি বস্তুর মনোহারিত্ব, চমৎকারিত্ব বা অভিনবত্ব বাক্যকে কাব্য করে। অনেক বস্তু আছে যা স্বভাবতই মনোহারী, "চন্দ্রচন্দনকোকিলালাপভ্রমরঝঙ্কারাদয়ঃ"। অনেক ভাব, যেমন প্রেম, করুণা, বীর্য্য, মহত্ব মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। কবিরা এই সব বিশিষ্ট ভাব ও বস্তুকে কাব্যে প্রকাশ করেন। এবং তাদের বিশিষ্ট পদ রচনা ভঙ্গী, শব্দ ও অর্থে যথোচিত অলঙ্কারের সমাবেশ, তাদের বাচ্য ভাব ও বস্তুকে অধিকতর মনোজ্ঞ করে তোলে। ভাব, বস্তু, রীতি ও অলঙ্কার এদের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি। এ সবার অতিরিক্ত কাব্যের আত্মা বলে' আর ধর্ম্মান্তর নেই। যেমন বার্হস্পত্যেরা বলেছেন রক্ত, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি উপাদানের সংমিশ্রণেই মানবদেহে চেতনার আবির্ভাব হয়; মন নামে কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নেই।

যে সব আলঙ্কারিক বস্তু-বাদিদের মতে মত দিতে পারেন নাই, তাদেরও স্বীকার করতে হয়েছে অধিকাংশ কবির কাব্য এই ভাব, বস্তু, রীতি ও অলঙ্কারের গুণেই কাব্য। এমন কি মহাকবিদের কাব্য প্রবন্ধেরও অনেকাংশে এ ছাড়া আর কিছু নেই। তবে তাঁদের ভাব ও বস্তুর চমৎকারিত্ব হয়তো বেশী, তাঁদের রচনা ও প্রকাশভঙ্গী আরও বিচিত্র, তাঁদের অলঙ্কার অধিকতর সঙ্গত ও শোভন। কিন্তু তবুও যে এই আলঙ্কারিকেরা কাব্য বিচারে এখানেই থামতে পারেন

নি তার কারণ তাঁরা দেখেছেন যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। শব্দার্থ মাত্রে যেটুকু প্রকাশ হয় সেই কথা—বস্তু কাব্যের প্রধান কথা নয়। তা যদি হ'ত তবে যার শব্দার্থের জ্ঞান আছে তারই কাব্যের আস্বাদন হ'ত, কিন্তু তা হয় না।

"শব্দার্থ শাসন জ্ঞানমাত্রে নৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে স হি কাব্যার্থ তত্ত্বজ্ঞৈরেব কেমলম্॥"

(ধ্বন্যালোক, ১।৭)

"কাব্যের যা সার অর্থ কেবল শব্দার্থের জ্ঞানে তার জ্ঞান হয় না, একমাত্র কাব্যার্থ তত্ত্বজ্ঞেরাই সে অর্থ জান্‌তে পারেন"। "যদি চ বাচ্যরূপ এবাসাবর্থঃ স্যাৎ তদ্বাচ্য-বাচক-স্বরূপপরিজ্ঞানাদেব তৎ প্রতীতিঃ স্যাৎ—কাব্যার্থ যদি কেবল বাচ্যরূপ হ'ত, তবে বাচ্য-বাচকের স্বরূপ জ্ঞানেই কাব্যার্থের প্রতীতি হত"। "অথচ বাচ্য-বাচক রূপলক্ষণকৃতশ্রমাণাং কাব্যতত্ত্বার্থভাবনাবিমুখানাং স্বরশ্রুত্যাদি-লক্ষণমিব প্রগীতানাং গান্ধর্বলক্ষণবিদামগোচর এবাসাবর্থঃ—অথচ দেখা যায় কেবল বাচ্য-বাচক লক্ষণের জ্ঞান লাভেই যারা শ্রম করেছে, কিন্তু বাচ্যাতিরিক্ত কাব্যতত্ত্বের আস্বাদনে বিমুখ, প্রকৃত কাব্যার্থ তাদের অগোচর থাকে; যেমন গানের লক্ষণমাত্র যারা জানে তাদেরই সঙ্গীতের সুর ও শ্রুতির অনুভূতি হয় না" (ধ্বন্যালোক, ১।৭, বৃত্তি)। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠকাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে' বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। আলঙ্কারিকেরা কাব্যের এই বাচ্যা-তিরিক্ত ধর্ম্মান্তরের অভিব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি'।

"যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃত স্বার্থৌ।
ব্যঙ্ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ" ॥

(ধ্বন্যালোক, ১।১৩)

"যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে' ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে পণ্ডিতেরা তাকেই 'ধ্বনি' বলেচেন"। এই ব্যঞ্জিত অর্থের আলঙ্কারিক পরিভাষা হ'ল 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থ'। ধ্বনিবাদীরা বলেন এই 'ধ্বনি' বা 'ব্যঙ্গ্য' হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারতম বস্তু।

কিন্তু গোড়াতেই তাঁরা সাবধান করেছেন যে কাব্যের 'ধ্বনি', উপমা ও অনুপ্রাস প্রভৃতি যে সব অলঙ্কার তার বাচ্য-বাচকের—অর্থ ও শব্দের—চারুত্ব সম্পাদন করে, তাদের চেয়ে পৃথক জিনিষ। "বাচ্য-বাচক চারুত্ব-হেতুভ্য উপমাদিভ্যোঽনুপ্রাসাদিভ্যশ্চ বিভক্ত এব" (ধ্বন্যালোক, ১।১৩, বৃত্তি)। কারণ, শ্রেষ্ঠ কবিরা এমন সুকৌশলে এ সব অলঙ্কারের প্রয়োগ করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ঐ অলঙ্কার বুঝি কবিতাকে বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে ধ্বনিতে নিয়ে গেল। কিন্তু কাব্যরসিকেরা জানেন শ্রেষ্ঠ কাব্যের আত্মা যে 'ধ্বনি' তা সেখানে নেই। কারণ সেখানেও বাচ্যই প্রধান; ধ্বনির আভাষ যেটুকু আছে তা বাচ্যার্থের অনুযায়ী মাত্র। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্যের যে 'ধ্বনি' তাই তার প্রধান বস্তু।

"ব্যঙ্গ্যস্য যত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ।
সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালংকৃতয়ঃ স্ফুটাঃ ॥
ব্যঙ্গ্যস্য প্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থানুগমেঽপি বা।
ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে ॥

তৎপরাবেব শব্দার্থৌ যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ।
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সংকরোজ্ঝিতঃ ”
(ধ্বন্যালোক, ১।১৪, ১৫, ১৬)।

'ব্যঙ্গ্য যেখানে অপ্রধান এবং বাচ্যার্থের অনুযায়ীমাত্র, যেমন সমাসোক্তিতে, সেখানে সেটি স্পষ্টই কেবল বাচ্যালঙ্কার, ধ্বনি নয়। ব্যঙ্গ্য আভাব মাত্রে থাকলে, অথবা বাচ্যার্থের অনুগামী হ'লে তাকে ধ্বনি বলে না, কারণ ধ্বনির প্রাধান্য সেখানে প্রতীয়মান নয়। যেখানে শব্দ ও অর্থ ব্যঙ্গ্যপর হয়ে ব্যঙ্গ্যতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই হচ্ছে ধ্বনির বিষয়; সুতরাং সংকরালঙ্কার আর ধ্বনি এক নয়'।

এখানে যে দুটি অলঙ্কারের বিশেষ করে' নামোল্লেখ আছে তার মধ্যে সমাসোক্তি অলঙ্কারে বর্ণিত বস্তুতে অন্য বস্তুর ব্যবহার আরোপ করে' বর্ণনা করা হয়। কিন্তু ঐ ভিন্ন বস্তু বা তার ব্যবহারের স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকে না; বর্ণিত বস্তুর কার্য্যবর্ণনা বা বিশেষণের মধ্যেই এমন ইঙ্গিত থাকে যা তাদের সূচিত করে। এতে শব্দের প্রয়োগ খুব সংক্ষিপ্ত হয় বলে' এর নাম সমাসোক্তি। আনন্দবর্দ্ধন খুব একটা জমকালো উদাহরণ তুলেছেন;—

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোঽপি রাগাদ্গলিতং ন লক্ষিতম্॥

'উপগতসন্ধ্যারাগে আকাশে যখন তারকা অস্থির দর্শন, সেই নিশার প্রারম্ভে যেমন চন্দ্রোদয় হ'ল, অমনি পূর্ব্বদিকের সমস্ত তিমির যবনিকা কখন যে রশ্মিরাগে অপসৃত হ'ল, তা লক্ষ্যই হ'ল না'। এখানে রাত্রি ও চন্দ্রে, নায়িকা ও নায়কের ব্যবহার আরোপ করে' বর্ণনা করা হয়েছে, এবং রচনায় শিল্পকৌশলের চাতুর্য্য যথেষ্ট। তবে

প্রতি শব্দটি শ্লিষ্ট; রাত্রি ও চন্দ্রের কথাও বল্‌ছে, আবার নায়িকা ও নায়কের ব্যবহারও ইঙ্গিত কর্‌ছে। "উপোঢ় রাগেণ বিলোল তারকং"—সন্ধ্যার অরুণিমায় আকাশের তারা অস্থির দর্শন, আবার উপচিত অনুরাগে চঞ্চল চক্ষু-তারকা। "গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্‌" —চন্দ্রোদয়ে আভাসিত রাত্রির প্রারম্ভ, আবার 'মুখ' অর্থে বদন, "গৃহীত" মানে ধৃত, পরিচুম্বিত। "সমস্তং তিমিরাংশুকং"—এর ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট; কিন্তু একটু কারিকুরি আছে। 'অংশুক' মানে সুধু কাপড় নয়, সূক্ষ্মবস্ত্র যা নায়িকোচিত, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারও গাঢ় নয়—পাত্‌লা অন্ধকার। "পুরং"—অর্থ পূর্ব্বদিক, আবার সম্মুখে। "রাগাদ্‌গলিতং"—আলোকরাগে অপসৃত, আবার অনুরাগের আবেশে স্খলিত। "ন লক্ষিতং"—রাত্রির প্রারম্ভ লক্ষিত হ'ল না, আবার অনুরাগের আবেশে অজ্ঞাতেই নীলাংশুক স্খলিত হ'ল। কিন্তু এ সব সত্বেও আনন্দবর্দ্ধন বলছেন এখানে 'ধ্বনি' নেই, কেননা এখানে বাচ্যই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ তার অনুগামীমাত্র ("ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যে-নানুগতং বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতীয়তে")। রাত্রি ও চন্দ্রে নায়িকা-নায়কের ব্যবহার সমারোপিত হয়েছে, এই বাক্যার্থ ছাড়িয়ে এ কবিতা আর বেশী দূর যায় নি ("সমারোপিত নায়িকানায়ক ব্যবহার-য়োর্নিশাশশিনোরেব বাক্যর্থত্বাৎ)। নায়ক নায়িকা ব্যবহারের যে ব্যঞ্জনা সেটি বাচ্যার্থেরই বৈচিত্র্য সম্পাদক মাত্র।

দ্বিতীয় অলঙ্কারটি হচ্ছে সংকরালঙ্কার। ওর নাম সংকর, কারণ ওতে একাধিক অলঙ্কার মিশ্রিত থাকে। যেমন এক অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়, কিন্তু সেটি আবার অন্য একটি অলঙ্কারকে সূচিত করে।

লোচনকার অভিনবগুপ্ত কুমারসম্ভবের একটা বিখ্যাত শ্লোক উদাহরণ দিয়েছেন,—

প্রবাতনীলোৎপল নির্বিশেষমধীর বিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ॥

'বায়ুকম্পিত নীলপদ্মের মত সেই আয়ত লোচনার চঞ্চল দৃষ্টি সে কি হরিণীদের কাছে থেকে গ্রহণ করেছে, না হরিণীরাই তার কাছে গ্রহণ করেছে তা সংশয়ের কথা'। এখানে বক্তব্য হ'ল—যৌবনারূঢ়া পার্ব্বতীর দৃষ্টি হরিণীর দৃষ্টির মত চঞ্চল। কিন্তু এই উপমাটি স্পষ্ট না বলে', একটি সন্দেহ দিয়ে তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এ রকম কবি-কল্পিত সংশয়কে আলঙ্কারিকেরা বলেন সন্দেহালঙ্কার। সুতরাং এখানে বাচ্য হ'ল সন্দেহালঙ্কার, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা হচ্ছে একটি উপমা। কিন্তু এ ব্যঞ্জনা 'ধ্বনি' নয়। কারণ এ কবিতার যেটুকু মাধুর্য্য তা ঐ ব্যঞ্জিত উপমার মধ্যে নেই, ব্যক্ত সন্দেহের মধ্যেই রয়েছে। উপমাটি বরং ঐ সন্দেহের অভ্যুত্থানে সহায়তা করে', তার সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে, সন্দেহেই পর্য্যবসিত হয়েছে। "অত্র মৃগাঙ্গনাবলোকনেন তদবলোকনস্যোপমা যদ্যপি ব্যঙ্গয়া তথাপি বাচ্যস্য সা সংদেহালংকারস্যাভ্যুত্থানকারিণীত্বেনানুগ্রাহকত্বাদঙ্গীভূতা। অনুগ্রাহ্যত্বেন হি সংদেহে পর্য্যবসানম্"। (অভিনবগুপ্ত)। অর্থাৎ অভিনবগুপ্তের মতে মহাকবির এই বিখ্যাত কবিতাটি শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়, বর্ণনা কৌশলে মনোহারী মাত্র।

সমাসোক্তি ও সন্দেহ অলঙ্কারে যে ব্যঞ্জনা থাকে, সে ব্যঞ্জনা যে কাব্যের আত্মা, 'ধ্বনি' নয়, এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে বাক্যে যে কোনও ব্যঞ্জনা থাকলেই তা কাব্য হয় না। বিশ্বনাথ

অবশ্য সোজাসুজি বলেছেন তা হ'লে প্রহেলিকাও কাব্য হ'ত। কিন্তু এই সব অলঙ্কার সুপ্রযুক্ত হ'লে, তাদের কৌশল ও মাধুর্য্য তাদের ব্যঞ্জনাকে 'ধ্বনি' বলে' ভ্রম জন্মাতে পারে, এইজন্য এদের সম্বন্ধেই বিশেষ করে' সাবধান করা প্রয়োজন। সমাসোক্তিতে যে ব্যঞ্জনা তা হচ্ছে এক বস্তুর বর্ণনা দিয়ে অন্য বস্তুর ব্যঞ্জনা। সংকরালঙ্কারের ব্যঞ্জনা এক অলঙ্কার দিয়ে অন্য অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা। সুতরাং যেখানে শব্দার্থ কেবলমাত্র বস্তু বা অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা করে, সে ব্যঞ্জনা শ্রেষ্ঠ কাব্যের 'ধ্বনি' বা ব্যঞ্জনা নয়। যে 'ধ্বনি' কাব্যের আত্মা, তার ব্যঞ্জনা কাব্যের বাচ্যার্থকে বস্তু ও অলঙ্কারের অতীত এক ভিন্ন লোকে পৌঁছে দেয়।

কাব্য তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায়, মহাকবির কথা কথার অতীত লোকে পাঠককে নিয়ে যায়—এ সব উক্তি যেমন একালের তেমনি সেকালের বস্তুতান্ত্রিক লোকের কাছে হেঁয়ালী বলেই মনে হয়েছে। প্রাচীন বস্তুতান্ত্রিকেরা বলেছেন—কাব্যের বাচ্যও নয়, তার গুণ, অলঙ্কারও নয়, অথচ 'ধ্বনি' বলে' অপূর্ব্ব এক বস্তু, এ আবার কি? ও জিনিষ হয় কাব্যের শোভা, তার গুণ ও অলঙ্কারের মধ্যেই আছে, নয়ত ও কিছুই নয়, একটা প্রবাদ মাত্র। খুব সম্ভব শব্দ ও অর্থের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে, প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকেরা বর্ণনা করেন নি, এমন একটি বৈচিত্র্যকে একজন বলেছে 'ধ্বনি', আর অমনি একদল লোক অলীক সহৃদয়ত্বভাবনায় মুকুলিত চক্ষু হয়ে' 'ধ্বনি' 'ধ্বনি' বলে' নৃত্য আরম্ভ করেছে। ("কিং চ বাগ্বিকল্পানামানন্ত্যাৎসংভবত্যপি বা কস্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণবিধায়িভিঃ প্রসিদ্ধৈরপ্রদর্শিতে প্রকারলেশে ধ্বনি ধ্বনি রিতি তদলীকসহৃদয়ত্বভাবনা মুকুলিত লোচনৈর্নৃত্যতে।...

...তস্মাৎ প্রবাদমাত্রং ধ্বনি"। ধ্বন্যালোক। ১।১, বৃত্তি)। ধ্বনিবাদের মুখ্যাচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে মনোরথ নামে এক সমসাময়িক কবির বাক্য তুলেছেন যা নিশ্চয়ই একালের বস্তুতান্ত্রিকদের মনোরথ পূর্ণ করবে।

"যস্মিন্নাস্তি ন বস্তু কিংচন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
কাব্যং তদ্ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসঞ্জড়ো
নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ" ॥

"যে কবিতায় সুষমাময় মনোরম বস্তু কিছু নেই, চতুর বচন বিন্যাসে যা রচিত নয় এবং অর্থ যার অলঙ্কারহীন, জড়বুদ্ধি লোকেরা গতানুগতিকের প্রীতিতে (অর্থাৎ 'ফ্যাশনের' খাতিরে) তাকেই ধ্বনিযুক্ত কাব্য বলে' প্রশংসা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের কাছে 'ধ্বনির' স্বরূপ কেউ ব্যাখ্যা করছে এ ত জানা যায় না!"

এ সমালোচনায় ধ্বনিবাদীরা বিচলিত হন নি। তাঁরা স্বীকার করেছেন কাব্যের 'ধ্বনি' তার বাচ্যার্থের মত এত স্পষ্ট জিনিষ নয় যে ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি থাকলেই তার প্রতীতি হবে। কিন্তু তাঁরা বলেছেন যার কিছুমাত্র কাব্যবোধ আছে তাকেই হাতে কলমে প্রমাণ করে' দেখান যায় যে কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'ধ্বনি', বাচ্যাতিরিক্ত এক বিশেষ বস্তুর ব্যঞ্জনা। কারণ বাচ্য বা বক্তব্য এক হলেও এই 'ধ্বনির' অভাবে এক বাক্য কাব্য নয়, আর 'ধ্বনি' আছে বলে' অন্য বাক্য শ্রেষ্ঠ কাব্য, এ সহজেই দেখান যায়। ধ্বনিবাদিদের অনুসরণে দু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

'বিবাহপ্রসঙ্গে বরের কথায় কুমারীরা লজ্জানতমুখী হলেও পুলকোদ্গমে তাদের অন্তরের স্পৃহা সূচিত হয়'—এই তথ্যটি নিম্নের শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

কৃতে বরকথালাপে কুমার্য্যঃ পুলকোদ্গমৈঃ।
সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ॥

কোনও কাব্যরসিক এ শ্লোককে কাব্য বল্‌বে না। ঠিক ঐ কথাই কালিদাস পার্ব্বতী সম্বন্ধে কুমারসম্ভবে বলেছেন, যেখানে নারদ মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে হিমালয়ের কাছে এসেছেন,—

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমল পত্রানি গণয়ামাস পার্ব্বতী॥

এর কাব্যত্ব সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন তুল্‌বে না। কিন্তু কেন? কোথায় এর কাব্যত্ব? এর যা বাচ্যার্থ তা ত পূর্ব্বের শ্লোকের সঙ্গে এক। কোনও অলঙ্কারের সুষমায় এ কাব্য নয়, কারণ কোনও অলঙ্কারই এতে নেই। ধ্বনিবাদিরা বলেন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এ কবিতার শব্দার্থ, লীলাকমলের পত্র গণনা—তার বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে অর্থান্তরের,—পূর্ব্বরাগের লজ্জাকে—ব্যঞ্জনা কর্‌ছে; এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব। ("অত্র হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃতস্বরূপং··· অর্থান্তরং ব্যভিচারিভাবলক্ষণং প্রকাশয়তি"। ধ্বন্যালোক, ২।২৩, বৃত্তি)।

নারীর সৌন্দর্য্যের উপমান যে জলস্থল আকাশের সর্ব্বত্র খুঁজতে হয় এ একটি অতি সাধারণ কবিপ্রসিদ্ধি। নিম্নের শ্লোকে সেই ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে।

শশিবদনাসিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্।
গগনজলস্থলসংভবহৃদ্যাকারা কৃতা বিধিনা॥

'আকাশের চন্দ্রের মত মুখ, নীল পদ্মের মত চক্ষু, শুভ্র কুন্দ ফুলের মত দশনপংক্তি—গগনে, জলে, স্থলে হৃদ্য যা কিছু আছে তার আকার দিয়ে বিধাতা তাকে নির্ম্মাণ করেছেন।' এ কবিতাকে কাব্য বলা চলে কিনা সে সংশয় স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ কবিপ্রসিদ্ধিকেই আশ্রয় করে কালিদাস যখন প্রবাসী যক্ষকে দিয়ে বলিয়েছেন—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
গণ্ডচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্থং ক্বচিদপি ন তে ভীরু সাদৃশ্যমস্তি॥

তখন তাতে কাব্যত্ব এল কোথা থেকে? ধ্বনিবাদিরা বলেন এখানে অলঙ্কারগুলি তাদের অলঙ্কারত্বের সীমা ছাড়িয়ে প্রবাসীর বিরহব্যথাকে ব্যঞ্জনা করছে বলেই এ কবিতা শ্রেষ্ঠ কাব্য। এর বাচ্য কতকগুলি উপমা, কিন্তু এর 'ধ্বনি' প্রিয়াবিরহীর অন্তর ব্যথা। এবং সেখানেই এর কাব্যত্ব।

মদনের দেহ ভস্ম হয়েছে, কিন্তু তার প্রভাব সমস্ত বিশ্বময়—এই ভাব নিম্নের কবিতা দুটিতে বলা হয়েছে।

স একস্ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুসুমায়ুধঃ।
হরতাপি তনুং যস্য শংভুনা ন হৃতং বলম্॥

'সেই এক কুসুমায়ুধ তিন লোক জয় করে। শম্ভু তার দেহ হরণ করেছেন, কিন্তু বল হরণ করতে পারেন নি।'

কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্যো জনে জনে।
নমোঽস্ত্ববার্য্যবীর্য্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে॥

'দগ্ধ হ'লেও কর্পূরের মত প্রতিজনকে তার গুণ জানাচ্ছে; আবার্য্য-বীর্য্য সেই কুসুমধনু মদনকে নমস্কার।'

অভিনবগুপ্ত বলেছেন (১।১৩) এ কবিতা দুটিতে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা না থাকায় এরা কাব্য নয়। প্রথম কবিতাটি এই ভাব মাত্র প্রকাশ করেই শেষ হয়েছে যে মদনের শক্তির কারণ অচিন্ত্য ("ইয়ং চাচিন্ত্য নিমিত্তেতি নাস্যাং ব্যঙ্গ্যস্য সম্ভাবঃ")। দ্বিতীয়টি কর্পূরের স্বভাবের সঙ্গে মদনের স্বভাবের তুলনাতেই পর্য্যবসিত হয়েছে ("বস্তুস্বভাবমাত্রে তু পর্য্যবসানমিতি তত্রাপি ন ব্যঙ্গ্যসম্ভাব-শঙ্কা")। কিন্তু ঠিক এই কথাই রবীন্দ্রনাথের 'মদনভস্মের পরে' কবিতায় কাব্য হয়ে উঠেছে।

পঞ্চশরে দগ্ধ করে' করেছ এ কি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে,
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে উচ্ছসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

অভিনবগুপ্ত নিশ্চয় বলতেন, তার কারণ এ কবিতার কথা তার বাচ্যকে ছাড়িয়ে, মানবমনের যে চিরন্তন বিরহ, যা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে, তারই ব্যঞ্জনা করছে; এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব। অভিনবগুপ্ত অবশ্য ঠিক এ ভাষা ব্যবহার করতেন না, কিন্তু ঐ একই কথা তিনি তার আলঙ্কারিকের ভাষায় বলতেন যে এ কবিতার কাব্যত্ব হচ্ছে এর 'করুণ বিপ্রলম্ভের' 'ধ্বনি'।

এই যে তিনটি উদাহরণে দেখা গেল কাব্যের আত্মা হচ্ছে তার

বাচ্য নয়, 'ব্যঞ্জনা', কথা নয় 'ধ্বনি'—এ ব্যঞ্জনা কিসের ব্যঞ্জনা, এ ধ্বনি কিসের ধ্বনি? ধ্বনিবাদিদের উত্তর, 'রসের'। তাঁরা দেখিয়েছেন বাক্য যদি মাত্র কেবল বস্তু বা অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা করে তবে তা কাব্য হয় না। রসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। কাব্যের 'ধ্বনি' হচ্ছে রসের ধ্বনি! তিনটি উদাহরণেই কবিতার বাচ্য রসের ব্যঞ্জনা করছে বলেই তা কাব্য। এই 'রসের' যোগেই পরিচিত সাধারণ কথা নবীনত্ব লাভ করে' কাব্যে পরিণত হয়েছে।

"দৃষ্টপূর্ব্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রস পরিগ্রহাৎ।
সর্ব্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ॥"

(ধ্বন্যালোক, ৪।৪।)

'পূর্ব্বপরিচিত অর্থও রসের যোগে কাব্যত্ব লাভ করে' বসন্তের নব কিশলয় খচিত বৃক্ষের মত নূতন বলে' প্রতীয়মান হয়'। অর্থাৎ কাব্যের আত্মা 'ধ্বনি' বলে' যাঁরা আরম্ভ করেছেন, কাব্যের আত্মা 'রস' বলে তারা উপসংহার করেছেন। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং" (সাহিত্যদর্পণ)। কাব্য হচ্ছে সেই বাক্য 'রস' যার আত্মা।

'কোঽয়ং রসঃ', এ 'রস' জিনিষটি আবার কি?

পাঠকেরা যদি ইতিমধ্যেই নিতান্ত বিরস না হয়ে থাকেন, তবে দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের রস বিচারের পরিচয় দেওয়া যাবে। লেখকের মতে কাব্য সম্বন্ধে তার চেয়ে খাঁটি কথা কোনও দেশে, কোনও কালে, আর কেউ বলে নি।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

চিত্রা ও চৈতালি

—:•:—

চিত্রা কাব্যগ্রন্থখানি কবির বত্রিশ হইতে তেত্রিশ বৎসর বয়সে লেখা। ইহার পদ্মাও বর্ষার, তবে তাহার উন্মাদনা খানিকটা পড়িয়া আসিয়াছে—ইতস্তত ভাঙার চিহ্ন উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। এখনো কবি আসল পদ্মার উপরেই আছেন—কোনো শাখানদী বাহিয়া লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া পড়েন নাই—তবে তাঁহার নৌকা যে সেই দিকেই চলিয়াছে, তাহা বেশ মনে হইতেছে। বড় নদী লোকালয়কে বিচ্ছিন্ন করে—এপারে ওপারে নূতন মানুষ, নূতন ভাষা; শাখানদী আত্মীয়তার সম্বন্ধ দ্বারা লোকালয়কে আকর্ষণ করে। ঠিক যেন রাজপথ ও গলির প্রভেদ। গলি পারিবারিকতার সূত্র,—এই জন্যেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে গলি এত আনাগোনা আর এত আদরের স্থান।

সোনার তরীতে দেখিয়াছিলাম কবি নিজের অন্তঃপুরে মানসসুন্দরীর সহিত আলাপনে নিরত; বাহিরের জগতে বাহির হইবার তাঁহার কোনো ব্যস্ততা ছিল না। শুধু নিজের অন্তরকে নহে, বহির্জগৎকে উপভোগ করিবার একটা অসহ্য আকুতি চোখে পড়ে চিত্রাতে। নিম্নে আলোচিত কয়েকটি কবিতাতে দেখিব, বর্ষার সেই নীরের প্রাধান্য কাটিয়া তীরের প্রাধান্য ধরা পড়িতেছে। ইহার 'সুখ' নামক কবিতাটিতে দেখিব, পদ্মাতীরের লোকালয়ের বর্ণনা কেমন করিয়া কবিকে অধিকার করিতেছে। শুধু তাই নহে, এই 'সুখ' কবিতাটিতে এমন একটি সহজ সরলতা আছে যে, ইহাকে ক্ষণিকার দলভুক্ত বলিয়া মনে হয়। সোনার তরীর 'আকাশের চাঁদ' নামক

কবিতায় অবাস্তব এক সুখের জন্য সমস্ত জীবনটাকে কবি ব্যর্থ করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু 'সুখ' কবিতাটিতে বুঝিলেন "সুখ অতি সহজ সরল।" সোনার তরীতে ইহা ছিল না বলিলেই হয় : চিত্রাতে ইহার সাক্ষাৎ পাইলাম; পরবর্ত্তী কাব্যগুলি এই রসেই আচ্ছন্ন।

নিজ হৃদয়ের কল্পনা-বিলাস হইতে সংসারের তীরে ফিরিবার প্রচণ্ড আকুলতা উচ্ছ্বসিত হইতেছে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায়। এই আকুলতা তাঁহার চৈতালি ও ক্ষণিকায় সফল হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত 'সুখ' কবিতায় যে সহজ সরল আনন্দের প্রতি কবির আগ্রহ দেখিয়াছি, 'আবেদন' কবিতাটিতে তাহারই রূপান্তর। যে স্বর্গ হইতে তিনি বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা তাঁহার বিশ্ব-বিহীন অপরের সহিত সমবেদনাহীন কল্পনারই স্বর্গ। এই স্বর্গের আতি-পাতি ঘুরিয়া তিনি দেখিয়াছেন, সেখানে স্বস্তি নাই। তাই তাঁহার অশ্রু-জলে চিরশ্যাম ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির জন্য আকাঙ্ক্ষা। এই ভূতলের স্বর্গের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় সাধনা হইয়াছিল পদ্মা তীরের নগণ্য পল্লীগুলিতে।

চিত্রা কাব্যটিতে কবির ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার ইতিহাস আছে। নানা রূপ, রূপক ও ছন্দের বিভিন্নতার মধ্যে এই সুরটিই আনাগোনা করিতেছে, সেইজন্য ইহাকে আমি খণ্ডকাব্যের সমষ্টি না বলিয়া অখণ্ড কাব্য বলিতে ইচ্ছা করি।

চৈতালি।

কবির চৌত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে চৈতালি রচিত। এই কাব্যখানিতে আমরা এক নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সোনার তরীতে যাহার আভাস। চিত্রায় যাহার আকাঙ্ক্ষা।

চৈতালিতে তাহার সূচনা : ক্ষণিকাতে তাহার পরিণাম। ইহার পন্থা বর্ষার নহে, শীতশেষের; এখানে বর্ষার উদ্বেলতা স্তিমিত হইয়া শীতের শান্তি ও চৈত্রের শ্রান্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

শুধু তাহাই ত নহে; কবি এখন আসল-পদ্মা ত্যাগ করিয়া তাহার শাখা বাহিয়া লোকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। চৈতালিতে ছোট নদীর সুর—যাহার কলগর্জ্জন তীরভূমির লোকালয়ের কণ্ঠধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় না; যাহার এপার-ওপারের তরু-পল্লব ছুঁই ছুঁই করে; যাহার উভয় কূলের প্রতিবেশিদের মধ্যে ঘাটে আসিয়া অনায়াসে কথাবার্ত্তা চলে;—ইহা আত্মীয়তার তরল সূত্রবিশেষ। অর্থাৎ ইহাতে নীর হইতে তীরের প্রাধান্য বেশি; লোকালয় এখানে লক্ষ্য—জলাশয় নহে। কবি নিজের অন্তর হইতে বাহির হইয়া এখানে লোকসমাজের সহিত প্রেম ও জ্ঞানের সূত্রে মিলিত হইতেছেন। জ্ঞান ও প্রেম—এই দুই অংশে হৃদয়ের পরিপূর্ণতা। মানুষের প্রতি প্রেমের পরিচয় তাঁহার কাব্যে ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি, কিন্তু এই জ্ঞান-যোগের অভাবে সে প্রেম অসম্পূর্ণ ছিল; এইবার তাহার আভাস দেখিয়া স্পষ্ট মনে হইতেছে কবির প্রতিভা সম্পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে। মেঘদূতের আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, এবার তাহা মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিব। মেঘদূত যেমন বিশ্বের, তেমনি আবার সামান্য একটি বিরহী যক্ষেরও। ইতিপূর্ব্বে যে প্রতিভাকে মানস-সুন্দরী, বসুন্ধরা ও উর্ব্বশী লিখিতে দেখিয়াছিলাম; এখানে তাহাকে দেখিতেছি পল্লীগ্রামের সামান্য লোক—দিদি, পুঁটু, সঙ্গী প্রভৃতি অতি সামান্য চোখ-এড়ানো তুচ্ছতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে। ইহারই নাম প্রতিভার বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত ব্যঞ্জনা।

চৈতালিতে কবি যে শুধু লোকালয়ের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছেন তাহা নহে; এতদিন তিনি পদ্মার বক্ষে থাকিয়াও পদ্মাকে নিকটতম ভাবে পান নাই—তাহাকে তিনি যথার্থ করিয়া লাভ করিলেন এখানে। বড় নদী যেন একখানা মহাকাব্যের — তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না; শাখানদী যেন একখানা লিরিক কবিতা—দুইবার আনাগোনা করিলেই মুখস্থ হইয়া যায়। কবির কথাই শোনা যাক্।—"পদ্মার মত বড় নদী এতই বড় যে, সে যেন ঠিক মুখস্থ করে নেওয়া যায় না—আর এই কেবল ক'টি বর্ষামাসের দ্বারা অক্ষর-গোনা ছোট বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে। পদ্মা নদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষঘেঁসা নদী; তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্ম্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী।" (ছিন্ন-পত্র)। শুধু তাই নয়, একান্ত আপনভাবে ভালবাসিবার নদীও ইহাই। ফরাসী লেখক জুবেয়ারের একটি বচন আছে যে, ভগবান এত বিরাট যে তাঁহাকে খণ্ড করিয়া না লইলে আমরা ধারণা করিতে পারি না। নদী সম্বন্ধেও একই কথা। কবি এই শাখানদীতে আসিয়াই পদ্মাকে প্রেয়সীরূপে সম্বোধন করিতে পারিয়াছেন। নদীতীর ও নদী, উভয়ের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি এখানে ব্যক্তিগত।

সম্পূর্ণতা লাভের জন্য গদ্য ও পদ্য পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। অনেক সময় দেখা যায়—পদ্যে যাহার অভাব, গদ্যে তাহারই প্রকাশ; কখনো বা পদ্যে যাহার আভাস, গদ্যে তাহার ভাষ্য। গদ্য স্বভাবতই পদ্যের বিস্তৃত টীকা; আর গদ্যপদ্য উভয় মিলিয়া রচয়িতার

জীবনের টীকা। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য দুইটিতে কবির যে ইচ্ছাটি দেখিলাম—নিজের অন্তর হইতে বাহিরে আসিবার, এবং বিশ্বের সহিত জ্ঞানের আলোকে পরিচিত হইবার—তাহারই পরিপূর্ণতা আছে ঐ কাব্য দুইটির সমসাময়িক গদ্য নিবন্ধগুলিতে। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটিতে কবির অন্তরলোক হইতে বাহির হইবার যে আকুল ক্রন্দন, তাহা কেবল কাব্যেই পরিসমাপ্ত নহে। কবি মূঢ় মূক মুখে ভাষা দিবার এবং ভগ্ন শুষ্ক বুকে আশার সঙ্গীত বাজাইয়া তুলিবার অনেক পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। দেশকে জানিতে হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার সব অন্ধিসন্ধির খবর লইতে হয়। জ্ঞানের ভিত্তি ইমারতের মত মাটির দিক হইতেই পাকা করিয়া তোলা আবশ্যক। তিনি দেশকে জানিবার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। এই সময়ে দেশের নানাবিধ তথ্যসংগ্রহের দিকে মন দিলেন। ছেলে-ভুলানো ছড়া, কবিসঙ্গীত, গ্রাম্য সাহিত্য—ইহাদের মধ্যে যে দেশের অসংস্কৃত এবং কিম্বদন্তিমূলক একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাস আছে, এবং তাহা যে দেশের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটনের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়—এ কথা তিনি ভালোরূপেই বুঝিয়াছিলেন। সাধনা পত্রখানি তখন তাঁহার মুখপত্ররূপে দেশকে নানা দিক দিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিতেছিল। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির নাম দেখিলেই বোঝা যাইবে, কত বিভিন্ন ভাব তাঁহার মনে কাজ করিতেছিল। "ইংরাজ ও ভারতবাসী" (১৩০০ সাল), "রাজনীতির দ্বিধা" (১৩০০), "অপমানের প্রতিকার", "সুবিচার" (১৩০১), "সমুদ্র যাত্রা" (১২৯৯), "শকুন্তলা", "মেঘদূত", "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" (১২৯৮), "বিদ্যাসাগর

চরিত" (১৩০২)। এই প্রবন্ধগুলিতে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। একদিকে যেমন বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি তাঁহার দৃষ্টি ও চিন্তা আকর্ষণ করিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি প্রাচীন ভারতের একটি আদর্শ রূপ তাঁহার মনে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কবির পরবর্ত্তী কালের গদ্যেপদ্যে দেখিতে পাইব ভারতের এই আদর্শ রূপটি ক্রমে কি মূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং কোন্ কর্ম্মে ও চিন্তায় তাহার পরিণতি হইল। চৈতালিতে কালিদাসের উপরে যে কবিতাগুলি আছে, তাহার সহিত কালিদাসের গদ্য সমালোচনা কয়টি মিলাইয়া পড়িলে কালিদাস সম্বন্ধে কবির সম্পূর্ণ ধারণাটি জানা যাইবে। উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থের প্রাচীন ভারত সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশ" পুস্তকের তুলনামূলক একটা সমালোচনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

রবীন্দ্রনাথ।



আমি ত' ছিলাম ঘুমে,
তুমি মোর শির চুমে'
গুঞ্জরিলে কি উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে কানে ;
'চলরে অলস কবি,
ডেকেছে মধ্যাহ্ন রবি—
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে !'
চমকি' উঠিনু জাগি ;
ওগো মৃত্যুঅনুরাগী,
উন্মুক্ত ডানায় কোন্ অভিসারে দূরপানে ধাও ?
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে,
ঝড়ের ঝাপট লাগি' হয়েছে যে উদাসী উধাও !
দেখি, চন্দ্র সূর্য্য তারা
মত্ত, নৃত্যদিশাহারা,
দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগী ;
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে,
অনির্ণীত, অনিশ্চিত, অসীমের, অশেষের লাগি'।

আমারে জাগায়ে দিলে ;
চেয়ে দেখি এ নিখিলে
সন্ধ্যা, উষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিণী ;
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে,
কূল হতে নিল মোরে সর্ব্বনাশা গতির তটিনী !
তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে, মহেন্দ্রের মন্দির সন্ধানে ?
তুমি ছাড়া আর কার
এ উদাত্ত হাহাকার—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে !'

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

বিধিনিষেধ ও মানবপ্রকৃতি।

কোনরকম বিধিবিধান বা ধর্ম্মশাসন মেনে চলা যে মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম নয়, তা' তার কর্ম্ম-প্রকৃতি দেখেই বুঝতে পারা যায়; এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাকে প্রবৃত্ত করলে যে বিকৃত ফল হয়, মানুষের আবহমানকালের ইতিহাসই তার সাক্ষী। মানুষ যে পদে পদে বিধি-নিষেধ ও নীতিনিয়ম লঙ্ঘন করতে প্রলুব্ধ হচ্ছে এবং অধর্ম্মাচারী হ'য়ে উঠচে, তার কারণ প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণপণে চেষ্টা হচ্চে তাকে ধার্ম্মিক ও নীতি-পরায়ণ করে' তুলতে। কথাটা শ্রুতিকটু হলেও যে সত্যি, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অতি তুচ্ছ জীবনঘটনা থেকেও এর সত্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে। সমস্ত নীতিনিয়মের মূলে আছে একটা 'জেনারলিজেশন' এবং বাধ্যতার দাবী; আর মানুষের প্রকৃতিতে রয়েচে একটা উৎকট স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বেচ্ছাচার-প্রিয়তা। কাজেই নীতিনিয়মের যা' মূলবস্তু, মনুষ্যপ্রকৃতিতে তার অভাব হেতুই এই বিদ্রোহের সৃষ্টি।

আমাদের রাষ্ট্রিক, ধার্ম্মিক বা সামাজিক জীবন থেকেও আমরা এইটে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারচি যে, আমরা মানুষকে দিন দিন যতই মানুষ করে' তোলবার চেষ্টা করচি, সে ততই অমানুষ হ'য়ে দাঁড়াচ্চে। নিতান্ত দৈহিক প্রয়োজন বা সুখসাধনের জন্য যতটুকু দ্বন্দ্বকলহ আবশ্যক, মানুষের তা' ছাড়া হনন পীড়ন করবার কারণই হয়ত ঘটত না, যদি তার মাথায় নীতিধর্ম্ম, বিধিনিষেধ ও শিক্ষা

পরিবর্ত্তনশীল আদর্শের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া না হ'ত। যেদিন তার মাথায় প্রথম ঢুকিয়ে দেওয়া হল 'স্বধর্ম্মেনিধনংশ্রেয়ঃ', সেই দিন হ'তেই সে ধর্ম্মের সমস্ত শ্রেয়ঃকে নিধন করে' 'নিধনং শ্রেয়ঃ' ব্রত গ্রহণ করলে। যেদিন তাকে প্রথম 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হল, বোধ করি সেই দিন হতেই সে সুরু করলে প্রাণপণে অপরকে হিংসা করতে। প্রতিবেশীকে সত্যি সত্যি ভালবাসতে না পারলেও হয়ত কারণে অকারণে এমন নিষ্ঠুরভাবে তাকে পীড়ন মানুষ করত না, যদি না তাকে দীর্ঘকাল ধরে' তোতাপাখীর মত পড়ান হ'ত 'Love thy neighbour'। ধর্ম্মের পর ধর্ম্ম সৃষ্টি করে', নীতিনিয়মের পর নীতিনিয়ম গড়ে' মানুষকে আমরা এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েচি যে, তাকে সেখান থেকে ফেরাতে হলে এমন সব অবতার ও মহাপুরুষদের আসতে হবে যাঁরা এই সব আবার ঢেলে সাজতে পারবেন, এবং ধর্ম্ম ও সমাজনীতির মহাভূত ছাড়িয়ে মানুষকে রক্ষা করতে পারবেন। পুণ্যের ভারে এবং বিধিনিষেধের চাপে মানুষের এমন ত্রাহি-মধুসূদন অবস্থা দাঁড়িয়েচে যে, ধরিত্রী পর্য্যন্ত অধীর হ'য়ে উঠেচেন।

ধর্ম্মানুশীলনের যে পুণ্যলীলা এবং মিলন-পূর্ণিমার যে হোলি খেলা সেদিন আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখেচি, তা'তে প্রাণপণে কেবলি জপেচি—হে যুগপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মপ্রচারকগণ! আপনাদের নাম জয়যুক্ত হোক।

কোন স্মরণাতীত যুগে কোন এক সম্প্রদায়বিশেষ পেটের দায়ে দস্যুবৃত্তি ক'রে খেত বলে', তাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগিয়ে তোলবার শুভ-ইচ্ছায় যে মহাপুরুষ এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করেছিলেন, আজ তাঁরই নামে পৃথিবীর বুকে যে অমানুষিক ঘটনাসকল ঘটচে, তা'

দেখলে হয়ত সৃষ্টিকর্ত্তাও আজ চমকে উঠতেন। সুদ্ধ পেটের দায়ে এত হত্যা, এত নিষ্ঠুর নির্য্যাতন যে তারা নিশ্চয়ই করত না, তা' বনের পশু হিংস্র বাঘভালুককে দেখেও আমরা বুঝতে পারি। কারণ এক ক্ষুধার তাড়নায় ছাড়া প্রাণীহত্যার প্রবৃত্তি সাধারণত তাদের মনে জাগে না, এবং কোনরূপে উদরপূর্ত্তি হয়ে গেলে সে প্রবৃত্তিও আর তাদের থাকে না। কিন্তু এ যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, এ যে অতৃপ্ত জিঘাংসা;—এর যে কোনকালে নিবৃত্তি আছে তা'ত মনে হয় না। কারণ পেটের দায়েই হোক আর স্বার্থের তাড়নাতেই হোক, মানুষ অসত্য ও হত্যাশ্রয়ী হলেও তার এক ভরসা থাকে যে, এমন একদিন আসতে পারে যখন তার অন্তরে সত্যধর্ম্মের মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠবে, এবং অজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপরাশি ধুয়ে ফেলবার জন্য তার প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠবে; কিন্তু এ যে ধর্ম্মাশ্রয়ী-হত্যালীলা! যুগ যুগ ধরে এমনি বেপরোয়া হয়ে মানুষকে মানুষ খুন করে গেলেও, ধর্ম্মসংস্কারের কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত তার হৃদয়ে এতটুকু অনুতাপ কোনদিন আসবে না।

একই দেশের অন্নজলে পরিপুষ্ট হ'য়ে, একই গৃহে বাস করে, একই স্নেহসিক্তনয়নের তলে লালিত হয়েও আজ যে হিন্দুমুসলমান পৈশাচিক উল্লাসে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরচে, অম্লানবদনে পরস্পরের বুকে ছুরি বসাচ্চে—এর কারণও ত, যে যাই বলুক, সেই এক! যেদিন তাদের কপালে ধর্ম্মমতের ছাপ এঁটে তাদেরকে বলে' দেওয়া হয়েচে যে, ঈশ্বর তাদের একরকম করে' গড়বার যতরকম চেষ্টাই করুন না কেন, তারা কোনরূপেই এক নয়,—সেই দিন হ'তেই এ হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েচে। এবং যতদিন এই দুই ধর্ম্মের ধ্বজা

সগর্ব্বে উড্ডীন থাকবে, ততদিন যে এ নিষ্ঠুরলীলার অবসান হবে না— এ কথা নিশ্চয় করে' বলা যায়।

এই যে দ্বাবিংশ কোটি হিন্দু আজ এই দুর্দ্দিনে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার জন্য চেঁচিয়ে মরচে, হয়ত সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে এতটুকু কষ্ট করতে হত না, যদি সহস্র বিধিনিষেধের নিগড় কানে দিয়ে তাকে সহস্র স্তরে কীলকবদ্ধ করে' রাখা না হ'ত। পাপকে পাপ বলে' সত্যি সত্যি বোধ করে', এবং গুণ ও কর্ম্মের চুলচেরা বিচার করে' হীনকে ঘৃণা করবার মত মানসিক অবস্থা বোধ করি আমাদের লক্ষ জনের মধ্যে একজনেরও হ'ত কিনা সন্দেহ; কিন্তু যেদিন আমরা পাপপুণ্য আর উচ্চনীচ-বিচারকে জন্ম ও বংশগত ক'রে নির্ব্বিচারে মানুষকে জন্মের হীনতা বা উচ্চতার কোটায় আবদ্ধ করেচি, সেই দিনই আমরা পরস্পরকে প্রাণপণে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেচি, এবং আমাদের জাতীয় শক্তির মুলে কুঠারাঘাত করেচি। এখন যতই আমাদের সমাজকে বিধিনিষেধের বাঁধনে শক্ত করে' বাঁধবার চেষ্টা করচি, সে ততই ক্ষেপে উঠচে; ফলে জাতি ও সমাজের বনিয়াদ পর্য্যন্ত নড়তে সুরু করেচে। তাই চারিদিক দেখে শুনে' সম্প্রতি আমরা বুঝতে বাধ্য হয়েচি যে, এ জাতিকে অন্তর্বিপ্লব তথা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে সামাজিক বিধিনিষেধের অনেক ভূত এদের ঘাড় থেকে নামাতে হবে—অন্যথা মঙ্গল নেই।

কি রাষ্ট্রিক, কি সামাজিক, কি ধার্ম্মিক, যে কোন বিষয়েই আমরা বিধিবিধান সৃষ্টি করতে গিয়েচি, কিছুদিন পরেই দেখেচি তার ফল উল্টো হতে আরম্ভ হয়েচে। তার একমাত্র কারণ, নীতিনিয়ম করতে গিয়ে যখনই আমরা কোন 'জেনারলিজেশনে' পৌঁছেচি, তখনই আমরা

মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ, এবং স্থান কাল পাত্রভেদে তার প্রকৃতিভেদ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করিনি; কাজেই সর্ব্বত্রই একটা বিরোধের সৃষ্টি করেচি। কোন্ কালে কি পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিশেষে কোন্ এক সম্প্রদায়বিশেষের জন্য সাময়িক ভাবে হয়ত একটা নিয়ম প্রণয়নের আবশ্যক হয়েছিল, পরবর্ত্তী কালে কালের এবং মানবমনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেটারও যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সে চিন্তা আমরা করিনে; উপরন্তু সেইটীকেই বিশগুণ জোরে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিই, ফলে তারা জগৎজুড়ে প্রতিনিয়ত অঘটন ঘটাতে থাকে। কাজেই এ কথা নিশ্চয় করে' বলা যায় যে, যতদিন মানুষের প্রকৃতি এবং তার পারিপার্শ্বিকের দিকে তাকিয়ে তাদের যথাযোগ্য মান্য করে আমরা নীতি নিয়ম প্রণয়ন বা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বোধ না করি, ততদিন মানুষের এ বিদ্রোহী ভাব ঘুচবে না, এবং মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষেরও অবসান হবে না।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

ফুলের বিয়ে

——:*ঔ*:——

ফুলের কেশরের রেণু যদি সেই জাতের ফুলের গর্ভের মুখে পড়ে, তাহলেই ফুলের বিয়ে হয়। কেশর আর গর্ভ যদি একই জাতের ফুলের না হয়—অন্তত কাছাকাছি জাতেরও না হয়, তাহলে একটার রেণু অন্যটার মুখে পড়লেও বিয়ে হবে না—কেননা সে রেণু গর্ভের ভিতর গিয়ে গর্ভদানার সঙ্গে মিশবে না। একটা দিশী আঁবের ফুলের সঙ্গে একটা দিশি আঁবের ফুলের বিয়ে ত হয়ই, ন্যাংড়া আঁবের ফুলেরও বিয়ে হয়—এমন কি কখনো কখনো আমড়াফুলেরও বিয়ে হতে পারে, কেননা আঁব আর আমড়া একজাতের না হলেও অনেকটা কাছাকাছি জাতের; কিন্তু আঁবের ফুলের সঙ্গে কাঁটালের ফুলের বিয়ে কোনকালেই হয় না। তোমরা হয়ত এমন টোকো আঁঠিসার ছোট্ট ছোট্ট আঁব খেয়েছ, যার গন্ধও অনেকটা আমড়ার মত; কিন্তু এমন আঁব নিশ্চয়ই খাওনি, যার স্বাদ কি গন্ধ কাঁঠালের মত।

ফুলের বিয়ে হয়ে গেলেই তার পাপড়ী কেশর ঝরে পড়ে, কিন্তু গর্ভটী গুটী বেঁধে ফল হয়—আর দিন দিন বাড়তে থাকে।* ফলের

---

* পেয়ারা, কমলা লেবু, পেঁপে, কলা এইরকম গোটা চুচার গাছ আছে, যাদের কখনো কখনো শুধু মেয়ে-ফুল থেকেই ফল হয়; পুরুষ-ফুলের সঙ্গে বিয়ে না হলেও চলে। কিন্তু সে সব ফল হয় অনেকটা হাঁসের বাওয়া ডিমের মত। তাদের মধ্যে বীচিও হয় কম—সে সব বীচি থেকে গাছও হয় না।

ভিতরে যে বীচি থাকে—সেই বীচিই হচ্ছে গাছের বাচ্ছা। সেই বীচিই গাছের বংশ রাখে।

তাহলেই বুঝতে পারচ ফুলের বিয়ে হওয়া কত দরকার। কিন্তু ফুলেরা ত নিজেরা নিজেরা বিয়ে ঘটাতে পারে না, তাই তারা ঘটককে দিয়ে সে কাজটা সেরে নেয়। ফুলেদের ঘটক হচ্চে মাছি, মৌমাছি, প্রজাপতি, পিঁপড়ে, পাখী, বাতাস, জল—এই সব। তারাই এক ফুলের রেণু নিয়ে আর এক ফুলের গর্ভের মধ্যে ছেড়ে দেয়। ঘটকদের মধ্যে মৌমাছি আর প্রজাপতিই হচ্চে সকলের সেরা—কেননা তারা ধাঁ ধাঁ করে এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে যায়। তাদের গায়ে যে আঁশ আছে আর পায়ে যে বুরুষের কুচির মত রোঁয়া আছে, তাতে চট্ করে রেণু লেগে যায়। তা ছাড়া তারা রেণু নষ্টও করে কম। তাদের যে ফুল কাজে লাগাতে পারে, তারা অন্য ঘটক চায় না।

ফুলেদের মধ্যে নিজের বিয়ে নিজে ঘটাতে পারে এক যমক ফুল—কেননা তার কেশর গর্ভ দুইই আছে; নিজের কেশরের রেণু নিজের গর্ভের মুখে ফেল্‌লেই হল। তবু সে ঘটক দিয়ে ঘটাতে চায়, কেননা ওরকম ঘরোয়া বিয়ে সে পছন্দ করে না। ঘরোয়া বিয়ের দোষ এই যে, তা থেকে যে ফল হয়, তাতে হয় বীচি থাকে না, নাহয় কম বীচি থাকে; আর থাক্‌লেও সে বীচি তেমন জোরালো হয় না—কাজেই তা থেকে ভাল গাছ হয় না। যদিই বা ভাল গাছ হলো, তাহ্‌লেও সে গাছের বীচি থেকে আর ভাল গাছ হবে না। কিন্তু এক ফুলের সঙ্গে যদি আর এক ফুলের বিয়ে হয়, তা সে ফুল দুটো একই গাছের হোক্ কি আলাদা গাছেরই হোক্—তাহলে সে

বিয়ের ফল ভাল হবেই। এরকম বিয়ে এক ঘটকেরাই ঘটাতে পারে; তাই যমক ফুলেরাও হাপিত্যেশ করে বসে থাকে—কখন ঘটকরা এসে পায়ের ধুলো দেবে।

কিন্তু ঘটকরা কি জন্য ফুলের কাছে আসবে, কি বক্‌সিসের লোভে মেহনৎ করে বিয়ে ঘটাবে?—ঘটকদের বক্‌সিস হচ্চে মধু। ঘটকদের খাইয়ে খুসী করবার জন্যই ফুল তার পাপড়ীর তলায় বোঁটার কাছবরাবর একটী ছোট্ট থলিতে মধু তৈরী করে রাখে। যে ফুলের যে ঘটক, সে ফুলের সেই ঘটকের কাছেই মধু'র ঘরের চাবিটি আছে। সে চাবি আর কিছুই নয়,—হয় জিভ, নাহয় শুঁড়, নাহয় ঠোঁট। তাই দিয়েই সে মধু'র ঘরে ঢুকে মধু লুটে খায়।

ঘটকেরা যে শুধু মধুই খায় তা নয়, রেণুও খায়। কল্‌কে, বক, তরুলতার মত যে সব ফুলে মধু বেশী, তারা রেণু বেশী করে রাখেনা; কিন্তু গোলাপ, পোস্ত, শিয়ালকাঁটার মত যে সব ফুলের মোটেই মধু নেই, তারা রেণুর বরাদ্দটা বেশী করে রাখে। যে সব ফুলের মধু নেই, আছে শুধু রেণু, সে রেণুটুকুও যদি ঝরে মাটিতে পড়ে, তাহলে ঘটকরা আসবে কিসের লোভে? তাই তারা পাপড়ীগুলোকে এমন ভাবে সাজায়, যাতে ফুলের মাঝখানটা বাটীর খোলের মত হয়। রেণু যা ঝরে পড়ে, তা ঐ খোলের মধ্যেই মজুত থাকে।

পাখীরা বড় মধু'র ভক্ত নয়, তারা রেণু পেলেই খুসী। তাই পাখীতে যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তাদের রেণু হয় খুব বেশী,—যেমন শিমূল, পালতে মাদার, সোঁদাল, কৃষ্ণচূড়া। আবার হাওয়াতে যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, যেমন ঘাস, বাঁশ, সরল, দেওদার, তুঁত, পিটুলি, ভ্যারেণ্ডা—তাদের রেণু তৈরী করতে হয় আরো বেশী; কেননা

হাওয়ায় যে রেণু উড়িয়ে নিয়ে যায়, তার বেশীর ভাগই নষ্ট হয়ে যায়—হয় মাটিতে পড়ে', নাহয় পাতায় বেধে। এ সব ফুলের রেণু হয় শুক্‌নো হাল্কা ধূলোর মত, যাতে হু হু করে উড়ে যেতে পারে—আর গর্ভের মুখটা হয় পালক কি চামরের মত, যাতে উড়ন্ত রেণুগুলোকে চট্ করে ধরে নিতে পারে। জাফরাণ ফুল আর পাহাড়ে জায়গায় পাইন, ফার, সাইপ্রেস বলে সে সব বিল্‌াতী ঝাউ জাতের গাছ হয়, তাদের ফুল যখন ফুটতে আরম্ভ করে, তখন এত রেণু বাতাসে ওড়ে যে, গাছতলা দিয়ে হেঁটে গেলে চোখে মুখে দেখতে পাওয়া যায় না। চারদিক হল্‌দে রঙে ছেয়ে যায়—আর গাছের তলায় একহাঁটু করে হল্‌দে রেণু জড় হয়। সে সময় যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে গাছের তলা দিয়ে সোণালি রঙের ঝরণা বয়ে যায়। সেই জল পাহাড়ের গা বেয়ে যখন নীচে নাবে, তখন লোকে বলে পাহাড়ের উপর গন্ধক বৃষ্টি হয়েচে।

মৌমাছি, প্রজাপতির মত মধুখোর ঘটকরা যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তাদের বেশীর ভাগেরই রেণু কম—কেননা ও সব ঘটকরা, যা দু'চারটে রেণু গায়ে লাগে, তা ঠিক অন্য ফুলের গর্ভে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। এই জন্য এ সব ফুলের রেণুও চট্‌চটে, যাতে চট্ করে ঘটকদের গায়ে লেগে যায়। আবার গর্ভমুখও হয় চট্‌চটে, যাতে ঘটকদের গায়ের রেণু চট্ করে তুলে নিতে পারে।

কিন্তু মধু আর রেণু ভাঁড়ারে থাকলেই ত হবে না, ঘটকদের টেনে আনা চাই। কি দিয়ে ফুলেরা ঘটকদের টেনে আনে? রং আর গন্ধ* দিয়ে। যে সব ফুল দিনে ফোটে, তারা প্রায়ই হয়

* ফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসে?—ফুলের পাপড়ীর মধ্যে একরকম

রংচঙে—কিন্তু যে সব ফুল রাত্রে ফোটে,—যেমন যুঁই, মল্লিকা, মালতী—তারা প্রায়ই হয় ধপ্‌ধপে সাদা, কেননা রাত্রে সাদা রং ছাড়া অন্য রং চোখেই ঠেকেনা। আর সে সব ফুল গন্ধেও হয় ভুরভুরে। চোখে না দেখতে পেলেও গন্ধ ধরেই পোকামাছিরা ছুটে আসে—কেননা চোখের চেয়ে পোকামাছিদের নাকটাই বেশী ধারালো।

আগেই বলেছি সব ঘটক দিয়ে সব ফুলের বিয়ে হয় না। তার মানে, ফুল কত বড়, তার কি রকম গড়ন, কত ভিতরে তার মধুর থলি—সেই হিসাবে এক এক ফুল জুতসই। কুঁদফুল কি কামিনী ফুলের মত ছোট্ট নরম ফুলে ভোম্‌রা, ভীমরুল, গুব্‌রে পোকার মধু খাবার সুবিধা হয় না, কেননা তারা সে ফুলের মধ্যে ঢুকতেই পারে না, উপরে বসতে গেলেও পাপড়ীগুলো ঝর্‌ ঝর্‌ করে ঝরে পড়ে। মাখনসীম, ছোলা, পলাশ, তুলসী, পুদিনার মত যে সব ফুলে মধু'র থলি একেবারে ভিতরে লুকানো, তাতে মাছি, বোল্‌তা, ডাঁশের মত ছোট জিভওয়ালা ঘটকরা পাত্তাই পায় না; আবার ধনে, মৌরি, রাংচিতে, ভ্যারেণ্ডার মত যে সব ফুলে মধু'র থলি উপরে বসানো,

---

গন্ধতেল পোরা আছে। একটা ফুলের পাপড়ীকে যদি আলোর দিকে রেখে অনুবীণ দিয়ে দেখ, তাহলে তার মধ্যে অনেকগুলো কালো কালো দানা দেখ্‌তে পাবে। ঐ কালো কালো দানাই গন্ধতেলের দানা। পাপড়ীর গায়ে কতক-গুলো খুব সরু সরু ছেঁদা আছে—ঐ ছেঁদার ভিতর দিয়ে গন্ধতেলের গন্ধ বেরিয়ে আসে।

ঘাঁটকোল, কুচলে, গুয়ে বাবলা, র‍্যাফ্লেসিয়া ফুল হতে সুগন্ধের বদলে দুর্গন্ধ বেরোয়, তার মানে তাদের গন্ধতেলটাই দুর্গন্ধ। তারা যে সবুজ মাছিদের টেনে আনে, তাদের নাকে বোধহয় বদগন্ধই মিষ্টগন্ধ বলে লাগে!

তাতে মৌমাছি, প্রজাপতির মত লম্বা জিভওয়ালা ঘটকরা বেকায়দায় পড়ে। আবার মটর, ভুঁই, তুলসী, বকের মত যে সব ফুলের তলার দিককার একটা কি দুটো পাপড়ী লক্‌লকে জিভের মত বেরিয়ে থাকে; কি পোস্তফুলের মত যে সব ফুলের গর্ভমুখটা চ্যাপ্টা; কি পদ্মফুলের মত সে সব ফুলের চাকটাই আসনের মত চওড়া; কি সূর্য্যমুখী, কদমের মত যে সব ফুলের সমস্ত গা-টাই ঢালা বিছানার মত পাতা;—সে সব ফুল সব উড়ো পোকাদেরই পছন্দ—বসবার সুবিধার জন্য। কল্‌কে, ধুতরো, ঈশেরমূলের মত সে সব ফুলের খোলটা বাঁশীর মত লম্বা তাতে কুঁড়ে গামাটানা পোকা আর রাতকানা গুঁড়ো পোকাদের আড্ডা; কেননা বৃষ্টি এলে, কি রাত হয়ে গেলে, তারা ফুলের খোলাকেই ঘরবাড়ী করে নেয়। বাকস ফুলের মত যে সব ফুলে বাঁক আছে, সে সব ফুল আর যে পছন্দ করে করুক—ভ্রমর মৌমাছিরা করে না।

যে-কোন ঘটক যে-কোন ফুলের বিয়ে দিতে পারবে—এটা ভাবাই মস্ত ভুল। বসন্তকালে একটা বাগানে যদি অনেক রকমের ফুল ফোটে, তাহলে সেইখানে গিয়ে একটু নজর করে দাঁড়িয়ে দেখো—দেখবে যে ফুলে প্রজাপতি ঢুকচে, সে ফুলে হয়ত মাছি ঢুকচেনা; যে ফুলে মাছি ঢুকচে, সে ফুলে হয়ত পিঁপড়ে ঢুকচেনা। বিলাত থেকে বীচি নিয়ে গিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় একবার ক্লোভার নামে একরকম গাছের চাষ করা হয়। ফসলে ফুল হল, কিন্তু ফল হল না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, বিলাতে একরকম কালো ভোমরা আছে, যা অষ্ট্রেলিয়াতে নেই—আর ঐ কালো ভোমরা ছাড়া অন্য কোন ঘটকই ক্লোভার ফুলের বিয়ে দিতে পারে না। তখন বিলাত থেকে

গোটাকয়েক কালো ভোমরা নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় ছেড়ে দেওয়া হল—ব্যস্, তারপর থেকেই ক্লোভার গাছের ফল হতে লাগ্‌ল। আমেরিকার কোন কোন দেশে বড্ড ঠাণ্ডা বলে কাঁচের ঘরের ভিতরে শঁসার চাষ করা হয়। আগে আগে তার ফুল হত, কিন্তু ফল হত না। কেন ফল হয় না তাই খুঁজতে খুঁজতে পণ্ডিতরা বের করলেন যে, কাঁচের ঘরের ভিতর মৌমাছি ঢুকতে পারে না বলেই ফুলের বিয়েও হয় না, ফলও হয় না। তখন ফুল ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁচের ঘরের মধ্যে মৌমাছি ছেড়ে দেওয়া হল, শঁসাও ফলতে লাগ্‌ল।

যে ফুলের যে ঘটক, সে ফুল সেই ঘটকের মন জুগিয়ে চলে। গুব্‌রে পোকা আর ভুঁড়ো প্রজাপতি * সন্ধ্যার সময় বেরোয়, কাজেই তারা যে ফুলের বিয়ে দেয়,—যেমন বেল, শিউলী, রজনীগন্ধা,—তারা সন্ধ্যাবেলাতেই ফোটে। উইচিংড়ে, ফড়িং, ঝিঁঝিঁপোকা অনেক রাত না হলে বেরোয় না, তাই লবঙ্গলতা, মালতীর মত যে সব ফুলের ঐ সব ঘটক না হলে চলে না, তারা অনেক রাতেই ফোটে। মৌমাছি, প্রজাপতি, ভোম্‌রা ভোরবেলাতেই বেড়াতে বেরোয়—তাই তাদের ঘটকালির ফুল—পদ্ম, জবা, কল্‌কে—সকালেই ফোটে।

যে সব ফুলের গন্ধ আছে, তারা নিজের নিজের ঘটকের আসবার সময় বুঝে গন্ধ ছড়ায়। পদ্ম, গোলাপ, মটর ফুলের মত যাদের ঘটক হচ্ছে প্রজাপতি আর মৌমাছি—তারা সূর্য্য ওঠা থেকে আরম্ভ করে সূর্য্য ডোবা পর্য্যন্ত গন্ধ ছড়ায়। সূর্য্য ডুবে গেলে ঘটকেরাও বাড়ী

---

* ভুঁড়ো প্রজাপতির ইংরাজী নাম 'মথ্'। এ প্রজাপতির পেটটা অন্য প্রজাপতির চেয়ে মোটা, তা ছাড়া এর ডানার বাহার অন্য প্রজাপতির চেয়ে কম।

ফেরে, তাদেরও গন্ধ মরে আসে—তখন আর কার জন্য গন্ধ খরচ করবে? হাস্‌নাহানা, চীনে লতা আর ধূতরো ফুলের ঘটক সন্ধ্যার সময় বেরোয়; তাই দিনের বেলায় তাদের গন্ধ একরকম থাকেই না—সন্ধ্যা হলেই গন্ধ উথ্‌লে ওঠে। যুঁই, বেল, রজনীগন্ধারও ঠিক তাই।

যে ফুলের যে ঘটক, সে ফুল সেই ঘটকের মনের মত রং পরে সেজেগুজে বসে থাকে। ছোট ছোট পোকামাছিরা যে ফুলের ঘটক, সে ফুলের রং সাদা কি হলদে, কিম্বা সাদার উপর অন্য রঙের ছিট। প্রজাপতিরা সব চেয়ে পছন্দ করে লাল রং, যদি সে লাল রং টক্‌টকে না হয়ে একটু ম্যাড়মেড়ে হয়; আর পছন্দ করে নিজের ডানার মত পাঁচরঙা রং। তাই প্রজাপতিরা যে সব ফুলের ঘটক, তারা হয় গোলাপ জবার মত লাল, নাহয় ঋতুফুলের মত পাঁচরঙা। ভুঁড়ো প্রজাপতি সাদা রংটাই বেশী পছন্দ করে, তবে খুব ফিকে হলে কোন রঙেই তার আপত্তি নেই। বোল্‌তা, ভীমরুল কমলালেবুর মত রং পছন্দ করে। মৌমাছিরা অপরাজিতার মত ঘোর নীল রং সব চেয়ে পছন্দ করে, তারপরই ঝুম্‌কো ফুলের মত বেগুণী রং, তারপর ফিকে নীল, তারপর মেটে লাল, তারপর সাদা, তারপর ফিকে হল্‌দে, তারপর সবুজে। জ্বল্‌জ্বলে হল্‌দে আর টক্‌টকে লাল তাদের দুচক্ষের বিষ। সবুজ মাছিরা কাঁচা মাংসের মত লালচে রং পছন্দ করে। তাই ঘাঁটকোল আর র‍্যাফ্লেসিয়া ফুলের রং কাঁচা মাংসের মত। হামাটানা পোকারা নিজের নিজের গায়ের রং পছন্দ করে, তাই কুমড়ো ফুলের মধ্যে হল্‌দে হামাটানা পোকা, আর লাউ ফুলের মধ্যে সাদাটে সবজে রঙের হামা-টানা পোকা দেখা যায়।

ঘটকদের গায়ে রেণু লাগিয়ে দেবার জন্য, আর ঘটকদের গায়ের রেণু গর্ভমুখে লাগিয়ে নেবার জন্য ফুলেরা যে কত ফন্দী বের করেছে, তা দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। ঘটকরা যে ফাঁকি দিয়ে মধু আর রেণু খেয়ে যাবেন, তার জো-টি নেই।

পোকামাছিতে যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তারা রেণুগুলোকে করেচে চট্‌চটে, যাতে সেগুলো চট্ করে পোকামাছিদের গায়ে লেগে যায়, এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে যাবার সময় গা থেকে না ঝরে পড়ে; এ ছাড়া তারা গর্ভমুখকেও চট্‌চটে করেচে, যাতে পোকা-মাছিদের গায়ের রেণু তুলে নিতে পারে।

কি ফুলেই মধুর থলি এমনভাবে বসানো থাকে যে, তা থেকে মধু খেতে গেলে রেণুটোপ আর গর্ভমুখের সঙ্গে ঘটকদের গায়ের ঘসা লাগবেই।

ভুঁই তুলসী, বাকস, মটরের মত কতকগুলো ফুলে ঘটকরা গিয়ে ফুলের উপর বসবামাত্রই সেই চাপে কেশরগুলো বেঁকে তাদের পিঠের উপর লাগে—আর পিঠে ডানায় রেণু জড়িয়ে যায়। অনেক ফুলে আবার ঘটকরা বসবামাত্রই কেশর গর্ভ দুইই ঠেলে ওঠে—গর্ভটা লাগে ঘটকের পেটে আর কেশরগুলো লাগে পিঠে; তাতে এই হয় যে, ঘটকের পেটে অন্য ফুলের যে রেণু লেগেছিল তা জড়িয়ে যায় এই সব ফুলের গর্ভমুখে, আর পিঠে লেগে যায় এই সব ফুলের রেণু।

ট্যাড়স, লুপিনের মত কতকগুলো ফুলে ঘটকের গায়ে রেণু লাগবার চমৎকার কায়দা দেখতে পাওয়া যায়। রেণুগুলো কেশর থেকে ঝরে তলার পাপড়ীতে জমা হয়। ঘটক পাপড়ীর উপর

বসলেই সেই চাপে কেশরের ডাঁটি গিয়ে ব্যাটের মত রেণুর গায়ে ঘা মারে, রেণুগুলো ছিট্‌কে ঘটকের গায়ে লাগে। . . . .

ঈশেরমূল ফুলের সরু চোঙার ভিতর গুঁড়ো পোকারা দিব্যি ফূর্ত্তির সঙ্গে মধু খেতে ঢুকে পড়ে, বেচারীরা তখন স্বপ্নেও জানে না যে তাদের দিয়ে ফুল ঘটকালি করিয়ে নেবে—মধু খাবার মজা সুদে আসলে আদায় করে ছাড়বে। ফুলের চোঙের ভিতরটা সরু সরু শোঁয়ায় ভরা, শোঁয়াগুলোর মুখ সব নীচের দিকে। ঢোকবার সময় খুব সহজেই ঢোকা যায়, কিন্তু বেরোনই মুস্কিল—শোঁয়ার মুখ গুলোতে পথ আট্‌কে রেখেচে। পোকা বেচারারা সেই ফাঁদের মধ্যে পড়ে যতই বেরবার চেষ্টা করে, ততই কেশরের রেণু মেখে ভূত হয়—ঠিক যেন হোলির দিনে কাউকে জোর করে আবীর মাখিয়ে দেওয়া হচ্চে। এইরকম অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর শোঁয়াগুলো আপনা-আপনি ঝরে পড়ে—তখন পোকারা বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়ে; কিন্তু একটু পরেই যখন আবার ভুলে অন্য ঈশেরমূল ফুলে ঢোকে, তখন তাদের গায়ে-জড়ানো রেণু সেই ফুলের গর্ভমুখে লেগে যায়।

এক একটা ফুল আছে, যারা আর এক ফন্দীতে ঘটকদের গায়ে রেণু মাখিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে সাঁড়াসীর মত কল আছে। মৌমাছি, প্রজাপতি তাদের উপর বসলেই তারা সাঁড়াসী দিয়ে পা চিম্‌টে ধরে—এমন শক্ত করে ধরে যে, অনেকক্ষণ ধরে না টানাটানি করলে কিছুতেই খোলেনা—সেই ধস্তাধস্তির সময় ঘটকদের গায়ে রেণু লেগে যায়। . . . . .

কচু ফুলের বিয়ে দিতে কোন ঘটকই বড় একটা যায় না। একে ত গন্ধ খারাপ, তাতে মধু নেই বল্লেই হয়। তা ছাড়া এ ফুলের

পাপড়ীও নেই যে, রঙের চটকে পাখীরাও এসে ঘটকালি করবে। এ ফুলের মাত্র একটি পেন্সিলের মত ডাঁটি, যার উপরদিকে কতকগুলো কেশর আর নীচের দিকে কতকগুলো গর্ভ বসানো আছে। ঠিক যেন বেয়ে-ওঠা ঘটকদের জন্যই তৈরী—কিন্তু তারা আসবে কি লোভে? হাওয়াতে এ ফুলের বিয়ে দিতে পারে না, কেন না যদিও রেণু খুব বেশী হয়, তবু তা উড়ে যেতে পারে না; যে সবুজ রঙের ঠোঙার মত ফুল পাতা-ডাঁটিটাকে ঘিরে থাকে, তারই ভিতরে পড়ে। তার ঘরোয়া বিয়ে ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু তাই বা ঘটায় কে?—ঘটায় গেঁড়ি আর গুগ্‌লি। কি করে ঘটায় বল্‌চি। বৃষ্টির দিনে মাথা বাঁচাবার জন্য তারা হয় ত গুটীগুটী করে ফুলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সেখানে গিয়েই দেখে দিব্যি মখ্‌মলের মত নরম বিছানা; তখন তারা সরাসর নীচে নেমে গিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে ঘুমোয়, আর রোদ ফুটলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। ফুলের ভিতরকার ডাঁটি ধরে ওঠা-নাবা করবার সময় ফুলের বিয়ে হয়ে যায়।

ডুমুর ফুল আর কাঁটাল ফুল ভারি মজা করে তাদের বিয়ে ঘটায়। তোমরা হয় ত জান ডুমুরের ফুল হয় না—যে ডুমুর ফুল দেখে সে রাজা হয়ে যায়; তাহলে তোমরা সকলেই রাজা হতে পারবে। আসলে ডুমুরের ফুল খুব ছোট্ট ছোট্ট হয় বলে তাদের খালি চোখে দেখা যায় না, অনুবীণ কি আতসী কাঁচ দিয়ে দেখতে হয়। ডুমুর ফুলের বোঁটার মাথা, যাকে চাক বলে, সেটা দেখতে ঠিক তুবড়ীর খোলের মত। তারই মধ্যে একরাশ কুচি কুচি ফুল গাদা থাকে। একে ত তাদের ফুল খালি চোখে দেখা যায় না, তাতে না আছে সে সব ফুলে গন্ধ, না আছে মধু; কাজেই তারা ঘটক ধরবার জন্য অমন

ডুবড়ীর খোলের মত চাক করেচে। পিঁপড়ে কি ছোট ছোট বোল্‌তারা খোলের ছেঁদা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায় ডিম পাড়তে—কেন না বেশ কুঠ্‌রীর মত নিরিবিলি জায়গা। ঢোকবার সময় তারা অন্য ফুলের রেণু মেখে আসে; তাইতেই এ ফুলের বিয়ে হয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের ডিমগুলো যখন পিঁপড়ে কি বোল্‌তা হয়ে ফুটে বেরোয়, তখন তারা এই ফুলের রেণু মেখে বেরোয়; তারপর যখন অন্য ফুলে গিয়ে ঢোকে, তখন সে ফুলের বিয়ে হয়ে যায়।

যে ভাবে ডুমুরের ফুলের বিয়ে হয়, কাঁটাল ফুলের বিয়েও ঠিক সেই ভাবে হয়। সেই জন্যে মাটির নীচেও কাঁঠাল ফলতে দেখা যায়—কেন না পিঁপড়ে, বোল্‌তা মাটি ফুটো করে মাটির মধ্যে ঢুকতে পারে।

জলের ফুল জলকে দিয়েই ঘটকালি করিয়ে নেয়। জলের মধ্যে একরকম গাছ হয়, যার কোন ফুলটা হয় মেয়ে, কোনটা পুরুষ। ফুলগুলো জলের মধ্যে ডুবে থাকে, কিন্তু এমনি মজা যে পুরুষ ফুলটার কেশর যেই পেকে পুরুষ্ট হয়ে ওঠে, অম্‌নি তা বোঁটা থেকে আলাদা হয়ে কাগজের নৌকার মত ভেসে ওঠে, আর কেশরগুলো দাঁড়ের মত চারপাশে ঝুলতে থাকে। মেয়ে ফুলটার গর্ভ যেই পুরুষ্ট হয়, সেও অম্‌নি ভেসে ওঠে, কিন্তু বোঁটা থেকে খসে যায় না। পুরুষ ফুলটা স্রোতে ভাসতে ভাসতে মেয়ে ফুলটার ঘাড়ের উপর এসে পড়ে, আর অমনি তাদের বিয়ে হয়ে যায়। এ ফুলের গাছ তোমরা বোধহয় দেখে থাক্‌বে। এরই নাম পাটাসেওলা বা গঞ্জ।

তোমরা দেখেছ কোন কোন গাছের একটা বোঁটায় একটাই ফুল হয়,—যেমন গোলাপ, যুঁই, চাঁপা—আবার কোন কোন গাছের একটা

বোঁটায় অনেকগুলো করে ফুল হয়,—যেমন আঁব, নারকোল, সোঁদাল, রজনীগন্ধা, সূর্য্যমুখী, মোরগফুল, ফুলকপি। একটা বোঁটায় একটা ফুল হলে তাকে বলে একানে ফুল, আর অনেকগুলো ফুল হলে তাকে বলে ঝাড়ফুল। যে সব গাছের ঝাড়ফুল হয়, তারা একানে ফুলের বদলে ঝাড় ফুল তৈরী করে কেন জান? আঁবের বাসন্তী রঙের ছড়া—যাকে বোল্ বলে,—সে হচ্চে ঝাড়ফুল। ঝাড়ফুলটা দেখতে খুবই বড়, কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষে যখন তার এক একটা কুচো ফুল তলায় ঝরে পড়ে, তখন দেখো তারা কত ছোট। সব ঝাড়ফুলেরই কুচো ফুলগুলো এইরকম ছোট। এক বোঁটায় একটা ছোট ফুল থাকলে তা পাছে পোকামাছিদের নজর এড়িয়ে যায়, তাই তারা এক বোঁটায় এক গাদা ফুল জড় করে রাখে।

রং আর গন্ধ দিয়ে ফুল যে কেবল তার মনের মত ঘটককেই টেনে আনে তা নয়, বাজে ঘটকদেরও টেনে আনে। তারা মধু খাবার রাক্ষস, অথচ ঘটকালি করবার মুরদ তাদের এক কাণাকড়িও নেই। তাদের ভাগিয়ে দেবার জন্য গাছ কত ফিকিরই না বের করেচে। মৌমাছি প্রজাপতি কি হমিং বার্ড * যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তারা অন্য ঘটক মোটেই পছন্দ করে না—কেন না তাদের রেণু

---

* হমিং বার্ড একরকম আমেরিকার পাখী। এত ছোট পাখী আর পৃথিবীতে নেই। এরা দেখতে বোলতার চেয়ে একটু বড়—আমাদের দেশের দুর্গাটুনটুনির অর্দ্ধেক। এদের রঙীন পাখা আর লম্বা লম্বা ঠোঁট। এরা মৌমাছি, ভোমরার মত ফুলের মধু চুষে খায়। এরা যখন ফুলের সামনে ওড়ে, তখন এত জোরে পাখা নাড়ে যে, ভোমরা ওড়বার মত গুন্‌গুন্ শব্দ হয়। এই জন্যই এদের নাম হমিং বার্ড, কিনা গুন্‌গুনে পাখী।

কম, কিন্তু তাদের ঘটকরা তা ঠিক অন্য ফুলে পৌঁছে দেয়; এক দানা রেণুও পথে পড়ে নষ্ট হয় না। তা ছাড়া তারা এত চটপট্ এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে যায় যে, বিয়ে হতে গোটেই দেরী হয় না। পিঁপড়ে, গেঁড়ি, আর হামাটানা পোকারা মধুর লোভে কাতারে কাতারে গাছ বেয়ে ওঠে, কিন্তু তারা কুঁড়ে ঘটক—আস্তে আস্তে গাছ বেয়ে উঠবে, আস্তে আস্তে গাছ বেয়ে নামবে, তারপর তেম্নি আস্তে আস্তে অন্য গাছে গিয়ে উঠ্বে। কাজেই যতক্ষণে তারা একবার বিয়ে দেবে, ততক্ষণ মৌমাছি প্রজাপতির হাতে পঞ্চাশবার বিয়ে হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ঐ কুঁড়ে ঘটকদের এমন তেলচুক্চুকে পিছল গা যে, সমস্ত দিন ফুলের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেও বেশী রেণু গায়ে লাগবে না। আর যদি তারা রেণু মেখে ভূত হয়ে যায়, তবু অন্য ফুলে যেতে যেতে পথেই সমস্ত রেণু গা থেকে ঝরে পড়বে—বিয়েও হবে না, এক গাদা রেণুও নষ্ট হবে। এই সব ঘটকরা যদি মধু খেয়ে যায়, তাহলে মৌমাছী প্রজাপতির মত কাজের ঘটকরা কিসের লোভে আসবে?—তাই তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য গাছেরা নানান্ ফিকির বের করেচে।

তুলসী গাছের গুঁড়ি শোঁয়ায় ভরা, হামাটানা পোকারা উঠ্তে গেলেই গায়ে শোঁয়া ফুটে যায়। শিয়ালকাঁটার গুঁড়ি থেকে লম্বা লম্বা কাঁটা বেরিয়েচে—যেই ফুলখেকো গেঁড়িরা উঠতে যায়, অম্নি নরম মুখে কাঁটার খোঁচা লাগে। বাঁশের গুঁড়ি কাঁচের মত তেলা; অনেক হামাটানা পোকা উঠতে যায়, আর হড়কে পড়ে যায়। তামাকের গুঁড়ি এমন চট্চটে যে, ছোট ছোট উড়ো পোকারা আঠায় জড়িয়ে মরে যায়। অনেক আমগাছের গুঁড়িতে কাঠ পিঁপড়েরা

পালে পালে পাহারা দেয়—অন্য পোকা, পিঁপড়ের সাধ্য কি যে উপরে ওঠে। কোন কোন গাছ আবার তার গুঁড়ির এক একটা গাঁটের কাছে গুঁড়িটাকে ঘিরে পাতার বাটি তৈরী করে রেখেছে। সেই বাটীতে শিশিরবৃষ্টির জল জমে থাকে। হামাটানা পোকারা সেই পর্য্যন্ত উঠে ফিরে যায়। অনেক পিঁপড়ে আছে যারা এম্‌নি নাছোড়-বান্দা যে, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবু মধু না খেয়ে ছাড়বে না। তাদের তাড়িয়ে দিতে না পেরে কোন কোন গাছ ভুলিয়ে রাখার ফিকির করেচে। তারা যে মধু খাবে আর কুটকুট করে ফুলের নরম পাপড়ী কাটবে, তার জো নেই। ফি পাতার গোড়া দিয়ে একরকম মিষ্টি রস বেরোয়, যা ডেঁয়ে পিঁপড়েরা মধু মনে করে, তাতেই মজে থাকে, আর কষ্ট করে উপরে ওঠে না। কিন্তু সে নকল মধু। ওদিকে আসল মধু যে মনের মত পাখা-ওয়ালা ঘটকরা লুটে খাচ্চে, তার খোঁজও এরা পায় না।

ঘরোয়া বিয়ে আটকাবার জন্যও গাছেরা কম ফন্দী বের করে নি। বেশীর ভাগ যমক ফুলের গর্ভ আর কেশর দুই-ই এক সঙ্গে পাকে না। শিমুল, ঢ্যাড়স, জবা, সূর্য্যমুখীর কেশর পাকে আগে; তারপর কেশরের রেণু সব ঝরে গেলে গর্ভ পাকে। চাঁপা, রাংচিতে ঈশেরমূলের গর্ভ পাকে আগে, তারপর গর্ভ গুটি বাঁধলে কেশর পাকে। মসূনে ফুলের কেশর গর্ভ দুই-ই একসঙ্গে পাকে, কিন্তু তার গর্ভটী কেশরের চেয়ে উঁচুতে বসানো, কাজেই গর্ভমুখে রেণু পড়তে পারে না। ঘেঁটু ফুলের কেশর গর্ভ দুই-ই এক সময়ে পাকে, আর দুই-ই মাথায় সমান। কিন্তু তার মজা এই যে, টাট্‌কা ফোটা ফুলে কেশর-গুলো লম্বা হয়ে বেরিয়ে থাকে, আর গর্ভনলীটা উল্টো দিকে বেঁকে

থাকে। যেই কেশরের রেণু ফুরিয়ে যায়, অম্‌নি কেশরগুলো যায় গুটিয়ে, আর গর্ভনলীটা ওঠে খাড়া হয়ে। টাট্‌কা-ফোটা ঘেঁটুফুলের সাম্‌নে ভুঁড়ো প্রজাপতি যখন মধু খাবার জন্য উড়তে থাকে, তখন তার ডানায় কেশরের রেণু লেগে যায়—তারপর যখন সে আর একটা ঘেঁটুফুলে উড়ে যায়,—যা হয় ত আগের রাত্রে ফুটেচে,—তখন গর্ভ-মুখেই তার ডানা লাগে; অম্‌নি বিয়ে হয়ে যায়।

অর্কিড ফুলের* কেশর গর্ভ দুই-ই এক সময়ে পাকে, আর কেশর গর্ভের উপরে বসানো। কাজেই উপর থেকে রেণু ঝরে পড়ে সহজেই ঘরোয়া বিয়ে হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা হয় না। অর্কিডের গর্ভমুখটা একটা ঢাকনীর মত ছোট্ট পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। উপর থেকে রেণু ঝরে পড়লে, তা ঐ ঢাকনীর উপর পড়ে, গর্ভমুখে পড়তে পারে না। মৌমাছিরা যখন ফুলের মধ্যে মাথা চালিয়ে দিয়ে ঢাকনী ফুঁড়ে মধু খায়, তখন তাদের মাথায় জড়ানো রেণু গর্ভমুখে লেগে যায়।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক
ও
শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি।

---

* অর্কিড ফুলের মত দেখতে সুন্দর ফুল আর নেই। এক একটা অর্কিড ফুল গোলাপ পদ্মকেও হার মানিয়ে দেয়—কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্কিড ফুলে গন্ধ নেই। অনেক বড়লোকের বাগানে অর্কিডের বাগান-ঘর (অর্কিড হাউস) দেখতে পাবে।

সাধুমা'র কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাহোক আমরা মামার বাড়ীর বাগানে খুব আমোদে ছিলুম বটে, কিন্তু আমার এক এক দিন কলকাতায় মন ছুটে আস্‌ত, সেদিন আমি যেন স্থির হতুম ও একটু ভাবতুম। আমার বেশ মনে আছে মা বার বার কপালে হাত দিয়ে দেখতেন ও বলতেন—আজ যে বড় চুপচাপ, অসুখ করেছে নাকি? এত ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছ যে? দিদিমা বলতেন ওর আপন দিদিমার জন্যে মন কেমন করছে, তাই ভাবছে। যদিও কথা সত্য, তবু দিদিমা এমন ভাবে বল্‌তেন যে আমার শুনে রাগ হত। এইরকম ক'রে প্রায় ৫।৬ মাস কেটে গেল। তারপর পূজার আগে চিঠি গেল আমাদের কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য। আমার খুব আহ্লাদ হ'ল। সবাই ব'লতে লাগল—আহা, এতদিন ছিল, সব চলে যাবে, এই বলে সকলে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। আমাদের কলকাতার বাড়ী থেকে দিন দেখে চিঠি পাঠালেন। বোট ও গাড়ীভাড়া ঠিক হ'য়ে গেল। তখন কোন্নগরে এত গাড়ী পাওয়া যেত না। আগে ঠিক করতে হত। এক টাকা বায়না দিয়ে রাখতে হ'ত।

আমরা আশ্বিন মাসের ২রা সেখান থেকে রওনা হলুম। তিন দিনে কলকাতায় পৌঁছলাম। কলকাতায় এসে আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কত দৃশ্য—কত জাহাজ, নৌকা, পানসি, কত

লোক স্নান করছে, কেউবা আবার জপ করছে; আবার পটলের নৌকা হ'তে পটলের ঝোড়া আজাড় করে গাড়ীতে তুলে দিচ্ছে, কেউ মুটের মাথায় তুলছে। আবার কোন নৌকায় লাল লাল হাঁড়ি থাক্ থাক্ করে' সাজান হচ্ছে। এইরকম খুব গোলমালে সহরটি গম্‌গম্ করছে। এদিকে ভাড়া গাড়ীগুলি সারবন্দি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের রামু দাদা পান্‌সি করে ধারে গেল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল কখন তীরে নাম্‌তে পাব; কতদিন কর্ত্তামণি, দিদিমা ও দাদাকে দেখিনি; বড়দি, ছোটদির সঙ্গে কতদিন খেলি নি। কত কথা পেটে জমে রয়েছে। সে সব আর পেটে ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তবুও আমি জলটা দেখ্‌তে ছোটবেলা থেকেই ভালবাসতুম্, সেজন্য বোটের একটা জানলা খুলে রেখেছি। আমরা বিস্কুট খেতুম, তার বাক্সের সঙ্গে দড়ি বেঁধে, জলে যে সমস্ত পেঁয়াজ ভেসে যেত সেগুলি তুলতুম, মাঝিদের দেবার জন্যে। মা কেবল বলছেন ঐরকম করে করে শেষে হাতে ব্যথা হবে।

আমরা বসে আছি, হঠাৎ দেখি দাদা গাড়ি করে এলেন। দাদার সঙ্গে বাবার মাসতুতো ভাইও এসেছিলেন। কাকা দাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন দেখেই আমি একেবারে নেচে উঠেছি—ওগো মাগো! দাদা এসেছেন, বড় মজা হবে। তারপর দাদা আমাদের সঙ্গে দেখা করে কত খুসীই হলেন। আমার পেটে যত গল্প জমা ছিল, ইচ্ছা যে দাদাকে একেবারে সব বলে ফেলি। একমুখে পেরে উঠ্‌ছি নে। দাদাও কত জায়গায় বেড়িয়েছেন—দুবার আলিপুর গেছেন। নতুন বাঁদর এসেছে, বাঁদরকে কলা খাইয়েছেন।

যে যে গল্প জমা ছিল বলা হচ্ছে, ও ভাইবোনে খুব গুলজার হচ্ছে। এইরকম গল্প হ'তে হ'তে জোয়ার এল। আমাদের রামুদাদা পাল্‌কি ও দরোয়ান, আর একজন দিদিমার পুরাণো ঝি পাল্‌কির ঘেরাটোপ হাতে ক'রে উপস্থিত। তখন ঘাটে একটা সোরগোল পড়ে গেল। সব লোক হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর এক এক করে বাক্স, বিছানা, ব্যাগ ইত্যাদি নাম্‌তে লাগল। কাকা মাঝিদের বক্‌শিষ্‌ দিলেন। তারপর মা পাল্‌কিতে উঠ্‌লেন ও পাল্‌কির চারপাশে ঘেরাঢাকা পরিয়ে দেওয়া হ'ল। আমরা ভাইবোনে সবাই মিলে গাড়ীতে উঠলুম। একটু পরেই ঠাকুরবাড়ীতে পৌঁছলুম। মা একেবারে মন্দিরে নেবে দর্শন করে বাড়ী যাবেন বলে গিয়ে দেখেন, তখনও গা তোলানো হয় নি। কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর ব্রজঠাকুর এলেন, ঠাকুরের ভোগ আরতি হ'ল। মা দর্শন করে হরির লুট, সন্দেশ ও বাতাসা আনবার টাকা দিয়ে এলেন। প্রণামীও দেওয়া হল। পরে মা বাড়ী এসে দিদিমার সঙ্গে দেখা করে, প্রণাম করে ঘরে গিয়ে সব গোছাতে লাগলেন। আমি আবদার ধরলুম—বেড়াতে যাব, ভাল পোষাক চাই ও এক্ষুনি চাই, আমি কর্ত্তামণির সঙ্গে যাব। মা রাগ করে বকৃতে লাগলেন যে—মেয়ের কি আবদার! এই এলুম, এখন সব গোছাব, না ওর কাপড় দেও, চুল বাঁধ! মেয়ে কি দুষ্টুই না হয়েছে। আমি এরকম অন্যায় আবদারে মাকে কত জ্বালাতনই না করেছি। মার আবার এর জন্যে বকুনি শুনতেও হ'ত দিদিমার কাছে। দিদিমার কানে উঠলেই তিনি বলতেন—কাপড় বের করতে আর কতক্ষণ লাগে? ও কতদিন বেড়াতে যায় নি। সব তাতেই আজকাল মেয়ে ও বৌদের কুঁড়েমি! আমি

এক এক দিন আবার দিদিমাকে গিয়ে বলে দিতুম। সেদিন মা আমার উপর বড় রেগে যেতেন। কিন্তু তিনি কখনও গালাগালি, কি বেশী মারপিট, এ সব জানতেন না। তাঁর বড় বড় পদ্মের মত চোখ ছিল, সেগুলি একটু কুঁচ্‌কে চেয়ে থাকতেন। এইটি তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ছিল। আমাদের উপর, এমন কি ঝিদের উপর রাগলেও তাঁর ঐ একইরকম ভাব হত। যাহোক, সেদিন বেড়াতে গিয়ে নতুন আনন্দ লাভ করলুম। কতদিন বাদে কেল্লার ব্যাণ্ড শুনে আনন্দে প্রাণ নৃত্য করতে লাগল। সন্ধ্যার পর বাড়ী এসে, কাপড় ছেড়ে, দুধ খেয়ে ও-বাড়ীর সবার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তাঁরা আমায় আন্তরিক ভালবাসতেন। আমাকে আদর করে কত কথাই না জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আবার কচুরি, মিষ্টি ইত্যাদি খেতে দিলেন। পরে মাষ্টারমশায়কে খবর দেওয়া হ'ল যে আমি এসেছি, পড়াবার জন্য যেন কাল থেকে তিনি আসেন। পরদিন তিনি এসে পড়াতে বস্‌লেন। পড়া মোটেই হয়নি, তবে যৎটুকু পড়েছিলুম ভুলে যাইনি। ঠিক ঠিক বানান, নাম্‌তা সব মুখস্থ বলে গেলুম। সেদিন থেকে গুরুমশায় আর দুখানা বই বাড়িয়ে দিলেন— বাল্যশিক্ষা আর পদ্যপাঠ। এইরকম লেখাপড়া চলতে লাগল। আমি আদরে বড় হতে লাগলুম। আমি আগে লিখেছি যে বাড়ীতে দুর্গোৎসব আছে বলে আমরা বাগান থেকে চলে আসি। তখন মা দুর্গার অঙ্গে খড়ি হয়েছে, আর চালচিত্র হচ্ছে। আমি চুপ করে বসে বসে ঠাকুর গড়া দেখি—শুধু দেখিনে, আমার মনে মনে সাধ হয় যে আমিও বড় হয়ে এইরকম গড়ব। কেন, কুমররাও মানুষ, আমিও মানুষ। বিজয় মামাও ত কুমোরদের কাছে বসে বসে শিখে নিয়েছেন। আমার

বাল্যজীবনের কথা যতদিন থেকে স্মরণ হয়, ততদিন আমার মনের এই অহঙ্কারটুকুর উদ্দীপনা মাঝে মাঝে উঠত। অথচ আমার ক্ষমতা কিছুই ছিল না, বা নেই। সেদিন একটু মাটি কুমোরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে প্রথম একটী পুতুল গড়লুম। সেটি ভাল হ'ল না। আমার নিজেরই পছন্দ হ'ল না। পরে একটী শিল নোড়া করি, বেশ হ'ল; তারপর একটী নুনের পিরিচে মাটি চেপে চেপে দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে ছাড়িয়ে নিয়ে শুকাতে দিলুম। বেশ মাটির পিরিচ তৈরি হ'ল। আবার তার ধার মায়ের পেনসিল-কাটা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে বেশ বাহারি করে দিলুম। পরদিন ঘিয়ের বাটির ছাঁচে বাটি গড়লুম। মা ও দিদিমা দেখে বললেন—"বাঃ! বেশতো হয়েছে, ছেলেমানুষ বেশ গড়েছে।" আমার আর আনন্দের সীমা নেই! একে নিজের মনে আহ্লাদ হয়েছিলই—আবার নতুন মতলব বের করলুম। আজ ছোট করে একটী উনুন গড়ব। এক টুকরো ভাঙা শ্লেট জোগাড় করেছি, তারই এক পাশে এক কাঠের উনুন করেছি; আর এক পাশে এক কয়লার উনুন করব ভাবছি। কিন্তু কয়লার উনুনে শিক্ দিতে হয়—শিক্ আমি কোথায় পাব? তোষা-খানায় গেলুম। একটা ভাঙ্গা ছাতা পড়ে আছে, কিন্তু সে মস্ত মস্ত শিক্—কি করে ছোট হবে? সে হ'ল না, তখন মাথায় আর এক বুদ্ধি জেগেছে; সেটা দুষ্টু বুদ্ধিই বলতে হবে, কিন্তু যখন উনুন হয়েছে, তখন শিক্ না দিলে ত চলবে না। তখন কি করি, মাথায় মস্ত খোঁপা আছে; তার তিনটি কাঁটা ভেঙ্গে ৬টী শিক্ করে, উনুন গড়া সাঙ্গ করে ফেললুম। এখন আর মনের শান্তি নেই, কবে আমার উনুন শুকবে? আমার পিতলের ছোট ছোট হাঁড়ি, কড়া, হাতা,

খুন্তি ইত্যাদি বাসন আছে। তা ছাড়া তামার পূজার বাসন, পাথরের শিলনোড়াও ছিল। আবার সাহেব বাড়ীর কলের পুতুল, ভাল ভাল বিলাতী খেলনাও ছিল। আমার ও দাদার যে খেলনা কিনতে ইচ্ছা হত, তার কোন বাধা কখনও পাই নি; কে বাধা দেবে? কর্ত্তামণির কড়া হুকুমই আছে যে, ছেলেরা যখন যে খেলনা চায়, খাজাঞ্চিদাদা এনে দেবে। আমাদের আর পায় কে? বেড়াতে গিয়ে যা পছন্দ হত দোকানদারের কাছে চাইতুম। সেও তাড়াতাড়ি অমনি প্যাক করছে, দাদাও সঙ্গে সঙ্গে দাম টুকে নিচ্ছেন। মহিষের গাড়ী করে খেলনা বাড়ীতে আসৃত। এতে কখনও কর্ত্তামণি বলেন নি যে, কেন এত কিনেছ? বাল্যকাল হতে এখন পর্য্যন্ত কখনও কোন ইচ্ছায় বাধা পড়েনি, পরে কি হয় জানি নে। যখন লিখতে আরম্ভ করেছি, তখন সঠিক লিখে যাব।

আমার সাত বছর থেকেই বিয়েব কথা হতে লাগল। আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমার বিয়ের কথা হয়। তাঁরা আমাকে আদর ও আহ্লাদ করে দুই একদিন নিয়েও যান। কিন্তু তখন এ প্রথা ছিল না যে, পাত্রপাত্রীর দেখাদেখি হবে। মেয়েরা নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন, ও পুতুল দিয়ে নানান গল্প করতেন। আমিও আমার দিদিমার সঙ্গে যেতুম।

কিছুদিন পর শুভদিন দেখে আমার আশীর্ব্বাদ হয়ে যায়। পাত্র পক্ষ হতে পাত্রের বড় ভাই এসে দেখে যান, ও আমাকে একটী মোহর দেন। আমার দিদিমাও আশীর্ব্বাদ করে আসেন একটী মোহর দিয়ে। কিছুদিন পরে—বেশ মনে আছে ৮।৯ মাস বাদে—সে পাত্রের নানারকম দুর্নাম রটে। সে কথা দিদিমার কানেও ওঠে। তিনি মা বাবা সকলকে বলেন ও স্থির করেন যে, ও পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে না।

তা ছাড়া কর্ত্তামণির কথাই ছিল, ও কেঁদে দিদিমাকে বলতেন যে—ওকে কোথায় দেবে, কে অযত্ন করবে। এই সকল কথা আমিও একটু একটু শুনি, তবে আমার সদানন্দ মন ওসব কিছুই বোঝে না। পরে নাকি দিদিমা ওদের বাড়ী গিয়ে যা যা শুনেছেন সব খোলাখুলি বলে আসেন। তাঁরা আর কি বলবেন? যার মেয়ে সে যদি না দেয়, তবে ত কোন জোর নেই। এইরূপে আমার প্রথম সম্বন্ধ ভঙ্গ হয়। ওঁদের ভিতরে ভিতরে মনও ভেঙেছিল। যাহোক আমাদের বাড়ীতে ও সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল। আমিও দেখতে বেশ বড় হয়ে উঠলুম। আমি প্রায়ই ঠাকুর বাড়ী যেতুম। ওখানে রোজ তিনবার কীর্ত্তন হত,—ভোরে, পূজার পর, আর সন্ধ্যাকালে। আমার শুনতে বেশ ভাল লাগত। আমার শোন্‌বার বেশি অবকাশ হত না। তবে কোন পালপরব উপলক্ষ্যে যেতুম ও শুনতুম। এ ছাড়া দিদিমার কাছেও অনেক মেয়ে-কীর্ত্তনী আসত। শুনতে চমৎকার লাগত। বৈঠকী গান রোজ হত। আবার কখনও কখনও বাইনাচও হত। তাদের কাছ থেকে অনেক গান শিখে ফেলতুম। আবার গানের বই পেলেই গান করবার সখ হত। আমার প্রাণটা খুব সখের বটে। আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টুমী কমতে লাগল। আমি একদিন গড়ের মঠে বেড়াচ্ছি, দেখি কর্ত্তামণি একটী বেঞ্চে বসে এক ভদ্র-লোকের সঙ্গে গল্প করছেন। আমার কর্ত্তামণির পাশে কে বসেছেন, দেখবার বড়ই ইচ্ছা হল। তখনি ছুটে গিয়ে দেখি অতি সুশ্রী দেবতার মত দেখতে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, আর তাঁর কথাগুলি যেন মধুমাখা। আস্তে আস্তে, খুব মাস্তের সঙ্গে, ভক্তিভাবে কথা বলছেন—আপনার কোন চিন্তা নেই; আমার এক ছেলে, আপনার

পৌত্রী ঘরে নিয়ে যাব, এটা আমি বহু ভাগ্য মনে করি। এই সময় আমি দৌড়চ্ছি, খাজাঞ্চিদাদাও আমার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। অমনি কর্ত্তামণি চোখ ছল্ ছল্ করে তাঁকে বললেন যে—এই শোন, তোমরা কি বলবে বল। আমি অসুস্থ, আমি জানি নে। বাড়ীর ভিতরকে বল ইনি এঁর ছেলের সঙ্গে (আমাকে দেখিয়ে বল্লেন) এর বিবাহের প্রস্তাব করছেন। দেখ বাপু তোমরা বোঝ, আমার ত অসুখ। তখন সেই দেবোপম মূর্ত্তিটী একটু হাসি হাসি মুখে বললেন—আমি নিজে একদিন কাকিমার কাছে যাব'খন। এই কথা বলবার পর তিনি আমার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তখন কর্ত্তামণির মন ভাল নেই, তাঁর অসুখ; সদাই মন উৎকণ্ঠায় ভরা। তাতে আবার আমার বিয়ের প্রস্তাবে মন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। খাজাঞ্চিদাদা বললেন—মশায়, সে ত অতি সৌভাগ্যের কথা। তিনি আমায় শিখিয়ে দিলেন প্রণাম করতে, আমিও প্রণাম করলুম।

সন্ধ্যার পর খাজাঞ্চিদাদা দিদিমার কাছে এসে মাঠে আমার বিয়ের সম্বন্ধে যে যে কথা শুনেছিলেন, সব বললেন। আমাদের বাড়ীতে এ কথা নিয়ে খুব আন্দোলন চলতে লাগল। এইরকমে দশ দিন কেটে গেল। দুর্গাপূজা এসে পড়ল। আমাদেরও নতুন পোষাক ও জরির জুতা পাবার আহ্লাদ সুরু হ'ল। আমার আরও আহ্লাদ হয়েছিল যে, দাদা একলা পূজার নিমন্ত্রণ সারতে বেরতেন, এবার আমার উপর অর্দ্ধেক ভার হ'ল। দাদার হঠাৎ একটু অসুখ হ'ল। অত বাড়ী বাড়ী ঘোরালে তাঁর কষ্ট হবে বলে কর্ত্তামণি বললেন—খুকিকেও খোকার আর একটা পোষাক দিয়ে নিয়ে যাও। সবাই শুনে হাসতে লাগল। দিদিমা বললেন যে—পোষাক না হয় দিলুম,

কিন্তু চুল কিসে ঢাকা যাবে? কর্ত্তামণি বললেন—আমি নিজে বেনারসী পাগড়ী বেঁধে দেব, দেখো দেখি কেমন দেখাবে। এই সব মন্ত্রণা হয়ে আমার পোষাক পরিবর্ত্তন হ'ল। দাদার দুরকম পোষাক হয়েছিল। লাল মখমলের ওপর চুমকি কল্কার কাজ, আর কালো রংয়ের একটা। কর্ত্তামণি বললেন—লালটা একে দাও, বেশ মানাবে। সে ঝাঁপড়টা আমাকেও বেশ মানাল; তবে তাতে জরি ছিল না, বড় বড় লেস্ দেওয়া ছিল। আমার রোজ রোজ গাউন পরে আর ভাল লাগত না। আমার এক একবার মনে হত—আচ্ছা, আমি দাদার মত যদি খোকা হতুম, তাহলে জরির পোষাক পরে কেমন রাজপুত্র সাজতুম। রোজ রোজ কি মেম সাজা ভাল লাগে। ঠাকুর আমার বাল্য জীবনের এই সাধ পূর্ণ করবার জন্যই বুঝি কর্ত্তামণিকে মনে করিয়ে দিলেন। আমি পাগড়ি বেঁধে খোকা সেজে অনেক বাড়ী নিমন্ত্রণ সারলুম। কোন কোন বাড়ীতে দালানে প্রতিমার সামনে টাকা দিয়ে প্রণাম করিয়ে আমাদের খাজাঞ্চিদাদা তাদের সরকারের খাতায় নামটি লিখিয়ে দিলেন। আমরাও প্রতিমা দর্শন করে গাড়ীতে উঠ্লুম। আবার কোন বাড়ীতে বাবুরা চণ্ডিমণ্ডপে বসে আছেন। তাঁরা ভাল করে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তখনি আমার লজ্জা ও ভয় হত। বড় মুস্কিল ত! খাজাঞ্চিদাদা পৌত্র বলেই সারছেন; কর্ত্তামণির নামটি লেখানো হচ্ছে। আবার কোন কোন বাড়ীর দোতলার বৈঠকখানায় উঠ্তে হত। আর এক এক জায়গায় রূপার থালায় মিষ্টি ও রূপার গ্লাসে জল, দুটি মিঠা পানের খিলিও পাওয়া যেত। কোথাও আবার চণ্ডীর গান হচ্ছে। উঠানে লোক জমেছে বিস্তর। আবার এক এক বাড়ীতে দোতলার হলে যাই

নাচ হচ্ছে। এইরকম ঘুরে ঘুরে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বাড়ী যাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। খাজাঞ্চিদাদাকে বলছি—চল, আর কত ঘোরাবে। তিনি তবুও যতদূর পারেন সেরে যেতে চান। কিন্তু সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরা চাই, নইলে কর্ত্তামণি রাগ করবেন। বাড়ীতে আরতির সময় উপস্থিত থাকা চাই। আমি ও দাদা দুজনেই নিমন্ত্রণ সেরে এসেই দালানে দাঁড়ালুম। পরে আরতি দর্শন করে উপরে উঠলুম। ষষ্ঠির দিন বেলবরণ থেকে আনন্দ চলেছে প্রায় কোজাগর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত। বিজয়া দশমীর দিন আমাদের ঠাকুরের সঙ্গে সবাই হেঁটে যেত। আসাসোটা, বল্লম, রূপার ছাতা ইত্যাদি বেরত। আমাদের ঠাকুর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হত, দুখানি নৌকা বেঁধে তার উপর প্রতিমাখানি বেঁধে দিত। আমরা সব ঘাটের উপর ছোট ছোট ছাতা মাথায় দিয়ে বসে দেখতুম। কেন না যে সময় আমাদের প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হত, তখন বেশ কড়া রোদ থাকত। আমাদের সব বাড়ীর ঠাকুর এক ঘাটেই ভাসান হ'ত। তারপর আমরা গাড়ী করে সব ঘাটে ঘাটে ভাসান দেখতুম। পরে বাড়ী গিয়ে শান্তিজল নেওয়া, প্রণাম ও কোলাকুলির ধুম পড়ে যেত। দুর্গা-পূজার এক মাস আগে থেকে আর দশদিন পূজার পর পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ী সরগরম থাকত। আগেই পূজার ধূপ তৈরী, হরেকরকম বড়ি দেওয়া—এ সব কাজ দিদিমা নিজে তদারক করে করাতেন। দিদি-মার একজন বিধবা ভাজ ছিলেন। তিনি প্রায় এখানেই থাকতেন। আর আমাদের একজন পিসিমা ছিলেন। এই পিসিমা পূজার ভাঁড়ারের কর্ত্রী ছিলেন। লোকজন ঘরামীদের খাটানো, জলখাবার দেওয়া, দেখাশোনা সব করতেন। পূজার তিন দিন খুব আমোদ হ'ত।

আমাদের পাশের বাড়ীর পিসিমা, বৌঠাক্‌রুণ আর বড়'মা, মেজমা এঁরা সব আসতেন। সবাই মার ঘরে জমা হতেন। সেখানে গল্প, হাসি ও তাস খেলা হত। তখন এ চাল ছিল না যে, বৌরা সব কাজ করবে। আজকাল এ হাওয়াটা হয়েছে। আর সে হয়েও গেল বহুদিন। আমার বয়স ছিল তখন ৮; এখন আমার বয়স ৪৪ বছর। এতদিনে চালচলন পরিবর্ত্তন হবার কথাই ত। আমার দিদিমার কাছে গল্প শুনেছি যে, তাঁরা যশোর থেকে ৮।৯ বছর বয়সে এসেছিলেন। তাঁরা শ্বশুরশাশুড়ীকে ঠাকুর ঠাক্‌রুণ বলতেন। সুমুখে যেতেন না, কিন্তু দাদাশ্বশুর ও শাশুড়ী যাঁরা থাক্‌তেন, তাঁদের সঙ্গে খুব খেলা, ঠাট্টা, হাসি, গল্প, ফুলের মালা পরানো; এই সব চলত। হোলির সময় মন্দিরে খুব আনন্দ ও উৎসব হত। দাদাশ্বশুররা দিদিমাদের সাদা মল্‌মলের একটি করে পেশওয়াজ দিতেন; আর একখানা করে' ওড়না তৈরী হত, তাতে চওড়া চওড়া গোটা বসানো থাকত। আবার আবীর নেবার জন্য একটি করে ঝোলা তৈরী হত। রূপার বড় গামলায় আবীর গোলা উঠানের মাঝখানে থাকত; আর দিদিমাদের একটা করে রূপার পিচকারী হাতে থাকত। তারপর রং খেলা হত। কিন্তু মা'দের এটা আর ঘটে নি। কারণ তাঁদের ভাগ্যে দাদা দিদি কেউ ছিলেন না যে, নাতবৌ ও নাতিদের নিয়ে আমোদ করবেন। পূজার সময় দেখতুম একবার বেনারসী চেলি প'রে পঁইচে, বাউটি, নথ, মল, এ সব অষ্টালঙ্কারে ভূষিত হ'য়ে পুষ্পাঞ্জলী দিতে সকালে বাড়ীতে যে কটি ছোট বৌ থাকত, তাঁরা সবাই মিলে নামতেন। একটা পুরাণো ঝি সঙ্গে করে নিয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলত যে, বৌঠাকরুণরা এসেছেন—

তাঁদের অঞ্জলী দেওয়াতে হবে। পরে অঞ্জলী দিয়ে এসে পরস্পর সিঁদূর পরানো হ'ত। দিদিমার কাছে সিঁদূর এনে দাঁড়াতেন কিন্তু যতক্ষণ তিনি দিতে না বলবেন, ততক্ষণ দেবার নিয়ম নেই। তারপর যখন তিনি বলতেন দাও, তখন দেওয়া হ'ত। পরে দিদিমা আবার সবাইকে পরাতেন। তারপর যার সিঁদূর তার হাতের সোনা বাঁধানো লোহায় মুছে দিতেন। তখন মা'রা সবাই এক এক করে দিদিমাকে প্রণাম করতেন। তারপর তাঁরা যে যার ঘরে গিয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করে নতুন দেশী কাপড় পরতেন। তখন ঘরামীরা মা'দের জন্য মস্ত বড় বারকোষে জলপান দিয়ে যেত; মা'রা সব কলাপাতায় আজড়ে, বারকোষ ঘরামীদের ফিরিয়ে দিতেন। পরে তার সঙ্গে কচুরী, নিমকি ও সিঙাড়া নিয়ে খুব জলযোগ হয়ে যেত। আমারও সেই সঙ্গে চলত। পরে খিচুড়ি ভোগ হ'য়ে গেলে আমরা এক দফা খেতুম। আমরা কিন্তু পাশের বাড়ী থেকে পূজার তিন দিন মাগুর মাছের ঝোল, লেবু ও গলা ভাত খাবই। আমার মেজমা আমাদের এটি না খাইয়ে আর পূজাবাড়ীতে যেতে পারতেন না। পরে ভোগ হ'য়ে গেল, আবার মা'দের সব প্রসাদ পাওয়া হ'ল; আমরাও একটু আধটু পেলুম।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে।

(সিংহল হতে নেপাল)

২।

আমতলায় বিশ্ববিদ্যালয়।

[মাদাম লেভির ফরাসী হইতে পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১১ই নবেম্বর।—আমাদের জীবনযাত্রা ধীরে সুস্থে গড়ে' উঠছে : বাঙ্গলা পড়াটাই সব চেয়ে নিয়মিত হচ্ছে, আমরা একটি পত্রিকার গ্রাহক হয়েছি, এবং আমাদের ক্ষুদ্র জগতে গুছিয়ে বসে' নিয়েছি। সূর্য্যাস্তের পর (দিনেব বেলা দারুণ গ্রীষ্ম এবং বর্ষার জলে গহ্বরাঙ্কিত এ সব জায়গায় ছায়া দুর্লভ) আমরা ব—র সঙ্গে হেঁটে বেড়াতে যাই। * * * * পাশের গ্রাম গোয়ালপাড়ায় গেলুম : মাটির ঘর, খড়ের চাল, বাড়ীগুলি বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা, ন্যাংটা ছেলের কিলিবিলি, ঢোলের আওয়াজ, হাউই বাজি। আমরা দুর্গা প্রতিমার পূজা ও বিসর্জ্জনের ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। দুই গোটা বাঁশের উপর ভয়ঙ্করী দেবীমাতার মূর্ত্তি চড়ানো হয়েছে ; ডাইনে মহাদেব, তাঁর স্বামী ; বাঁয়ে নারদ, দেবতাদের দূত, কিন্তু Iris*-এর চেয়ে ঢের খারাপ দেখতে ; এ সমস্তই রঙলেপা, সোনার পাতমোড়া, মামুলী,— হয়ত St. Sulpice গির্জ্জার সাজসজ্জায় নীরসতার তুলনায় কিছু কম কুশ্রী। চারিদিকে যে সব ভক্ত ঠেলাঠেলি করছে, তাদের ব—

---

* গ্রীকদের দেবদূত। এমন সময় মাদাম লেভি গ্রামে কোন্ পূজা দেখ্লেন তা' বর্ণনা থেকে বোঝা শক্ত।

বলে' দিলেন সাহেবটি কে ; তারা আমাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিলে, আমাদের মিষ্টান্ন খেতে বল্লে, দেবীর স্নান দেখবার নিমন্ত্রণ করলে,—কাছেই যে ছোট নদী এরই মধ্যে কতকটা শুকিয়ে এসেছে, সেখানে তাঁকে নাওয়ানো ধোওয়ানো হবে। কিন্তু বাড়ী ফিরতে হবে, রাত হয়েছে, আর আকাশে চাঁদ এমন অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি বিস্তার করেছে যে তারার আলো হার মেনেছে। এ আলোয় পড়া যায়।

রবিবার, ১৩ই।—অন্য দিনেরই মত কাজের দিন। এখানে বিশ্রামের দিন হচ্ছে বুধবার, কারণ শুনতে পাই ঠাকুরবাড়ী ও ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে বুধবার দিনের কি একটা যোগ আছে। ব্রাহ্মসমাজ হচ্ছে এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ; ক্যাথলিক ধর্ম্মের সঙ্গে রিফর্মের যে সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সঙ্গে তার সেই সম্বন্ধ। সনাতন শাস্ত্রবচনে, বিশেষতঃ উপনিষদে ধর্ম্মের আদি অকলুষ স্বরূপের অনুশীলনই তার লক্ষ্য।

১৪ই নবেম্বর।—পূর্ণিমার উৎসবের দিন এখানকার অপর য়ুরোপীয়ের সঙ্গে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হল। ঘটনাক্রমে তিনি হচ্ছেন একজন পোলজাতীয় বা লিথুয়ানিয়াদেশীয় ইহুদী, রসায়নবিৎ, এবং জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের পাস্তুর ইন্স্‌টিট্যুটের ছাত্র ; তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন, আমেরিকা য়ুরোপ ঘুরে অবশেষে ভারত-বর্ষে এসে আট্‌কা পড়েছেন। তিনি ছ'মাস হিমালয়ে সন্ন্যাসী হয়ে ছিলেন, তারপরে এখানে এসে ছেলেদের রসায়নবিদ্যা শেখাচ্ছেন। এখানে তিনি হিন্দুর মতই থাকেন। বেশভূষা নিতান্তই সাদাসিধে : তাঁর পেণ্ট্‌লুনের উপর তাঁর খাকী কামিজ উড়ে বেড়াচ্ছে ; যখন দেশে ফিরবেন—যদি কখনও ফেরেন—তাহ'লে ওটার মধ্যে ফের এটা গুঁজে দেবেন, তারপর চল জিলুনায়।

ঠাকুরমশায় আমাদের সঙ্গে এসে খেলেন, আমরা অনেকক্ষণ ধরে' গল্পগুজব করলুম, তাঁর কথা শুনলুম। তিনি আমাদের বল্লেন তাঁর দুই ইংরাজ অধ্যাপকের কথা,—যে ইংরাজদের ভারতবর্ষ জয় করেছে:—ভারতবর্ষ করেছে, না এই ভারতবর্ষীয় হিন্দুটি? তারপর জাতীয় প্রসঙ্গ উঠে পড়ল; অমৃতসরের সেই ভীষণ অধ্যায়ের কথা তিনি স্মরণ করলেন, যার পরে দেশের সরকারবাহাদুরকে তিনি নিজের উপাধি ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন; একজন ইংরাজ-মহিলার উপর রাস্তায় অত্যাচারের ফলে কিরূপ দমন-নীতি চলেছিল। সে বৃত্তান্ত কেবলমাত্র স্মরণ করেই তাঁর গলা কাঁপছিল আর চোখ জ্বলছিল, যদিও ইংরাজরাজ খুব সম্ভব ঘটনাগুলি অস্বীকার করেন।

১৬ই তারিখে আমার নিজস্ব এক ক্ষুদ্র নিমন্ত্রণসভার আয়োজন হল। এখানকার মেয়েরা 'আলাপিনী' নামে এক সমিতি স্থাপন করেছেন; তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন যুদ্ধের সময় আমাদের মেয়েরা কি কাজ করেছে, সে বিষয় তাঁদের কিছু বলতে। আমি মিনিট বারো ধরে' আমার কাঁচা ইংরাজীতে বাধো বাধো কথা বল্লুম, তাঁরা আমার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন, তারপর নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। এই সব স্ত্রীলোকের সঙ্কোচ অসাধারণ; অথচ এঁদের মধ্যে অনেকে কোনকালে 'পর্দ্দা' 'ন'ন—যে রহস্যময় আড়ালের পিছনে ভারতবর্ষের এত স্ত্রীলোক লোকচক্ষুর অগোচরে জীবনযাপন করেন, এঁরা সে ভাবে কখনো বাস করেন নি। কিন্তু খুব শিক্ষিতাদের কাছ থেকেও নত চক্ষু, দু' একটি হুঁ হাঁ এবং মুচ্‌কি হাসি ছাড়া কিছু আদায় করতে পারা যায় না।

আমার একটি ছাত্র বেড়েছে, এবং শ—র ক্লাসে ক্রমশঃ লোক

ভর্ত্তি হচ্ছে। এই ম—ভদ্রলোকটির সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় পড়ার আড্ডা বসাই; এমনি করে' সমস্ত মোলিয়ের আমাদের পড়তে হবে। * * * সমালোচনার বই তার যথেষ্ট পড়া আছে * * * * কিন্তু আসল বই কখনো পড়েনি। বেচারার বইয়ের অভাব এবং জ্ঞানের নিতান্ত অভাব। তার উপর সে নিতান্ত লাজুক, এবং কতকগুলি কথা মনে করতেও তার কানের গোড়া পর্য্যন্ত লাল হয়ে ওঠে। আমরা Sganarelle পড়ব কেমন করে?

১৭ই নবেম্বর।—বৈলাতিক যুবরাজ বোম্বায়ে নেবেছেন, এবং আমাদের জোসেফ মহাত্মা বাজার থেকে ফিরে এসে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। হরতাল এমন সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, আমরা ফলও পাব না, তরকারিও পাব না, এবং কালকের আগে আমাদের কয়লা দেবে না! গান্ধির আদেশ পালন হয়েছে; ভারতবর্ষে সব দোকান, সব আফিস ও সব ইস্কুল বন্ধ হয়েছে। পরে কি কিছু গোলমাল বাধবে? বত্রিশ কোটি লোককে কি অহিংস অসহযোগ ব্রতে বেঁধে রাখা সম্ভব?—তবে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শান্তশিষ্ট এই জাতির অভ্যাস ও মনোভাবের পক্ষে এই ব্যবস্থা অনুকূল বটে।

সওয়া তিনটের সময় সি—তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন, সেই জায়গায়, সেই আমগাছের ছায়ায়, যেখানে আমাদের প্রথম আগমনে সমস্ত শান্তিনিকেতন আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল। গালচের উপর বেয়াল্লিশ জন শ্রোতা আসন হয়ে বসলে, তার মধ্যে ছিলেন সিংহলের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু, তাঁর সুন্দর হলদে রংয়ের কাপড় এমন ভাবে পরা যাতে ডানদিকের কাঁধ খোলা থাকে (দেখো যেম দিক

ভ্রম না হয়! এই ভাইনে বাঁয়ে নিয়ে ব্রহ্মদেশে মারামারি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে; এর উপর শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নির্ভর করছে)। চার জন মেয়ে সেই ভাবেই পিছনে বসেছেন, একটু তফাতে, যেমন এখানকার দস্তুর। নীচু বেদীতে বসে ঠাকুরমশায় নোট লিখছেন; যে পাঠ শেখাবার জন্যে এই ভদ্রলোকটি সোজা প্যারিস্ থেকে এসেছেন, তিনি পরক্ষণেই সেটির সারমর্ম্ম বাঙ্গলায় বল্‌বেন। ভদ্রলোকের ইংরাজি ভাষা খুব সড়গড়ও নয়, খুব চোস্তও নয়, কিন্তু সকলেই মন দিয়ে শুনছে। সে ছবি মন থেকে কখনো মুছে যাবার নয়। "বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ" বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার এই সূত্রপাত হল। প্রতি রবিবারে কলকাতাগত শ্রোতার জন্যে বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ বক্তৃতাবলী।

১৮ই।—বক্তৃতার পর আমরা পাশের একটি সাঁওতাল গ্রামে গিয়েছিলুম। এই সাঁওতালদের সম্বন্ধে অনেক লেখা হয়েছে, এরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীর বংশধর। তারা নিজস্ব বিশেষ অভ্যাস, ভাষা, আচার, ধর্ম্ম সবই বজায় রেখেছে। তারা বেশ কাজ করে, কিন্তু একটা হিসেব রাখতে পারে না; রোজকার কাজের পাওনা তাদের সেইদিনই চুকিয়ে দিতে হয়, নইলে পরদিন আর আসবে না; তারা খুব আমুদে, খুব কারিগর; আমরা দেখলুম তারা দলে দলে তাদের ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার গ্রামগুলিতে ফিরছে; তাদের মধ্যে একজন বাজনদার বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে,—মনে হয় যেন আদি যুগে ফিরে গেছি।

এখানে বেশি দীর্ঘ ভ্রমণ সম্ভবে না; সূর্য্য ওঠবামাত্র তারই জয়! চারটে বেলার আগে আমরা কখনোই বেরই নে; রাস্তাগুলি ঘোর

লাল রঙের, গরুর গাড়ির চাকায় গভীর খাঁজকাটা, সংখ্যায় বড় বেশি নয়,—কিন্তু আমরা পায়ের দাগ ধরে' চলে' যাই, সেগুলি কখনো মিলিয়ে যায়, কখনো শুক্নো নদীর খাতে পৌঁছে দেয়, যেগুলি বর্ষাকালে সত্যিকার নদীর জলে ভরপুর হয়ে উঠবে; বড় বড় ঘাস ও ছুঁচলো কাঁটার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, এত ছুঁচলো যে কাপড়ের মধ্যে, মোজার মধ্যে বিঁধে যায়, ও পদে পদে থেমে পায়ের কাঁটা বাছতে হয়। বাড়ী ফিরে এসে দেখি আমার ছাত্র ও সি—রয়েছেন, সেই সঙ্গে সুন্দর গেরুয়া বস্ত্রধারী সিংহলের সেই ভিক্ষু, এবং একটি বাচ্ছা ভিক্ষু, যার এখনো দীক্ষা হয় নি।

কবি আমাদের সঙ্গে খেলেন, এবং খবর দিলেন যে শীঘ্রই একজন গালিসিয়াদেশীয় ইহুদী যুবতী আসছে, তাকে তিনি য়ুরোপে দেখেছিলেন। সে খুব বুদ্ধিমতী ও বিদুষী, এবং কারু-শিল্পের ইতিহাস শেখাবার জন্য শান্তিনিকেতনে আসতে চেয়েছে। সে একাধারে দার্শনিক, লেখিকা ও নৃত্যকুশলা।

(ক্রমশঃ)

নবম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা

[শিবপুর সাহিত্য-সংসদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩]

আপনাদের সাহিত্য-সংসদের আজকের এই অধিবেশনে আমাকে সভাপতির আসনে আহ্বান ক'রে আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন, তার জন্যে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনারা আমাকে একটু মুস্কিলেও ফেলেছেন। আমি সাহিত্যিক নই, দার্শনিক নই, কবি নই, বক্তা নই—ভাষাতত্ত্বের খুঁটীনাটী হ'চ্ছে আমার আলোচ্য বিষয়,—আমার মাস্টারী ব্যবসায়ের পুঁজিপাটা এই নিয়েই। আমার উপজীব্য এই বিষয়টী আমার নিজের কাছে প্রিয় হ'লেও, আমার আশঙ্কা হয় যে অন্যের কাছে এটা তত আনন্দ-জনক হবে না—এ জ্ঞান আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকেই হ'য়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার কিছু ব'লতে হবে অনুরোধ এসেছে; এখন আমি আমার বাঙলা ভাষার ইতিহাস ছাপাতে ব্যস্ত র'য়েছি, আপনাদের সামনে আর কি নিয়ে উপস্থিত হবো ঠিক ক'রতে না পারায়, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা আর আমাদের এই বাঙালী-জা'তের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে দুটো কথা মনে হয়, তাই আজ আপনাদের সমুখে নিবেদন ক'রবো। মাতৃভাষার প্রতি আপনাদের সকলের আস্থা আর অনুরাগ আছে,—আর নিজের জা'তের সম্বন্ধে সব দেশের মানুষ, বিশেষতো শিক্ষিত মানুষ, আজকাল বেশী-রকমে সাত্মাভিমান; অতএব খালি বিষয়ের গৌরবের জন্যেও আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন ক'রতে সাহস ক'রছি।

পৃথিবীতে আজকাল যতগুলি ভাষা আর উপভাষা প্রচলিত আছে, তার সংখ্যা হবে আট শ' থেকে ন' শ'র মধ্যে। এর ভিতর নাকি দু' শ' কুড়িটী বর্ম্মা-সমেত ভারতবর্ষে বলা হয়; বর্ম্মাকে বাদ দিলে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা নাকি দাঁড়ায়. এক শ' ছেচল্লিশ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনার সময় মোটামুটী ভারতে ব্যবহৃত ভাষাগুলির একটী হিসাব নেওয়া হয়, তখন ভাষার তালিকা তৈরী ক'রে এই সংখ্যা দাঁড়ায়। ভারতবর্ষ নিয়ে' কোনও কথা ব'লতে গেলে বর্ম্মাকে বাদ দেওয়া উচিত; কারণ যদিও বর্ম্মা এখন ভারত সরকারের অধীন, তবু জাতীয়তা, ইতিহাস, ভাষা, রীতি-নীতি সব বিষয়েই বর্ম্মা ভারতের অংশ নয়, সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশ। বরং সিংহলকে ভারতের অংশ ব'লে ধরা উচিত, যদিও সিংহল ভিন্ন সরকার দ্বারা শাসিত। এখন ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা এই যে ১৪৬ ব'লে ধরা হ'য়েছে—একটু চুল-চেরা ভাগ করার ঝোঁক-বশতো-ই সে ভাষার সংখ্যা এত বেশী দাঁড়িয়েছে। যত সব ছোটো-খাটো ভাষা বা উপ-ভাষাকে তাদের মূল ভাষা থেকে আলাদা ধ'রে দেখানোর ফলে, আর দক্ষিণ-হিমালয়, আসাম আর ব্রহ্ম-সীমান্তের (প্রকৃতপক্ষে ভারত-বহির্ভূত) নানা ভাষা এই তালিকার মধ্যে এসে' পড়ায়, সংখ্যাটা এত ফেঁপে বেড়ে উঠেছে। ভারতের ভাষাগুলি চারটী মুখ্য আর স্বতন্ত্র শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে পড়ে:—[১] আর্য্য গোষ্ঠী, [২] দ্রাবিড় গোষ্ঠী, [৩] কোল গোষ্ঠী, [৪] ভোট-চীন বা তিব্বতী-চীনা গোষ্ঠী। আসাম আর বর্ম্মার সীমান্ত, তিব্বত আর হিমালয়ের প্রান্তদেশ জুড়ে' শেষোক্ত অর্থাৎ তিব্বতী-চীনা শ্রেণীর বহু ভাষা আর উপভাষা বিদ্যমান; সংখ্যায় এরা অনেকগুলি, কিন্তু একমাত্র তিব্বতী (আর বর্ম্মায় বর্ম্মী) ছাড়া

অন্যগুলির কোনও সাহিত্যিক স্থান বা প্রতিষ্ঠা নেই, আর অতি অল্প-সংখ্যক ক'রে অনুন্নত অবস্থার লোকেই এই সব ভাষা বলে। কোল গোষ্ঠীর ভাষা হ'চ্ছে সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, কুরকু, শবর, প্রভৃতি। কোল ভাষা এখন ছোটো-নাগপুরে আর মধ্য-ভারতে নিবদ্ধ, কিন্তু এক সময়ে এই শ্রেণীর ভাষা সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল। এই গোষ্ঠীর ভাষা-উপভাষা সংখ্যায় খুব বেশী নয়, আর বহু লোকে যে এ ভাষা বলে তাও নয়,—সব-শুদ্ধ ত্রিশ লাখ-এর বেশী হবে না। কোল ভাষা হ'চ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা—দ্রাবিড়, আর্য্য আর তিব্বতী-চীনা বা মোঙ্গোল জাতের লোক ভারতে আ'স্‌বার আগেও কোল ভাষার (অর্থাৎ কিনা আধুনিক কোল ভাষার অতি প্রাচীন রূপের) প্রচার এ দেশে ছিল। কিন্তু প্রতিবেশী আর্য্য-ভাষীদের প্রভাবে প'ড়ে কোল ভাষা ধীরে ধীরে তার প্রাণশক্তি হারাচ্ছে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই কোল-ভাষী লোকেরা আর্য্য-ভাষা গ্রহণ ক'রে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আস্‌ছে। কোল ভাষার সম্পূর্ণ লোপ-সাধন আর তার জায়গায় বাঙলা, হিন্দী, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি আর্য্যভাষার প্রতিষ্ঠা হ'তে বড় জোর ১০০ বা ১৫০ বছর লাগ্‌বে—অবশ্য কোল-ভাষীরা আর্য্য-ভাষা এখন যে অনুপাতে গ্রহণ ক'র্‌ছে সেটা যদি বজায় থাকে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা মুখ্যতো দক্ষিণ-ভারতে চলে, আর তা'-ছাড়া মধ্য-ভারতে কতকগুলি অনুন্নত জা'ত আর বেলুচীস্থানে ব্রাহুই-জা'তও দ্রাবিড় ভাষা বলে। দক্ষিণ-ভারতে তামিল, মালয়ালী, কানাড়ী ও তেলুগু—এই চারটে হ'চ্ছে সব-চেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন দ্রাবিড় ভাষা। বিশেষতো প্রাচীন তামিল, সাহিত্য-গৌরবে সংস্কৃতের পরেই আসন পেতে পারে। দ্রাবিড়-ভাষী লোকের সংখ্যা সাড়ে ছ' কোটির

কাছাকাছি—আর সুসভ্য দ্রাবিড়গণের আর্য্যধর্ম্ম আর সভ্যতা বাহ্যতো মেনে-নেওয়ার ফলে দ্রাবিড় ভাষাগুলির উপর খুব বেশী ক'রে সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তৃত হ'য়েছে (ব্রাহুই আর মধ্য-ভারতের অর্দ্ধসভ্য দ্রাবিড় জা'তের ভাষাগুলি ছাড়া)।

তার পরে বাকী থাকে আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। সমগ্র উত্তর-ভারতে, আফগান-সীমান্ত থেকে আসাম-সীমান্ত পর্য্যন্ত, আর হিমালয় থেকে মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের বাঙলা অবশ্য এই গোষ্ঠীর একটি বড়ো শাখা। পরস্পরের মধ্যে মিল ধ'রে আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে বিচার ক'রে দেখ্‌লে, এই ক'টী শ্রেণী বা শাখায় এদের ফেল্‌তে পারা যায় ঃ—

[১] পূবে' বা পূর্ব্বী শাখা : এর ভিতর বিহারের মৈথিল, মগহী আর ভোজপুরে' যথাক্রমে এক কোটি, ষাট লাখ আর এক কোটি আশী লাখ লোকে বলে; আর বাঙলা, আসামী, উড়ে', যথাক্রমে চার কোটি নব্বুই লাখ, পনেরো লাখ আর নব্বুই লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত।

[২] মধ্য-পূর্ব্বী শাখা, বা পূর্ব্বী-হিন্দী : এর তিন প্রকার রূপভেদ আছে,—অযোধ্যা প্রদেশের ভাষা আউধী বা বৈসওয়াড়ী, বাঘেলখণ্ডের ভাষা বাঘেলী, আর মধ্য প্রদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলের ভাষা ছত্রিশগড়ী; সব-শুদ্ধ দু' কোটি সাতাশ লাখ লোকে এই পূর্ব্বী-হিন্দী ব্যবহার করে।

[৩] মধ্যদেশীয় শাখা, বা পশ্চিমা-হিন্দী : চার কোটি দশ লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত। এই পশ্চিমা-হিন্দী শাখার মধ্যে পড়ে মথুরা-অঞ্চলের ব্রজভাখা, কনোজ-অঞ্চলের কনোজী, বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলী, অম্বালা-অঞ্চলের আর দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাঞ্জাব অঞ্চলের মৌখিক

ভাষা, আর দিল্লী, মীরাট অঞ্চলের হিন্দুস্থানী। এই শেষোক্ত হিন্দুস্থানীর সাহিত্যিক রূপ দুটী,—এক উর্দ্দু, আর দুই, হিন্দী; এই হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু বা হিন্দী ভারতবর্ষময় এখন ছড়িয়ে' প'ড়েছে, আর ইংরিজীর পরেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

[৪] দক্ষিণ পশ্চিমা শাখা বা রাজস্থানী-গুজরাটী: এর মধ্যে পড়ে মাড়োয়ারী, মালবী, জয়পুরী, হারোতী প্রভৃতি রাজপুতানার নানা ভাষা, যা এক কোটি চল্লিশ লাখ আন্দাজ লোকে বলে; আর পড়ে গুজরাটী ভাষা, যা আনুমানিক এক কোটির কিছু উপর সংখ্যার লোকে বলে।

[৫] উত্তর-পশ্চিমা শাখা: এর মধ্যে আসে পূর্ব্বী-পাঞ্জাবী (এক কোটি আটান্ন লাখ), লহন্দী বা পশ্চিমা-পাঞ্জাবী (আটচল্লিশ লাখ), আর সিন্ধী (ছত্রিশ লাখ)।

[৬] দক্ষিণী বা মারহাট্টী শাখা: এক কোটি নব্বুই লাখ লোক এই ভাষা বলে।

[৭] উত্তুরে' বা হিমালয় শাখা: কাশ্মীর আর পাঞ্জাবের পূর্ব্ব থেকে আরম্ভ ক'রে ভুটান পর্য্যন্ত হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চল আশ্রয় ক'রে এই শাখার নানা ভাষা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে নাম ক'র্‌তে পারা যায় এই তিনটীর—(১) গুর্খালী বা নেপালী বা পর্ব্বতীয়া বা খাস্‌কুরা—গুর্খাদের ভাষা; (২) কুমাউনী, (৩) গাড়োয়ালী। সবশুদ্ধ প্রায় বিশ লাখ।

[৮] সিংহল দ্বীপের আর্য্য-ভাষা সিংহলী—ত্রিশ লাখ।

এ ছাড়া অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে কতকগুলি লোক পশ্চিম এশিয়া আর ইওরোপে ছড়িয়ে' পড়ে। সেই সব দেশে তারা যাযাবর-বৃত্তি, বা ভব-ঘুরে' বেদের জীবন অবলম্বন

করে। ইংরিজীতে এদের Gipsy (জিপ্‌সি) বলে; ইওরোপে বহু স্থলে এই জিপ্‌সিরা এখনও আমাদের ভারতীয় আর্য্য-ভাষাই বলে।

কাশ্মীরে কাশ্মীরী আর ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে কাশ্মীরীর সঙ্গে সংপৃক্ত আরও কতকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে,—যেমন শীণা, চিত্রালী প্রভৃতি; এগুলিও আর্য্য ভাষা, কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য ভাষাগুলি থেকে একটু তফাৎ; আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষার মূল বৈদিক ভাষা, আর কাশ্মীরী প্রভৃতির আকর ছিল যে ভাষা, এ দু'টী পরস্পর স্বস্থ-সম্পার্কে গ্রথিত।

(২)

ইংরিজী ১৯২১ সালের লোক গণনার হিসেবে বাঙলা ভাষা চার কোটি নব্বুই লক্ষ লোকের মাতৃভাষা। এ কথা অনেক বাঙালীর কাছে—আর অ-বাঙালীর কাছেও—নোতুন ঠেক্‌বে যে, সমগ্র ভারতের তাবৎ ভাষার মধ্যে বাঙলাই হ'চ্ছে সব-চেয়ে বেশী-সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা হিসেবে ভারতের আর কোনও ভাষা এত বিস্তৃত নয়। আমাদের দেশে অবশ্য হিন্দুস্থানী বা হিন্দীভাষা আছে, আর ভারতবর্ষে এই হিন্দীভাষার স্থান আর গৌরব বাঙলার চেয়ে ঢের বেশী, তাতে সন্দেহ নেই। বাঙলা ভাষার চেয়ে অনেক অধিকসংখ্যক লোকে হিন্দী ব্যবহার করে বটে; কিন্তু সেটা পোষাকী ভাষা হিসেবে। সিন্ধুদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বাঙলা, আসাম আর নেপালকে বাদ দিলে, সমগ্র উত্তর-ভারতের লোক,—পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, যুক্ত-প্রদেশে, মধ্য-ভারতে, মধ্য-প্রদেশের অনেকখানিতে, আর বিহারে —হিন্দুস্থানী ভাষাকে (তার হিন্দী রূপেই হোক্ আর উর্দূ

রূপেই হোক্) তাদের সাহিত্যের ভাষা ব'লে, বাইরেকার জীবনের ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এইরূপে প্রায় ১৩ কোটি লোকের মধ্যে এখন হিন্দুস্থানীর প্রচলন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ১৩ কোটির মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ আন্দাজ লোক হিন্দুস্থানীকে ঘরে বাইরে সব জায়গায় ব্যবহার করে, হিন্দুস্থানী তাদের মাতৃভাষা; আর এই ১ কোটি ৬০ লাখ ছাড়া আরও আড়াই কোটি আন্দাজ লোকে ব্রজভাখা, কনোজী প্রভৃতি পশ্চিমা-হিন্দী শাখার ভাষা বলে, যে ভাষাগুলি হিন্দুস্থানীর সঙ্গে একই কোঠায় পড়ে, এক হিসেবে যে-গুলিকে হিন্দুস্থানীরই রূপভেদ ব'ল্‌তে পারা যায়। এদেরও মাতৃ-ভাষাকে হিন্দুস্থানী ব'লে ধ'র্‌লে খুব বেশী ভুল হয় না। কাজেই যে ১৩ কোটি লোকের মধ্যে হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তাদের মধ্যে মোটে ৪ কোটি ১০ লাখের সম্বন্ধে বলা যায় যে এরা জা'ত হিন্দুস্থানী-ক'ইয়ে,— হিন্দুস্থানী এদের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ গুরু বা পণ্ডিত বা মুন্‌শী মৌলবীর কাছে বেত-খেয়ে-শেখা ভাষা নয়। বাকি ৮ কোটি ৯০ লাখ ঘরে পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, মালবী, গাড়োয়ালী, আউধী, ছত্রিশগড়ী, ভোজপুরে', মৈথিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলে; কিন্তু বাইরে, সাহিত্যে, সভা-সমিতিতে, ইস্কুলে তারা মাতৃভাষাকে বর্জ্জন ক'রে হিন্দুস্থানীর শরণাপন্ন হয়। এই জন্যেই হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর প্রতাপ ভারতে এত বেশী, এই জন্যেই হিন্দুস্থানী ভারতের আন্তর্জাতিক ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আর এই জন্যেই ভারতের লোক-সমাজে আর জাতীয় জীবনে বাঙলার চেয়ে হিন্দুস্থানীর আসন অনেকটা বেশী জায়গা জুড়ে' র'য়েছে।

কিন্তু তাই ব'লে বাঙলার স্থানও নিতান্ত কম নয়। ভারতের এক-

ষষ্ঠাংশ লোক বাঙলা-ভাষী। কত লোকে এক-একটা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে, সেই সংখ্যা ধ'রে বিচার ক'র্‌লে পৃথিবীর মধ্যে বাঙলার স্থান হ'চ্ছে সপ্তম ;—বাঙলার আগে নাম ক'র্‌তে হয় [১] উত্তর চীনা (২০ কোটির উপর), [২] ইংরিজী (প্রায় ১৫ কোটি), [৩] রুষ (প্রায় ৮ কোটি), [৪] জার্ম্মান (৭৷৷০ কোটি), [৫] স্পেনীয় ভাষা (৫৷৷০ কোটি), [৬] জাপানী (৫ কোটি ২০ লাখের উপর), আর [৭] বাঙলা (৪ কোটি ৯০ লক্ষ)। Culture language বা মানসিক উৎকর্ষের সহায়ক ভাষা হিসেবে, বিদেশী ইংরিজীর পরেই, এদেশের আধুনিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাঙলারই আদর বাঙলার বাইরের শিক্ষিত সমাজেও দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—বিহারী, হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারহাট্টী, তেলুগু, তামিল, কানাড়ী, মালয়ালীভাষী বহু ইংরিজী-শিক্ষিত ভদ্রলোক এখন আগ্রহের সঙ্গে বাঙলা প'ড়্‌ছেন দেখা যায়, আর বাঙলা থেকে নিজেদের ভাষায় বই অনুবাদ ক'র্‌ছেন। হিন্দী বা উর্দ্দূ বা হিন্দুস্থানী ভাষার প্রচার হ'য়েছিল উত্তর ভারতের মোগল যুগের হিন্দুস্থানী-ভাষী শার্দ্দূকসম্প্রদায়ের প্রভাবে, আর হিন্দুস্থানীকে যারা মেনে নিয়েছে এমন লোক বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, রাজপুতানা, পাঞ্জাব থেকে ভারতবর্ষময় ছ'ড়িয়ে-পড়ার ফলে। কিন্তু বাঙলার সাধারণ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের নিজের দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার আর বাঙলা ভাষাকে বহুল পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে'-যাবার সুযোগ ঘটে নি। দু'চার জন শিক্ষিত বাঙালী যাঁরা বাইরে গিয়েছেন, ভাষার দিক থেকে ধ'র্‌লে তাঁরা ত'লিয়ে গিয়েছেন ; কিন্তু বাঙলাদেশে থেকেই, তার সাহিত্যের জোরে বাঙলা ভাষার প্রভাব ভারতের শিক্ষিত লোকের মধ্যে আর

ভারতের অন্যান্য ভাষার উপর বিশেষ-ভাবে বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এখন তার ভাষা আর সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ একটা মমতা-বোধ হ'য়েছে। তার সাহিত্য ছাড়া, শিক্ষিত বাঙালী তার জাতীয় culture বা উৎকর্ষের অপর কোনো দিক্ সম্বন্ধে এতটা গৌরব অনুভব করে না। মহাত্মা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক বাঙলার যাঁরা যথার্থ লোকনেতা হ'য়েছেন তাঁরা সকলেই তার সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে সাহায্য ক'রেছেন। বাঙলা তথা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বাঙলাদেশ আর বাঙালীজা'ত সম্বন্ধে যে প্রার্থনা-গান গেয়েছেন, তাতে তিনি এও চেয়েছেন—

বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা,
বাঙালীর প্রাণে যত ভালোবাসা,—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান্!

আর এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙালীর, সমস্ত বাঙলা-ভাষীরই আকাঙ্ক্ষা।

আপনাদের কাছে আমাদের এই বাঙলা ভাষার, আর এই ভাষা যারা বলে সেই বাঙালী জা'তের উৎপত্তি আর অভ্যুত্থানের দিগ্‌দর্শন ক'র্‌বো। যা নিয়ে' আমরা গর্ব্ব করি, সেই জিনিষটী আমরা যেন সত্য পরিচয়ের দ্বারা আপনার ক'রে নিতে পারি, আমাদের ভালোবাসা আর গর্ব্ব যেন জ্ঞানের অবলম্বনে সুদৃঢ় হয়। আত্মবোধ বা যে কোনও বোধ জ্ঞান-প্রসূত না হ'লে অন্ধ-বিশ্বাস হ'য়ে দাঁড়ায়, আর অন্ধ-বিশ্বাস আত্মঘাতী হয়।

বাঙলা ভাষা এখন সমস্ত বাঙলাদেশ জুড়ে' বিদ্যমান র'য়েছে, এর অস্তিত্ব একটা অতি বাস্তব সত্য। আমরা এই ভাষায় কথাবার্ত্তা কইছি, লিখ্‌ছি, এর জীবন্ত মূর্ত্তি আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমাদের এই বাঙলা ভাষার মূর্ত্তি কিন্তু একমেবাদ্বিতীয়ং নয়। যাকে আশ্রয় করে, ভাষা সেই মানুষের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে প্রকাশ পায়; কাজেই যত মানুষ, তত বিচিত্ররূপে একই ভাষার প্রকাশ। সব ভাষাই একটা বহুরূপী বস্তু—সম্প্রদায়-ভেদে, জাতি-ভেদে, ব্যবসায়-ভেদে, স্থান-ভেদে, ব্যক্তি-ভেদে যেমন এর রূপ বদ্‌লায়, আবার কাল-ভেদেও তেম্‌নি বদ্‌লায়। আবার অবস্থাগতিকে আধুনিক রূপেও প্রাচীনের ছাপ বহুস্থলে দেখা যায়।* বাঙলার এক সাধু-ভাষার রূপ আছে, সেটা এর পুরাতন সাহিত্যিক রূপ। তারপর আছে চল্‌তি ভাষা,—যেটা হ'চ্ছে শিক্ষিত-সমাজে ব্যবহৃত কথাবার্ত্তার ভাষা, ভাগীরথীতীরের ভদ্র-সমাজের ভাষার উপর যার ভিত্তি, যে ভাষা অবলম্বন ক'রে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য আমি নিবেদন ক'র্‌ছি, যে ভাষা এখন বাঙলা দেশের সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে, যে ভাষা আজকালকার বাঙলা-সাহিত্যে সাধু-ভাষার এক প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আর (যে ধারা এখন সাহিত্যে চ'ল্‌ছে সে ধারা বাধা না পেয়ে চ'ল্‌তে থাক্‌লে) যে ভাষা কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র সাহিত্যের ভাষা হ'য়ে দাঁড়া'বে, এখনকার সাধুভাষাকে একেবারে হ'ঠিয়ে দিয়ে'। বাঙলার এই দুই সর্ব্বজন-পরিচিত মূর্ত্তি ছাড়া, আধুনিক কালে বাঙলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত নানা প্রাদেশিক মূর্ত্তিও দেখা যায়। আবার প্রাচীন সাহিত্যেও বাঙলার অন্য মূর্ত্তি পাওয়া যায়, সেই মূর্ত্তি আমাদের চোখে এখন বড়ো বিচিত্র লাগে। এখন, এই সব

মুর্ত্তিকেই সমানভাবে 'বাঙলা' আখ্যা দিতে হয়। এরা একই বাঙলার রূপ-ভেদ। যাকে 'বাঙলাত্ব' গুণ বলা যেতে পারে, তা এদের সকলেরই আছে, অথচ এরা স্বতন্ত্র। এক বাঙলা তরুর এরা নানা শাখা-পল্লব। এই সকল শাখাই স্ব স্ব প্রধান, কেউ কারু চেয়ে কম নয়। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার ক'র্‌লে বাঙলার নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সবাই তুল্য-মূল্য। তবে একটী বিশেষ শাখা অনুকূল অবস্থায় প'ড়ে যখন শিক্ষিত-সমাজের আদরের বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়; কবি আর চিন্তাশীল লেখকের আশ্রয়স্থান হ'য়ে, ভাব আর চিন্তার সার পেয়ে, উচ্চ সাহিত্যের অবলম্বন পেয়ে যখন এই শাখা খুব বেড়ে যায়,—তখন স্বভাবতো অন্য শাখাগুলি এর আওতায় প'ড়ে যায়, আর এর সমৃদ্ধির দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়ে। অন্য শাখাগুলির প্রতি দরদী ভাষাতাত্ত্বিক বা প্রাদেশিক সাহিত্য-রসিক ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টি-পাত করে না। যে ভাষা একদিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আশ্রয়স্থল, আর অন্যদিকে জীবনের রসের দিক্ থেকে সব চেয়ে সুমিষ্ট ফল যার কাছ থেকে আমরা পাই, সেই ভাষা-তরুর উৎপত্তি কি ক'রে হ'ল, তার জড় কোথায়, কতদিনে কি ভাবে এই তরু এত বড়ো হ'য়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবতো কৌতূহল হওয়া উচিত—অন্ততো শিক্ষার স্পর্শে আমাদের এই কৌতূহলের উদ্রেক হওয়া উচিত।

ভাষার static অর্থাৎ কোনও এক নির্দ্দিষ্ট কালে তার স্তব্ধ বা নিশ্চল অবস্থা মনে ক'রে তার আমি গাছের সঙ্গে এই উপমা দিলুম। আবার তার dynamic অর্থাৎ গতিশীল অবস্থা মনে ক'রে বহতা নদীর সঙ্গেই সাধারণতো তার উপমা দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই নদীর উপমাটী বড় চমৎকার। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে কোনও জা'তকে

অবলম্বন ক'রে একটী ভাষার গতি এক দিকে, আর দেশ থেকে দেশান্তর ধ'রে নদীর গতি এক দিকে—এ দুইয়ের মধ্যে বেশ একটা মিল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, এক বংশ-পীঠিকা থেকে আর এক বংশ-পীঠিকায় পারম্পর্য্যক্রমে বহমান হ'য়ে আমাদের ভাষা-স্রোত চ'লে আ'স্‌ছে। আমাদের ভাষা এখন মস্ত এক নদী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—৫ ক্রোড় নরনারীর জিহ্বা আর মস্তিষ্ক জুড়ে' এর বিস্তার; এর নিজস্ব, আর তা ছাড়া বাইরের ভাষা থেকে লব্ধ বিরাট শব্দসম্ভারে এর কূল ছাপিয়ে' উঠেছে; বিশাল ভাবের আর জ্ঞানের ক্ষেত্র এর দ্বারা ফলবান্ হ'চ্ছে; দূর দেশান্তর থেকে নানা ভাবের আর চিন্তার ঐশ্বর্য্য এর স্রোত বেয়ে' এ দেশে আ'স্‌ছে। কত শতাব্দী ধ'রে, কেমন সরলভাবে বা এঁকে-বেঁকে এই নদীর গতি চ'লে এসেছে, কোন্ কোন্ উপনদী এতে এসে প'ড়ে তার কর-সম্ভার দিয়ে' একে পুষ্ট ক'রেছে, কোন্ কোন্ নোতুন খাত এ নিজে খুঁড়ে নিয়েছে; কোন্ মরা গাঙের খাত দিয়ে' বা এর জল বান উজিয়েছে, কোন্‌খানে বা এর জল শুখিয়ে' চড়া প'ড়ে গিয়েছে—অর্থাৎ কিনা কি-রকম ক'রে প্রাচীনতম যুগ থেকে কোন্ ভাষা কি পদ্ধতিতে বদ্‌লে' বদ্‌লে' কবে বাঙলা ভাষার রূপ ধ'রে ব'সেছে, কোন্-কোন্ ভাষা থেকে নোতুন শব্দ এসে এই ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি ক'রেছে; কোন্ সময় আর কি অবস্থায় কি কি বিষয়ে বাঙলা ভাষা তার প্রাচীনরূপ ত্যাগ ক'রে নোতুন রূপ সৃষ্টি ক'রেছে—তা ধ্বনিতেই হোক্, বা প্রত্যয়েতেই হোক্, বা বাক্য-রীতিতেই হোক্; বা কোথায়, কি ক'রে কবে, কোন্ অনার্য্য বা অন্য ভাষাকে তাড়িয়ে দিয়ে' বাঙলা তার স্থান অধিকার ক'রেছে আর সেই লুপ্ত ভাষা

ম'রে গিয়েও তার ছাপ কেমন ক'রে বাঙলা ভাষায় দিয়ে' গিয়েছে; —কোথায় বা বাঙলা ভাষা মেনে নেওয়ার ফলে জা'তের মধ্যে অন্তর্নিহিত মানসিক আর আত্মিক শক্তি স্ফূর্ত্তি পেয়েছে; কি-রকম ক'রে আবার বাঙলা ভাষা তার নিজস্ব শব্দ আর শক্তি হারিয়ে' ফেলেছে, কোথায় বা সাহিত্যে তার বিকাশ হ'তে পারে নি;—এই সবের ফলে কি ক'রে বাঙলা ভাষা তার আধুনিক রূপ পেয়েছে; —এর আলোচনা একটু পুঙ্খানুপুঙ্খ আর অনেকটা এই বিদ্যার শাস্ত্র অনুসারী বিচার-সাপেক্ষ হ'লেও, আমার মনে হয় মানসিক-উৎকর্ষ-কামী ইতিহাসপ্রিয় শিক্ষিত সজ্জনের পক্ষে এটী একটী সার্থক আলোচনা;—কেবল-মাত্র ঐতিহাসিকতার জন্যে নয়, কিন্তু সব বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণশক্তি আর বিচারশক্তিকে জাগিয়ে তোল্‌বার যোগ্যতা ধরে ব'লে, এই আলোচনার বিশেষ একটু মূল্য আছে।

(৩)

বাঙলা আর বাঙলার মতন ভারতবর্ষের অপরাপর আর্য্যভাষার ইতিহাস আলোচনা ক'রতে গিয়ে' কালের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌লে দু'দিকে দুটী অবধি পাই—একদিকে হচ্ছে আমাদের আধুনিক কাল, এই ১৩৩৩ সাল, আর এখনকার চলৃতি বাঙলা ভাষা, যে জীয়ন্ত ভাষা আমরা কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করি; অপর দিকে হ'চ্ছে ঋগ্‌বেদের কাল, আর সেই সময়ের ভাষা, যার নমুনা ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় পাচ্ছি। ভবিষ্যতে বাঙলা কি মূর্ত্তি ধারণ ক'রবে, সে বিষয়ে কল্পনা-জল্পনা করার কোন সার্থকতা নেই। ঋগ্‌বেদের পূর্ব্বে আর্য্যভাষার কি রূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা সব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি নি; কিন্তু

তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ব নামে যে আধুনিক বিদ্যা আছে, তার অনুমোদিত অনুশীলন-রীতি ধ'রে এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে তার অনেকখানি আমরা অনুমান ক'র্‌তে পারি। কিন্তু ঋগ্‌বেদের পূর্ব্বের কোন বই বা লেখা আমরা পাই নে, এখানে তাই বস্তুর অভাব। সেইজন্য কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না; আমাদের অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে খুব সন্দেহের কারণ না থাক্‌লেও, সেটী প্রমাণিত হয় না। ঋগ্‌বেদের পূর্ব্বের যুগের আর্য্যভাষার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা, আর তাকে তার দুহিতৃ-স্থানীয় বৈদিক, প্রাচীন ইরাণীয়, গ্রীক, লাটিন, কেল্‌টিক, জার্ম্মানিক, শ্লাভ প্রভৃতির পরস্পরে তুলনা দ্বারা নোতুন ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার প্রয়াস বেশ একটা কৌতুকপ্রদ বিদ্যা। কিন্তু বাঙলার সঙ্গে তার যোগ তিন পুরুষ অন্তরিত; এ যেন কোনও মানুষের জীবনচরিত লিখ্‌তে গিয়ে তার বৃদ্ধপ্রপিতামহ থে'কে আরম্ভ ক'রে ক' পুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করা। আমাদের এখন অত দূরের কথা ভাববার দরকার নেই। ঋগ্‌বেদের ভাষা ভারতের আর্য্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। ঋগ্‌বেদের ভাষায় এমন একটা কিছু পাওয়া যায়, যার থেকে এর প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়; আর যেখানে আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির জড় গিয়ে পৌঁছেচে, এ যে সেইখানকার পরিচয় দেয়, তা বুঝ্‌তে বাকি থাকে না। সকলেই জানেন যে, ঋগ্‌বেদ দেবতাদের আরাধনাবিষয়ক কবিতা বা স্তোত্রের একটি সংগ্রহ—এতে ১০২৮টী স্তোত্র আছে। এই সব স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি বা কবিরা রচনা ক'রেছেন। এগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, পরে সংগ্রহ ক'রে একখানি বইএ সঙ্কলন করা হয়। এই সঙ্কলনটি কবে যে করা হ'য়েছিল, তা নিশ্চিত রূপে জানা যায় না; তবে কেউ কেউ মনে করেন সেটি আনুমানিক

১০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বের দিকে হ'য়েছিল, কারও বা মতে আরও ২।৩ শ' বছর পরে, আবার অন্য অনেকে বিশ্বাস করেন যে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ১৫০০ বা ২০০০, বা ২৫০০ বা ৩০০০, বা ৪০০০ বছর পূর্ব্বে, এমন কি তারও আগে, এই সঙ্কলন হ'য়েছিল। আমি প্রথম মতটাকেই, অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বকেই সমীচীন ব'লে মনে করি—তার পরে হ'তেও পারে তা স্বীকার করি, কিন্তু তার পূর্ব্বে আর যেতে চাইনে। কিন্তু অন্য সব মতের কথা এখন আলোচনা ক'র্‌বো না। আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বে সঙ্কলিত হ'লে, ঋগ্‌বেদের সূক্ত বা স্তোত্রগুলির রচনাকাল তার ৩,৪ ৫,৬ শ' কি আরও বেশী বছর আগে ব'লে অক্লেশে ধরা যেতে পারে। ঋগ্‌বেদের পর, অর্থাৎ মোটামুটি ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব থেকে, আধুনিক বাঙলা, হিন্দী, মারহাট্টী পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে আদি আর্য্য-ভাষার নদী ব'য়ে এসেছে। ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব থেকে আজকালকার দিন পর্য্যন্ত—ধরা যাক্ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—এই প্রায় ৩৫০০ বছর ধ'রে আর্য্যভাষার গতির নিদর্শন আমরা মোটামুটি একরকম বেশ পরিষ্কার-ভাবে দেখ্‌তে পাই ভারতবর্ষের সাহিত্যে—বেদ-সংহিতায়, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে, উপনিষদে, বৌদ্ধ পালি আর গাথা-সাহিত্যে, মহারাজ অশোকের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন শিলালেখে, জৈনদের প্রাকৃত সাহিত্যে, সংস্কৃত নাটকে—ইতিহাসে, পুরাণে—কাব্যে, প্রাকৃত আর অপভ্রংশ সাহিত্যে, আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সাহিত্যে, আর আজকালকার কথিত ভাষাগুলির মধ্যে। এ যেন একটা লম্বা ভাষার শিকল বৈদিক কাল থেকে আমাদের যুগ পর্য্যন্ত চ'লে এসেছে,—পর পর এক এক যুগের বা কালের সাহিত্যে তখনকার ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি হ'চ্ছে এই শিকলটার এক একটী কড়া বা আংটা। কিন্তু কালের

মহিমায় আর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এই শিকলের প্রত্যেক কড়াটী বা আংটাটী এখন আর যথাযথ একটীর পর একটী ক'রে পাওয়া যায় না, কারণ পর-পর প্রত্যেক বংশ-পীঠিকা বা শতক-পাদ বা শতকের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে আ'সেনি। যেখানে যেখানে এই কড়ার অভাবে ফাঁক র'য়ে গিয়েছে, সেখানে-সেখানে কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে' ভাষার গতি হ'য়েছিল, সেটা অনুমান ক'রে নিতে হয়। ভাষা-স্রোতস্বিনী ব'য়ে এসেছে ঠিক্, কিন্তু অনেক জায়গায় সাহিত্যের অভাবে তার ধারার রেখাটি অস্পষ্ট, আর এই অভাব তাকে বহু স্থানে আমাদের চোখের আড়ালে অন্তঃসলিলা ক'রে অজ্ঞাতের বালির তলা দিয়ে' বইয়ে' এনেছে।

এখন আমরা মন দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের ভাষার বর্ণনা লিখে' রেখে যাচ্ছি, আমাদের বিরাট আর প্রবর্দ্ধমান সাহিত্যে চিরকালের জন্য আমাদের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে থাক্‌ছে; আর তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রসাদে গ্রামোফোনের রেকর্ডে গানে আবৃত্তিতে, কথোপকথনে, বক্তৃতায় আমাদের ভাষার ছায়া ধরা থাক্‌ছে—ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের ভাষাচর্চ্চায় এগুলি বিশেষ সহায়তা ক'রবে, এগুলি একেবারে অপরিহার্য্য হবে। সুতরাং আমাদের এই কালের ভাষার আলোচনার জন্য আজ থেকে দু তিন শ' বছর পরে যে-সব ভাষাতাত্ত্বিক পরিশ্রম ক'র্‌বেন, তাঁদের জন্য অনেক উপযোগী মাল-মশলা বেশ ভাল ক'রেই প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌ছে। সন ১৫৩৩ বা ১৭৩৩ সালে ভাষাতত্ত্ব বা উচ্চারণতত্ত্ব-রসিকেরা, এমন কি কাব্যরস-রসিকেরাও অক্লেশে রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরই গলায় রেকর্ডে শুন্‌তে পাবেন—ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েদের প্রতি দৃষ্টি রেখে' ইওরোপের কোথাও

কোথাও ভাষাতত্ত্ব সংগ্রহাগারে এইরকম সব রেকর্ড রক্ষিত হ'চ্ছে। আমরা যদি চণ্ডীদাসের মুখের গানের রেকর্ড পেতুম, যদি বুদ্ধদেবের সময়ে গ্রামোফোনের রেওয়াজ থাক্‌ত, আর যদি তাঁর দু' একটা উপদেশ তাঁরই ভাষায়, তাঁরই কণ্ঠে শুন্‌তে পেতুম! বৈদিক ঋষিদের বেদ-গান তেমনি ক'রে যদি শোন্‌বার উপায় থাক্‌ত! এ কথাগুলি পঞ্চানন্দী ঢঙে অশ্রদ্ধা-মিশ্রিত রহস্যের ভাবে ব'ল্‌ছি না—আমি খালি উদাহরণ-স্বরূপে এই কথাটা দেখাবার জন্যই ব'ল্‌ছিলুম যে, অল্পস্বল্প সাহিত্যের উপর নির্ভর ক'রে আম্‌রা যে যুগের ভাষা আলোচনা করি, আমাদের সেই আলোচনা সেই যুগের ভাষার স্বরূপটি কত-টুকুই বা দেখাতে সমর্থ হয়। ভারতীয় আর্য্যভাষার ইতিহাসে আবার দেখি যে, বহু স্থলে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে' এই সাহিত্যের সাক্ষ্য-টুকুও অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য। বাঙলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ক'র্‌তে গেলে বস্তুর অভাবজনিত এই অসুবিধাটুকু আমাদের পদে পদে বাধা দেয়।

বাঙলা ভাষার অবস্থা এখন বেশ বাড়-বাড়ন্ত। এক শ' বছর আগে এই ভাষার কি অবস্থা ছিল তা আমরা তখনকার সাহিত্য থেকে কতকটা বুঝ্‌তে পারি। তখন দু' এক খানা ব্যাকরণও লেখা হ'য়েছে, তা থেকে আমরা কিছু কিছু খবর পাই, আর বুঝ্‌তে পারি যে সাধু-ভাষা, চল্‌তি-ভাষা, প্রাদেশিক-ভাষা প্রভৃতি নানারূপে বহুরূপী হ'য়ে তখন বাঙলাভাষা প্রকটিত ছিল। তার পূর্ব্বের যুগের বাঙলার নিদর্শন কেবল তখনকার রচিত সাহিত্যেই পাই; বাঙলা ব্যাকরণ তখন লেখা হয় নি, তাই তার সাহায্য আর মেলে না। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাভাষা, প্রথম ছাপার অক্ষরে ওঠে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় আঠারো শ' সাল

পেরিয়ে তবে ছাপাখানার দ্বারা বাঙলা ভাষা আর বাঙলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। আঠারো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্য হাতের লেখা পুঁথিতেই নিবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোলো থেকে আঠারো শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তর বাঙলা পুঁথি পাওয়া যায়, তার থেকে ওই ছু' শ' বছরের বাঙলা ভাষার সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'র্‌তে পারা যায়। আর ওই ছু' শ' বছরের আগেকার সময়ের, অর্থাৎ কিনা ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকারও ভাষার সম্বন্ধে কতকটা অনুমান এই সব পুঁথি থেকেই ক'র্‌তে পারি, কারণ ষোলো শ'র আগে রচা অনেক বই ষোলো শ'র পরে নকল করা হ'য়েছে; এই সব নকলে একটু আধটু (কোথাও বা অনেকখানি) মূল থেকে ব'দ্‌লে গেলেও, পুরানো ভাষা অনেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু বই লেখার ২।৩ শ' বছর পরে নকল-করা তার যে পুঁথি পাওয়া যায়, সে পুঁথি থেকে মূল রচনার কালের ভাষার যথার্থ অবস্থা সব সময় বোঝা যায় না, কারণ যারা নকল ক'র্‌ত তারা তো আর ভাষাতাত্ত্বিক ছিল না, যে অবিকল নকল করবার চেষ্টা ক'র্‌বে; আর সে ইচ্ছে থাক্‌লেও তারা মানুষ ছিল, কল ছিল না— তাদের নকলে সময়ে-সময়ে ভুল-চুক হ'ত, আর শব্দ আর প্রত্যয়ের পুরানো রূপ ঠিক থাকৃত না, ব'দ্‌লে যেত; ফলে অবশ্য ভাষা নকলের যুগের লোকের পক্ষে সুপাঠ্য হ'য়ে যেত। কাজেই যে সময়ের বই, সেই সময়ের পুঁথি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। জলের দেশ বাঙলা, কাগজ সহজেই প'চে যায়, তালপাতার কালির দাগ ধুয়ে' মুছে-যায়: তা'ছাড়া উইয়ের উৎপাত আছে, ঘর পোড়া আছে, বন্যা আছে, আর আছে অজ্ঞ বা অক্ষম লোকের যত্নের অভাব। খুব পুরাতন পুঁথি এই কারণে মেলা দুর্ঘট। ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের বাঙলা পুঁথি খুবই কম পাওয়া

যায়। যে দু'চার খানি পাওয়া যায়, ভাষার আলোচনার পক্ষে সেগুলির মূল্য খুবই বেশী। পনেরো শ' খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা বাঙলা পুঁথি অপ্রাপ্য ব'ল্‌লেই হয়। সুতরাং পনেরো শ' সালের আগের বাঙলার স্বরূপ জান্‌বার জন্যে পরবর্ত্তী কালের, অর্থাৎ ১৬।১৭ বা ১৮ শ' সালের দিকে নকল করা ১৫ শ' খ্রীষ্টাব্দের আগেকার কবিদের লেখা বই-ই একমাত্র অবলম্বন। চণ্ডীদাস্ খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের শেষ পাদে জীবিত ছিলেন, তিনি হ'চ্ছেন পুরাতন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর দু' এক শ' বছর পূর্ব্বেও বাঙলায় কবি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পরে হ'চ্ছেন কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, মালাধর বসু, শ্রীকরণ নন্দী প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ১৫৫০-এর আগেকার লোক। কিন্তু এঁদের সময়ের পুঁথি নেই—পরবর্ত্তী বিকৃত পুঁথিই এঁদের সম্বন্ধে একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং বাঙলা ভাষার গতি আলোচনা ক'র্‌তে গেলে এই কথাটাই সব প্রথম আমাদের চোখে খোঁচা দেয় যে, ১৬০০ সালের পূর্ব্বেকার ভাষার খাঁটি নিদর্শনের একান্ত অভাব। বস্তুকে অবলম্বন ক'রেই ইতিহাস গড়ে' ওঠে। এখানে এই বস্তুর দৈন্যটা কেবলমাত্র জল্পনা-কল্পনার প্রশ্রয় দেয়, অবস্থাটা সত্য-সত্য কি ছিল তা জান্‌তে দেয় না। বাঙলা সাহিত্যের পারম্পর্য্য বা ইতিহাস খ্রীষ্টীয় ১৩ শ' বা তার আগে গেলেও, ১৬ শ' সালের আগেকার যুগের বাঙলা ভাষার অবিসম্বাদিত নমুনা পাওয়া যায় না। জাতীয়-গৌরবের অনুভূতিতে পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে এরূপ অবস্থা খুব আত্মপ্রসাদ-জনক বা আশাপ্রদ নয়।

(৪)

তারপর, বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি আর বিকাশ যে কবে

হ'য়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বা কিংবদন্তী আমাদের সাহিত্যে নেই। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের তৃতীয় পাদের পূর্ব্বে, সবই অন্ধতমিস্রাচ্ছন্ন। তার পূর্ব্বে অবশ্য বাঙালী গান বাঁধ্‌ত, কাব্য লিখ্‌ত, কিন্তু সে সব গান আর কাব্য লোপ পেয়ে' গিয়েছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে দু' একটা নাম পাওয়া যায় মাত্র—যেমন ময়ূরভট্ট, কানা হরিদত্ত, মাণিকদত্ত। হ'তে পারে এঁরা চণ্ডীদাসের আগেকার লোক, কিন্তু এঁদের সময়ের ভাষার নিদর্শন নেই, এঁরা যে কত প্রাচীন তার কোনও প্রমাণ নেই। বেহুলা-লখিন্দরের কথা, লাউসেনের কথা, গোপীচাঁদের কথা, কালকেতু-ধনপতি-শ্রীমন্তের কথা,—এগুলি বাঙলার নিজস্ব সম্পত্তি; রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মত এগুলি সুপ্রাচীন উত্তর-ভারতীয় হিন্দু-জগতের কাছ থেকে পৈতৃক রিকৃথ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ নয়। দেখ্‌ছি যে চণ্ডীদাসের পরে এই সব কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে বাঙলা সাহিত্যের গৌরব স্বরূপ কতকগুলি বড়ো বড়ো কাব্য লেখা হ'য়েছে। এই কাব্যগুলির আদিরূপ বা কাঠামো নিশ্চয়ই চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল;—কিন্তু এটা একটা প্রমাণসাপেক্ষ অনুমান মাত্র। নিদর্শনের অভাবে, চণ্ডীদাসের পূর্ব্বেকার সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অবশ্যম্ভাবী। কেউ-কেউ অতি আধুনিক বাঙলা গান আর ছড়া কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রে সেই যুগে নিয়ে' গিয়ে' একটা কাল্পনিক বৌদ্ধ-যুগ খাড়া ক'রে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস গ'ড়তে চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু এই কাল্পনিক যুগের লেখক, বই, সন তারিখ, এমন কি 'ঐতিহাসিক' ব্যক্তি ক'টিও নিতান্তই কাল্পনিক।

বাঙলা ভাষার ইতিহাস আলোচনার এই যে অবস্থা—অর্থাৎ ১৬শ'

বা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের পুঁথির অভাব,—বাধ্য হ'য়ে বহুদিন ধ'রে আমাদের এই অবস্থাতেই আট্‌কে থাক্‌তে হ'য়েছিল; অথবা কল্পনা দিয়ে তার আগেকার ফাঁক পুরিয়ে' নেবার 'ঐতিহাসিক' আর 'সাহিত্যিক' অনুসন্ধান চ'ল্‌ছিল। কিন্তু বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের পরম সৌভাগ্যের ফলে আজ বছর দশেক হ'ল দু' খানি বই আবিষ্কৃত আর প্রকাশিত হ'য়েছে, যার দ্বারা আমরা ১৫শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার বাঙলার খুব মূল্যবান্ নিদর্শন পেয়েছি। এই বই দু'খানি হ'চ্ছে, [১] চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, আর [২] প্রাচীন বাঙলা চর্য্যাপদ। প্রথম খানি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন; বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামে, গোয়ালঘরের মাচার উপরে এক ধামার ভিতরে আর পাঁচখানা বাজে পুঁথির সঙ্গে এই অমূল্য জিনিসটী ছিল। বসন্তবাবুকে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ঘুণ বলা হ'য়েছে, এটী তাঁর যথাযথ বর্ণনা; এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ বাঙলা দেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন ব'লে তো জানিনে। তিনি সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালার কর্ত্তা ছিলেন, তাঁর আবিষ্কৃত এই বইখানি ১৩২৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশ করা হ'য়েছে। পুঁথিখানির অক্ষর দেখে প্রাচীন-লেখ-বিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির ক'রেছেন যে, এখানি ১৩৫০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে লেখা। বাঙলা ভাষায় এমন প্রাচীন পুঁথি আর নেই। দু' একজন সুপণ্ডিত সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে প্রতিকূল মত দিয়েছেন; কিন্তু তাঁদের সংশয় অমূলক ব'লে আমার মনে হয়। বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে' আলোচনা ক'রে আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের এ-দিকের

কিছুতেই হ'তে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বিষয়ক কাব্য। কবি নিজেকে বাসলীর সেবক বড়ু চণ্ডীদাস ব'লে ভণিতায় উল্লেখ ক'রেছেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের মাত্র দু' একটীর সঙ্গে এর পদের মিল পাওয়া যায়। এর ভাষা সাধারণতো চণ্ডীদাসের প্রকাশিত পদাবলীর ভাষার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক, কারণ মুখে গীত হওয়ায় আর নিরঙ্কুশ আর সাধারণতো অর্দ্ধশিক্ষিত আঁখরিয়া বা নকল-নবীশের হাতে প'ড়ে, মূল কবির ভাষা এই ৪।৫ শ' বছরের মধ্যে যে ব'দ্‌লে যাবে তা নিঃসংশয়। কেউ কেউ বলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লেখক চণ্ডীদাস আর পদাবলীর চণ্ডীদাস দু'জন আলাদা কবি, এক লোক নন; আবার কারো মতে দুইএর বেশী চণ্ডীদাস ছিলেন। কিন্তু সে কথায় আমাদের এখন কাজ নেই—কারণ আমরা ভাষা আলোচনা ক'র্‌ছি, সাহিত্য নয়। এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা ১৪ শতকের লেখা মূল পুঁথি পাচ্ছি, এতে ঐ যুগের ভাষা—সাহিত্য বা গানের ভাষা—পাওয়া যাচ্ছে; যারই লেখা হোক্ না কেন, ক্ষতি নেই। এই বই পাওয়ার ফলে বাঙলা ভাষার ১৫৫০ সাল থেকে আরও ১৫০। ২০০ বছরের আগেকার দলিল মিল্‌ল, তার ইতিহাসের বনিয়াদ আরও পাকা হ'ল।

তারপর চর্য্যাপদের কথা ধরা যাক্। ১৩২৩ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে আনা 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নাম দেওয়া একখানা পুঁথি অন্য তিনখানা পুঁথির সঙ্গে একত্র ছাপিয়ে' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। বাঙলা ভাষার আলোচনায় এই চারখানি পুঁথির মধ্যে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের' বিশেষ স্থান আছে—অন্য তিন

খানির ভাষা বাঙলা নয়, সুতরাং সেগুলির বিষয় এখানে এখন কিছু ব'ল্‌বো না। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে গোটা পঞ্চাশেক গান আছে, এই গানগুলিকে চর্য্যা বা চর্য্যাপদ বা পদ বলে, আর এগুলির ভাষাকে পুরানো বাঙলা ব'ল্‌তে হয়; আর এই গানগুলির উপর একটী সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলির বিষয় হ'চ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুষ্ঠান আর সাধন—সব হেঁয়ালীর ভাবে লেখা, বাইরে একরকম মানে, তার কোনও গভীর বা বোধগম্য অর্থ হয় না; ভিতরে দার্শনিক বা সাধন-প্রক্রিয়ার কথা আছে। এর সন্ধান বাইরের লোক—যারা ঐ সাধন-পথের গুহ্যতত্ত্ব জানে না—তাদের পাওয়া কঠিন। যে পুঁথিতে চর্য্যা-পদগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার বয়স শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথির চেয়ে বেশী নয়; কিন্তু যে গানগুলি এতে রক্ষিত আছে, সেগুলির বয়স আরও প্রাচীন। এই চর্য্যাপদগুলির ভাষা আলোচনা ক'রে আমার নিজের ধারণা এই হ'য়েছে যে, এই গানগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চেয়ে অন্ততঃ দেড় শ' বছর আগেকার;—দু চারটী বিষয় থেকে অনুমান হয় যে, যাঁরা এই গান লিখেছিলেন তাঁরা খ্রীষ্টীয় ৯৫০ থেকে ১২০০-র মধ্যে জীবিত ছিলেন। এতে সব চেয়ে প্রাচীন বাঙলার খানিকটা নিদর্শন পাচ্ছি। কিন্তু কোনও কোনও স্থল থেকে তর্ক উঠেছে, এই চর্য্যাপদ-গুলির ভাষা সত্যি-সত্যি বাঙলা কি না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় নোতুন ক'রে এই প্রশ্ন তুলেছেন, আর এর ভাষা যে বাঙলা নয়, সে পক্ষে তাঁর যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর আপত্তির বিচার বা খণ্ডন করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর হবে না; তবে চর্য্যাপদের ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা ক'রে আমার নিজের নিশ্চিত মত এই দাঁড়িয়েছে যে এর ভাষা বাঙলাই বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণে

এতে পশ্চিমা-অপভ্রংশের দু'চারটে রূপ এসে গিয়েছে, তাতে এর ভাষার 'বাঙলাত্ব' যায় না। চর্য্যাপদ পাওয়ার ফলে বাঙলাভাষার আর একটি মূল্যবান দলিল বা'র হ'ল, বাঙলা ভাষার বিকাশ আর গতি নিয়ে বিচার করবার উপযুক্ত বস্তু মিল্‌ল—মোটামুটি খ্রীষ্টীয় ১০০০ সাল পর্য্যন্ত আমাদের ভাষা আর সাহিত্যের প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া গেল।

(৫)

এর পূর্ব্বের যুগে কিন্তু বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে কোনও খবর আমরা পাই নে। খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্ব্বে বাঙলাদেশের ভাষায় লেখা কোনও বই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। তখন অবশ্য বাঙলা ভাষা বা তার আদিম রূপ হিসেবে একটা কিছু বিদ্যমান ছিল,—কিন্তু সেই ভাষার কোনও নিদর্শন বড়ো একটা পাচ্ছি নে। আগে হিন্দু আমলে রাজারা আর অন্যান্য বড়ো লোকেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ক'র্‌তেন। এই-সব দান, দলিল ক'রে দানপত্র ক'রে দেওয়া হ'ত। দলিল লেখা হ'ত তামার পাতে, অক্ষরগুলি খুঁদে' দেওয়া হ'ত, আর তাতে অনেক সময়ে তামায় ঢালা রাজার লাঞ্ছন বা চিহ্ন থাকত। এইরূপ দলিল বা তাম্রশাসন অনেক পাওয়া যায়। সব চেয়ে প্রাচীন তাম্রশাসন বাঙলা দেশে যা এ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে সেটী হ'চ্ছে উত্তরবঙ্গে ধানাইদহে প্রাপ্ত গুপ্ত সম্রাট্ কুমারগুপ্তের সময়ের; এর তারিখ হ'চ্ছে খ্রীষ্টীয় ৪৩২-৪৩৩; এর পরে ধারাবাহিক ভাবে মুসলমান যুগ পর্য্যন্ত, আর তার পরবর্ত্তী কালেরও অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে; মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের বাঙলা দেশের ইতিহাস রচনায় এই তাম্র-শাসনগুলি প্রধান সহায়। এখন, এই-সব দলিলে দানের ভূমির পরিমাণ, গ্রামের নাম, আর জমীর চৌহদ্দী বা চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করা থাকে। চৌহদ্দীর

বর্ণনা করবার সময় মাঝে মাঝে দু' চারটে ক'রে তখনকার দিনে প্রচলিত জনসাধারণের ভাষার—অর্থাৎ বাঙলার প্রাকৃত ভাষার—নামও র'য়ে গিয়েছে। সেগুলিকে কোথাও কোথাও একটু মেজে-ঘ'ষে দুই একটি উপসর্গ বা প্রত্যয় তাদের পিছনে জুড়ে দিয়ে' বাহ্যতো একটু সংস্কৃত ক'রে নেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে; কিন্তু এই সাজের মধ্যেও তাদের প্রাকৃত রূপটাকে বা'র করা প্রায়ই কঠিন হয় না। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বকালের বাঙলাদেশের ভাষা আলোচনা করবার একটা সাধন হ'চ্ছে এইরূপ কতকগুলি নাম। "কণামোটিকা" অর্থাৎ কিনা কানামুড়ী, "রোহিতবাড়ী" অর্থাৎ রুইবাড়ী, "নড়জোলী" অর্থাৎ নাড়াজোল, "চবটীগ্রাম" অর্থাৎ চটীগাঁ, "সাতকোপা" অর্থাৎ সাতকুপী, "হড়ীগাঙ্গ" অর্থাৎ হাড়ীগাং প্রভৃতি নাম, ভাষাতত্ত্বের উপজীব্য হ'য়ে ওঠে। এই সব নাম থেকে বুঝতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৪০০ থেকে ১০০০ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে প্রাকৃতশ্রেণীর একটি ভাষা বলা হ'ত, আর সেই ভাষায় এমন বহুত শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি এখনও আমরা (অবশ্য একটু পরিবর্ত্তিত রূপে) আজকালকার বাঙলায় ব্যবহার করি। প্রাচীন বাঙলার এই সকল নদ-নদী-গ্রাম প্রভৃতির নাম বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌লে একটি বিষয় চোখে পড়ে: অনেক নামের ব্যাখ্যা সংস্কৃত বা কোনও আর্য্যভাষা ধ'রে হয় না,—কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত কেউ এখানে সাহায্য করে না; সেই সব নামের ব্যাখ্যার জন্য আর্য্যভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়—অনার্য্য দ্রাবিড় আর কোলের ভাষার সাহায্য নিতে হয়। "অঝড়াচৌবোল, দিজমকাজোলী, বাল্লহিট্টা, পিণ্ডার-বীটিজোটিকা, মোড়ালন্দী, আউহাগড্ডী" প্রভৃতি নামের চেহারা কোনও আর্য্যভাষার নয়; আর "পোল বা বোল", "জোটী, জোড়ী

বা জোলী", "হিট্টি বা ভিট্টা", "গড্ড বা গড্ডী", প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্ত বাঙলাদেশের স্থানীয় নামের মধ্যে মেলে। এই গুলি খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। জায়গার নামে এই সব অনার্য্য শব্দ দেখে দেশে অনার্য্যদের বাস অনুমান ক'র্‌লে কেউ ব'ল্‌বে না এটা কেবল কল্পনা মাত্র।

কিন্তু এই সব নাম তো ভাষার পূরো পরিচয় দেয় না; কাজেই বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্ব্বেকার বাঙলা ভাষার পরিচায়ক তেমন বিশেষ কিছু নেই। চর্য্যাপদ থেকে আমাদের গিয়ে ঠেক্‌তে হয় একেবারে মাগধী প্রাকৃতে। সংস্কৃত নাটকে ছোটো-লোকের মুখের কথা এই ভাষায় বলানো হত। কিন্তু সংস্কৃত নাটক দেখে তো মাগধী প্রাকৃত বা অন্যান্য প্রাকৃতের তারিখ নির্ণয় করা চলে না। বররুচি প্রাকৃত ভাষার যে ব্যাকরণ লেখেন, তাতে তিনি মাগধী প্রাকৃত সম্বন্ধে দুটো কথা ব'লে গিয়েছেন। বররুচি খুব সম্ভব কালিদাসেরই সমসাময়িক ছিলেন; খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন মনে হয়। বররুচি যে মাগধী প্রাকৃত আলোচনা ক'রেছেন, সেটা হ'চ্ছে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা,—যে ভাষায় তখনকার দিনে মগধের লোকে কথাবার্ত্তা ব'ল্‌ত, সে ভাষা নয়; বরং তারই কাঠামোর উপর গ'ড়ে তোলা, ব্যাকরণিয়াদের নিয়ম দিয়ে অষ্ট-পৃষ্ঠে বাঁধা একটা ভাষা। যাই হোক্, বররুচির সাহিত্যিক মাগধী, বা সংস্কৃত নাটকের মাগধী অন্ততো কতকটা কথিত মাগধীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই মাগধী ভাষা, বররুচির আগে আর বররুচির পরেও, পূর্ব্ব-ভারতে মগধে-কাশী বিহার অঞ্চলে বলা হ'ত। আর খুব সম্ভব আমাদের বাঙলা

দেশে তখন যে আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল—সেই ভাষা ছিল এই মাগধীই। তখন অবশ্য আমাদের এই বর্ত্তমান বাঙলা ভাষা বা যে ভাষা প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে পাই, সে ভাষার উদ্ভব হয় নি। এই মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে উচ্চারণগত একটী বিশেষত্ব ছিল, যা এর পৌত্রীস্থানীয় বাঙলা এখনও রক্ষা ক'রছে—সেটী হ'চ্ছে ভাষার 'শ ষ স' স্থানে কেবল 'শ'। মাগধী প্রাকৃতের পূর্ব্বে এই দেশের আর্য্য ভাষা যে অবস্থায় ছিল, তার পরিচয় পাই অশোক অনুশাসনে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে। অশোকের অনুশাসনগুলি ভারতের নানাস্থানে পাওয়া গিয়েছে। এগুলি প্রাকৃত ভাষায় লেখা। স্থানভেদে অশোকের অনুশাসনের ভাষায় পার্থক্য আছে দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে শাহবাজগড়ী আর মানসেহ্‌রার পাহাড়ের অনুশাসনের ভাষা একরকম, আবার গুজরাটের গির্ণার অনুশাসনে আর একরকম, আবার পূর্ব্ব ভারতের নানা স্থানের অনুশাসন একেবারে অন্যরকমের প্রাকৃতে লেখা। অশোকের পূর্ব্ব-ভারতীয় অনুশাসনাবলীর ভাষা—দু' একটী খুঁটীনাটী বিষয়ে ছাড়া—পরবর্ত্তী-কালের বররুচি কর্ত্তৃক বর্ণিত আর সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে পূরোপূরি মেলে না। কিন্তু অশোকের পূর্ব্বী-প্রাকৃতকে মাগধী প্রাকৃতের একটী পুরাতন রূপ ব'লে ধ'রে নিতে পারা যায়। কাজে-কাজেই, বাঙলা ভাষার মূল, মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে পূর্ব্বী অশোক-অনুশাসনের ভাষায় গেলে পাওয়া যায়। এই অশোকের পূর্ব্বী-প্রাকৃতে অবশ্য বাঙলা ভাষার যে ভবিষ্যৎ রূপ নিহিত আছে, সে রূপ তখনও প্রকট নয়, অপরিস্ফুট মাত্র। বাঙলা ভাষা এই পূর্ব্বী-প্রাকৃতের বিকাশ, আর এই বিকাশ হ'তে হাজার বছরের

উপর লেগেছিল। অশোক-যুগের আগে পূর্ব্ব-ভারতে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তার আর নিদর্শন মেলে না; তবে তার সম্বন্ধে আমরা বৌদ্ধ পালি-সাহিত্য থেকে আর সংস্কৃত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে একটু একটু আন্দাজ ক'রতে পারি। অশোক বা মৌর্য্যবংশের পূর্ব্বে খুব সম্ভব বাঙলা দেশে আর্য্য ভাষার বিস্তার হয় নি। বুদ্ধদেবের সময়েও বোধহয় মগধ আর চম্পার পূর্ব্বদিকে আর্য্য ভাষা আসে নি। বুদ্ধদেবের সময় হ'চ্ছে ব্রাহ্মণ যুগের অবসান কাল। এই সময়ে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৫০০-র দিকে, ভারতে কথিত আর্য্য ভাষা দেশ-ভেদে তিনটী ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রেছিল—[১] উদীচ্য, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আর পাঞ্জাবে বলা হ'ত; [২] মধ্য-দেশীয়, কুরু-পাঞ্চাল দেশে (এখনকার যুক্ত প্রদেশের পশ্চিম অংশে) বলা হ'ত; আর [৩] প্রাচ্য—কোশল, কাশী, মগধ, বিদেহে প্রচলিত ছিল। এই প্রাচ্য-আর্য্যই কালে অশোক যুগের পূর্ব্বী-প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে মাগধী প্রাকৃতে পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধদেবের কালের বা তার আগেকার এই প্রাচ্য ভাষা বৈদিক ভাষার একটী অর্ব্বাচীন রূপ মাত্র।

বৈদিক সময় থেকে আর্য্য ভাষা তাহ'লে এই পথ ধ'রে চ'লে বাঙলা ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আমরা ঐ পথের সম্বন্ধে পর পর এই নির্দ্দেশ পাচ্ছি :—

[১] ভারতে প্রথম আসে বৈদিক বা ঋগ্‌বেদের যুগের ভাষা; পাঞ্জাবে এই ভাষা প্রচলিত ছিল, খ্রীঃ পূঃ ১০০০-এর আগেকার কালের বৈদিক সূক্তে এই ভাষার মার্জ্জিত সাহিত্যিক রূপ দেখি, আর এই ভাষার নানা কথিত রূপ সম্বন্ধে আভাস পাই ঋগ্‌বেদে আর পরবর্ত্তী অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে।

[২] তারপর আর্য্য ভাষা পাঞ্জাব থেকে উত্তর ভারতে, গঙ্গা-যমুনার দেশে, যুক্ত প্রদেশ, বিহার অঞ্চলে প্রসারিত হ'ল, খৃঃ পূঃ ১০০০ থেকে ৬০০-র মধ্যে। এই সময় বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের জটিলতা একটু সরল হ'তে শুরু ক'রলে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এই যুগের ভাষার সাহিত্যিক আর কথিত রূপের প্রচুর নিদর্শন পাই; আর প্রাদেশিক কথিত ভাষার সম্বন্ধে এই ব্রাহ্মণ বইগুলিতে কিছু কিছু আভাস পাই; তা থেকে বুঝ্তে পারা যায় যে পূর্ব্ব অঞ্চলে যে আর্য্য ভাষা বলা হ'ত, প্রথমে তাতেই আদি-যুগের আর্য্য ভাষার ভাঙন ধ'রেছিল; প্রাকৃতের সৃষ্টি প্রথমে পূর্ব্ব দেশেই হয়। পূর্ব্ব দেশের এই প্রাচ্য ভাষার কোনও নিদর্শন পাই নে, কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে কতকগুলি প্রাচ্য ভাষার রীতি-অনুমোদিত শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে—"বিকট, ক্ষুল্ল, শিথিল, মল্ল, দণ্ড, গিল্" প্রভৃতি।

[৩] এর পর দেখি, প্রাচ্য অঞ্চলের এই ভাষা প্রাকৃত রূপ নিয়ে', দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে:—এক, পশ্চিম খণ্ডের প্রাচ্য; আর দুই, পূর্ব্ব খণ্ডের প্রাচ্য—মগধে বলা হ'ত ব'লে যেটীকে মাগধী নাম দেওয়া হ'য়েছে। অশোকের অনুশাসনে এই পশ্চিমা প্রাচ্যেরই নিদর্শন পাই। পূর্ব্বী প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমা প্রাচ্যের তফাৎ খালি এই জায়গাটায় যে, পূর্ব্বীতে সব জায়গায় 'শ' ব্যবহার হ'ত, আর পশ্চিমে কিন্তু 'শ'-র ব্যবহার ছিল না, তার জায়গায় দন্ত্য'স'-র ব্যবহার ছিল। দু' একটী ছোটো লেখে এই পূর্ব্বী প্রাচ্য বা মাগধী প্রাচ্যের নিদর্শন পাই, এগুলি অশোক যুগের; এগুলির মধ্যে ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের সুতনুকা-লিপি সব চেয়ে মূল্যবান। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে, মৌর্য্যদের কালে এই পূর্ব্বী-প্রাচ্য বাঙলা দেশে তার জড় গাড়তে সমর্থ হয়।

[৪] পরবর্ত্তী কালের মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন পাই সংস্কৃত নাটকে আর বররুচির ব্যাকরণে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই বাঙলা দেশে এর যথেষ্ট প্রসার হ'য়েছিল অনুমান করা যায়।

[৫] তারপর কয় শতাব্দী ধ'রে সব চুপ-চাপ,—বাঙলা দেশে বা মগধে দেশভাষা চর্চ্চার কোনও চিহ্ন নেই—তাম্র-শাসনের দু' একটী নাম ছাড়া আর কিছুই মেলে না। এই সাত শ' বছর ধ'রে মাগধী প্রাকৃত আস্তে আস্তে ব'দ্‌লে যাচ্ছিল—বিহারী (ভোজপুরে' মৈথিল মগহী), বাঙলা, আসামী আর উড়িয়াতে ধীরে ধীরে পরিণত হ'চ্ছিল।

[৬] এর পরের ধাপে আমাদের একেবারে বাঙলাভাষার সীমানার মধ্যে পৌঁছিয়ে' দিলে—১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে চর্য্যাপদের কালে নবীন বাঙলা ভাষার উদয় হ'ল।

[৭] তারপরে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ, তুর্কীদের দ্বারা ভারত আর বাঙলা দেশের আক্রমণ আর জয়—বাঙলার স্বাধীনতার নাশ। দু' শ' বছর ধ'রে বাঙলাভাষার কোনও খোঁজ-খবর নেই। বোধ হয় অরাজকতা অশান্তি তখন দেশব্যাপী হ'য়েছিল। পরে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর চণ্ডীদাসের উত্থান, আর বাঙলা সাহিত্যের নব জাগরণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এই যুগের ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

[৮] ১৪০০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বাঙলা ভাষা অনেকটা পরবর্ত্তী যুগের পুঁথিতে রক্ষিত হ'য়ে আছে। তার পর থেকে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ অবস্থা, পুঁথির আর অন্ত নেই। এই শতকের পর থেকে যখন চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙলায় বড়ো-দরের একটা সাহিত্য আর চিন্তা দাঁড়িয়ে' গেল, তখন থেকে বাঙলাভাষার গতি পর্য্যবেক্ষণ করা অতি সোজা।

বাঙলা ভাষার ইতিহাসে কিন্তু যে কটা মস্ত ফাঁক থেকে যাচ্ছে, সে গুলো কিরূপে পূরণ ক'রে এই ইতিহাসকে আমরা গ'ড়ে তুল্‌তে পারি ? ভাষার ক্রমিক বিবর্ত্তন দেখাতে হ'লে সেগুলোকে ট'প্‌কে বা ডিঙিয়ে' তো যাওয়া যেতে পারে না, কারণ সেই সমস্ত যুগের মধ্যে দিয়েও ভাষা-স্রোত অব্যাহত গতিতে চ'লে এসেছে। এখানে তুলনা-মূলক পদ্ধতির সাহায্য আমাদের নিতে হবে। আগেই ব'লেছি যে, মাগধী প্রাকৃতের কাল থেকে চর্য্যাপদের কাল, মোটামুটি খ্রীঃ চতুর্থ শতক থেকে একাদশ শতক—এই সাত শ' বছরের বাঙলা ভাষার কোনও নিদর্শন বা অবশেষ নেই। এই সাত শ' বছরের ইতিহাস তুলনামূলক পদ্ধতির দ্বারা কিরূপে পুনর্গঠিত ক'র্‌তে পারা যায় ? এই সাত শ' বছরের মধ্যে মাগধী প্রাকৃত কোন্ ধারায় পরিবর্ত্তিত হ'য়ে বাঙলার রূপ ধ'রে ব'সেছে ?—সে সম্বন্ধে একটু আভাস পেতে পারি, মাগধী প্রাকৃতের সমকালীন আর তার স্বস্থানীয় শৌরসেনী, প্রাকৃত কেমন ক'রে ধীরে ধীরে শৌরসেনী-অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে হিন্দীতে রূপান্তরিত হ'য়েছে, তাই দেখে'। শৌরসেনী প্রাকৃত মথুরা-অঞ্চলে বলা হ'ত ; বররুচি এর বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন, আর সংস্কৃত নাটকেও এই প্রাকৃত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বররুচির ব্যাকরণ আর সংস্কৃত নাটকের শৌরসেনী, পরবর্ত্তী যুগে ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে পরিবর্ত্তন ধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করে ; আর, একটা নাতিবৃহৎ গীতিকাব্যসাহিত্যে শৌরসেনীর এই অর্ব্বাচীন অবস্থা আমরা দেখ্‌তে পাই। পরবর্ত্তী যুগের এই শৌরসেনীকে "শৌরসেনী অপভ্রংশ" বা খালি "অপভ্রংশ" বলা হয়। শৌরসেনী হ'চ্ছে একদিকে প্রাকৃত আর অন্যদিকে আধুনিক আর্য্যভাষা হিন্দী—এই দুইয়ের সন্ধি-

স্থল। শৌরসেনী অপভ্রংশ থাকায় বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে কিরকম পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে প্রাকৃত আধুনিক ভাষায় পরিণত হ'ল। এখন যদি মাগধী প্রাকৃত আর প্রাচীন বাঙলার মধ্যে (শৌর-সেনী-অপভ্রংশের মতন) উভয়ের সংযোগস্থল এক "মাগধী অপভ্রংশের" নিদর্শন পেতুম,—"মাগধী অপভ্রংশ" নাম যাকে দেওয়া যেতে পারে এমন ভাষা যদি কোন সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে থাক্‌ত, তাহলে বাঙলার উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করবার উপযোগী কতটা না মাল-মশলা আমাদের হাতে জুট্‌তে পার্‌ত! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সাত শ' বছরের মধ্যে বাঙলা দেশের পণ্ডিতেরা দেশ-ভাষার দিকে নজর দেন নি, তাতে কিছু লেখেন নি, সব লিখেছেন দেব-ভাষা সংস্কৃতে;—আর জনসাধারণ চিত্ত-বিনোদনের জন্য বা দেবতার আরাধনার জন্য ভাষায় যে গীতিকবিতা গান আর স্তোত্র প্রভৃতি নিশ্চয়ই লিখ্‌ত, সেগুলি সব লোপ পেয়েছে। যুক্তিতর্কের অনুসারে, মাগধী প্রাকৃত আর বাঙলা ভাষা এই দুইয়ের সন্ধিস্থল-স্বরূপ একটা মাঝের অবস্থা আমাদের স্থাপিত ক'র্‌তে হবে; আর তাকে "শৌরসেনী-অপভ্রংশের" নজীরে "মাগধী-অপভ্রংশ" নাম দিতে হয়। আর যুক্তিতর্ক আর ভাষাতত্ত্বের নিয়ম খাটিয়ে' পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার ক'রে এই মাঝের অবস্থার, আমাদের কল্পিত এই মাগধী অপভ্রংশের, রূপ কিরকম ছিল তাও স্থির ক'র্‌তে হবে। অবশ্য যাঁরা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি তাঁদের চোখে এই ব্যাপারটা একটু জটিল ঠেক্‌বে, কিন্তু এটা হ'চ্ছে ভাষাতত্ত্বের সকল নিয়ম-কানুন বা সূত্র বা পদ্ধতির অনুমোদিত পথ। সূত্র যেখানে ছিন্ন, সেখানে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে' ছিন্ন অংশকে একরকম পুনরুজ্জীবিত ক'রে নিয়ে' অবিচ্ছিন্ন যোগ বা বিকাশের গতি দেখাতে হবে।

বাঙলার বংশপীঠিকা তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই :—বদিক ▷ প্রাচ্য ▷ মাগধী প্রাকৃত ▷ মাগধী অপভ্রংশ ▷ প্রাচীন বাঙলা ▷ মধ্যযুগের বাঙলা ▷ আধুনিক বাঙলা। বাঙলাভাষার ইতিহাস চর্চ্চা ক'রতে হ'লে এই কয় ধাপের প্রত্যেকটীর সঙ্গে পরিচয় দরকার;—মানসিক চিন্তার বিষয়ীভূত হ'লেও ভাষা মুখ্যতো একটী প্রাকৃতিক বস্তু; আর প্রাকৃতিক বস্তুর মতো এর বিকাশ কার্য্যাকারণাত্মক নিয়ম ধ'রেই হ'য়েছে, সেই কথা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বল্‌বার স্থান এ নয়, তবে বাঙলাভাষার উৎপত্তির আর বিকাশের গতি দেখাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আধুনিক বাঙলার নিদর্শন হিসেবে দুটী ছত্র উদ্ধার ক'রে বাঙলাভাষার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই দুই ছত্রের প্রতিরূপ কিরকম ছিল বা থাকা সম্ভব ছিল, তাই দেখাবার প্রয়াস করা গেল। ছত্র দুটী "সোনার তরী" কবিতা থেকে নেওয়া সর্ব্বজন পরিচিত ছত্র—"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।" আলোচনার সুবিধার জন্যে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ "তরী"কে বাদ দিয়ে নৌকা-বাচক তদ্ভব শব্দ "না"টী বসানো গেল; আর প্রাচীন রূপ "উহারে"কে বর্জ্জন ক'রে "আধুনিক "ওরে"কে নেওয়া হ'ল।

আধুনিক বাঙলা	গান গেয়ে [না] বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন (জেন) মনে হয় চিনি [ওরে]।
মধ্যযুগের বাঙলা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ)	গান গায়্যা (গাইয়া) নাও বায়্যা (বাইয়া) কে আস্যে (আইসে) পারে, দেখ্যা (দেইখ্যা) জেহ্ন মনে হোএ চিহ্নী ওহারে।

প্রাচীন বাঙলা (আনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ)	গাণ গাহিআ নাব বাহিআ কে আইশই পারই, দেখিআ জৈহণ মণে (মণ্হি) হোই, চিহ্নিবিঁ (চিহ্নিমি) ওহারই।
মাগধী অপভ্রংশ (আনুমানিক ৮০০ খ্রীঃ)	গাণঁ গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ কি (কএ, কই) আইশই পারহি, দেক্খিঅ জইহণ মণহি হোই, চিহ্নিমি ওহ- করহি (ওহ)।
মাগধী প্রাকৃত (আনমানিক ২০০ খ্রীঃ)	গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নাবং বাহিঅ (বাহিত্তা) কে (*কগে) আবিশদি পালধি (পালে), দেক্খিঅ (দেক্খিত্তা) জাদিশণং মণধি হোদি, চিহ্নেমি অমুশ্শ।
প্রাচ্য প্রাকৃত (আনুমানিক ৫০০ খ্রীঃ পূঃ)	গানং গাথেত্বা নাবং বাহেত্বা কে (ককে) আবিশতি পালে, দেক্খিত্বা যাদিশং মনোধি (মনসি) হোতি (ভোতি), চিহ্নেমি অমুম্।
বৈদিক (আনুমানিক ১০০০ খ্রীঃ পূঃ)	গানং গাথয়িত্বা নাবং বাহয়িত্বা কঃ (*ককঃ) আবিশতি পারে, *দৃক্ষিত্বা যাদৃশম্ মনসি ভবতি, চিহ্নয়ামি অমুম্।

এর পূর্ব্বে, ঋগ্‌বেদের আগে, ভাষার যে যে অবস্থা ছিল, সেই প্রাক্-বৈদিক অবস্থাও আমরা প্রাচীন ইরাণীয়, গ্রীক, লাটিন, কেল্‌টিক, শ্লাভ, আর জার্ম্মানিক ইত্যাদির সাহায্যে পুনর্গঠন ক'র্‌তে পারি।

সাধারণ ভাবে আমাদের ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুটো মোটা কথা ব'ল্‌লুম। এ ছাড়া বাঙালী শিক্ষিত জনের অবশ্য জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় আছে,—যেমন খাঁটী বা বিশুদ্ধ বাঙলা ব'ল্‌লে কি বুঝ্‌তে হবে; বাঙলায় সংস্কৃতের স্থান কিরকম, আর কতটা; বাঙলাভাষার উপর অনার্য্য প্রভাব; মুসলমান আর বাঙলাভাষা; বাঙলাভাষার আধুনিক গতি আর তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা-আশঙ্কা;—এর প্রত্যেকটী নিয়েই অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু এখন সে সময় নেই। আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনের অনেকখানি এই ভাষাকে অবলম্বন ক'রে। যে যে আলোচ্য বিষয়ের কথা আমি উল্লেখ ক'র্‌লুম, সে সবগুলিরই গুরুত্ব শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। সে সম্বন্ধে কিছু বিচার ক'র্‌তে গেলে বা মত দিতে গেলে বাঙলা ভাষাতত্ত্ব আর বাঙলা ভাষার আলোচনার যে মূল্য আছে, সেটা সকলেই স্বীকার ক'র্‌বেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।



কাব্য জিজ্ঞাসা।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব]

(১)

রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' নামে গল্পের অশরীরী নায়িকাটি তার জীবিত কালের শরীরাবশেষ কঙ্কালটিকে নিয়ে বড়ই লজ্জায় পড়েছিল। অস্থি বিদ্যার্থী ছাত্রকে সে কি করে' বোঝাবে যে ঐ কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর তার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন "এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা" নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, যে সে শরীর থেকে যে অস্থি বিদ্যা শেখা যেতে পারে তা অতি বড় শরীর-বিদ্যাবিদেরও বিশ্বাস হ'ত না! কাব্যের রসাত্মা যদি কাব্যরসের তত্ত্বালোচনা প্রত্যক্ষ করতেন, তবে তাঁকেও নিশ্চয় এমনি লজ্জা পেতে হ'ত। কারণ কাব্যের তত্ত্ব বিচার কাব্যের কঙ্কাল নিয়েই নাড়াচারা। রসতত্ত্ব রস নয়, তত্ত্ব মাত্র। ধর্ম্ম-পিপাসুর কাছে 'থিয়লজি' যে বস্তু, কাব্যরসিকের কাছে কাব্যের রস বিচারও সেই জিনিষ। তবুও এ বিচারের দায় থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। যা মুখ্যত বুদ্ধির বিষয় নয় তাকেও বুদ্ধির কোঠায় এনে, বুদ্ধির যন্ত্রপাতি দিয়ে একবার মাপযোগ করে না দেখ্‌লে, মানুষের মনের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সুতরাং ধর্ম্মের সঙ্গে 'থিয়লজি' থাকবেই, কাব্যে সাথে সাথে অলঙ্কার-শাস্ত্র গড়ে' উঠ্‌বেই। কেবল ও শাস্ত্রের লক্ষ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকলেই বিপদ।

কাব্যের রস বিচার মানুষকে কাব্য-রসের আস্বাদ দেয় না। সে আস্বাদ দরদী লোকের মন দিয়ে অনুভূতির জিনিষ। আলঙ্কারিকদের ভাষায় সে রস হচ্ছে "সহৃদয়হৃদয়সংবাদী"। তত্ত্বের পথে আর একটু এগিয়ে গিয়ে আলঙ্কারিকেরা বলেন, কাব্য-রসাস্বাদী সহৃদয় লোকের মনের বাইরে 'রসের' আর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ ঐ আস্বাদই হচ্ছে রস। যখন বলা হয় 'রসের আস্বাদ', তখন রস ও স্বাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক ভেদ অঙ্গীকার করে' কথা বলা হয়। (১) যেমন আমরা কথায় বলি 'ভাত পাক হচ্ছে', যদিও পাকের যা ফল তাই ভাত। তেমনি যদিও কথায় বলি 'রসের প্রতীতি বা অনুভূতি', কিন্তু ঐ প্রতীতি বা অনুভূতিই হচ্ছে 'রস'। (২) সহৃদয় লোকের, অর্থাৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যাদের দর্পণের মত নির্ম্মল মন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যেন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, (৩) এমন দরদী লোকের সুকাব্য-জনিত চিত্তের অনুভূতি বিশেষের নামই 'রস'। সুতরাং বলা যেতে পারে, কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়—সহৃদয় কাব্য পাঠকের মন। "কাব্যে রসয়িতা সর্ব্বো ন বোদ্ধা ন নিয়োগভাক্।"

রস যখন এক রকমের মানসিক অবস্থা, তখন স্বভাবতই তার পরিচয়ের প্রথম কথা,—কি করে' মনে এ অবস্থার উদয় হয়।

---

(১) "রসঃ স্বাদ্যতে ইতি কাল্পনিকং ভেদমুররীকৃত্য কর্ম্মকর্ত্তরি বা প্রয়োগঃ"। (সাহিত্য দর্পণ)।

(২) "ওদনং পচতীতিবদ্ব্যবহারঃ প্রতীয়মান এব হি রসঃ।" (অভিনবগুপ্ত। ২।৪)।

(৩) "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।" (অভিনবগুপ্ত। ১।১)।

মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করে' কাণ্ট দেখিয়েছেন যে তাতে দু রকমের উপাদান—মানসিক ও বাহ্যিক। বাইরের উপাদান ইন্দ্রিয়ের পথে মনে প্রবেশ করে, কিন্তু তা জ্ঞান নয়। জ্ঞানের তখনি উদয় হয়, যখন মনের কতকগুলি তত্ত্ব, ঐ বাহ্যিক উপাদানের উপর ক্রিয়া করে', তাকে এক বিশেষ পরিণতি ও আকার দান করে। এই সব তত্ত্ব মন বাইরে থেকে পায় না, নিজের ভিতর থেকে এনে বাইরের জিনিষের উপর ছাপ দেয়। রৌদ্রের তাপে যে মাথা গরম হয়, এ জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদান, রৌদ্র এবং পূর্ব্বের ঠাণ্ডা ও পশ্চাৎ গরম মাথা—ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়েই মনে আসে ; কিন্তু রৌদ্র ও গরম মাথার সম্বন্ধটি, অর্থাৎ ওদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মনের নিজের দান। এই কার্য্যকারণ তত্ত্বের প্রয়োগেই ঐ বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। অথবা উল্টে বলাও চলে, ঐ বাহ্যিক উপাদানই মনোগত সাধারণ কার্য্যকারণ তত্ত্বকে বিশেষ কার্য্যকারণের জ্ঞানে পরিণত করে। এবং জ্ঞান অর্থই বিশেষ জ্ঞান। বাহ্যিক উপাদান ও মানসিক তত্ত্ব এ দুয়ের সংযোগ হ'লে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এর দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটি অন্ধ, ও প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টি পঙ্গু নয়, একবারে শূন্য।

রসের বিশ্লেষণে আলঙ্কারিকেরাও এই দুই উপাদান পেয়েছেন,—মানসিক ও বাহ্যিক। রসের মানসিক উপাদান হ'ল মনের 'ভাব' নামে চিত্তবৃত্তি বা 'ইমোশন্' গুলি। আর ওর বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদানের মত, বাইরের লৌকিক জগৎ থেকে আসে না, আসে কবির সৃষ্টি কাব্যের জগৎ থেকে। আলঙ্কারিকেরা বলেন কাব্যজগতের ঐ বাহ্যিক উপাদানের ক্রিয়ায় মনের 'ভাব' রূপান্তরিত হয়ে 'রসে' পরিণত হয়। সুতরাং আলঙ্কারিকদের মতে 'রস' জিনিষটি

লৌকিক বস্তু নয়। মনের যে সব 'ভাব' রসে রূপান্তরিত হয়, তারা অবশ্য লৌকিক। লৌকিক ঘরকন্নার জগতেই তাদের অস্তিত্ব, এবং সেই জগতের সঙ্গেই তাদের কারবার। কিন্তু এই 'ভাব বা 'ইমোশন' 'রস' নয়, এবং মানুষের মনে যাতে এই 'ভাব' জাগিয়ে তোলে তাও কাব্য নয়। 'শোক' একটি মানসিক 'ভাব' বা 'ইমোশন'। লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণে মনে শোক জেগে মানুষ শোকার্ত্ত হয়। কিন্তু শোকার্ত্ত লোকের মনের 'শোক' তার কাছে 'রস' নয়, এবং সে শোকের কারণটিও কাব্য নয়। কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনি পাঠকের মনে 'রসের, উদয় হয়, যার নাম 'করুণ রস'। এই করুণ রস শোকের 'ইমোশন' নয়। শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্যে মনে যে করুণ রসের সঞ্চার হয় তা, চোখে জল আন্‌লেও, মনকে অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ করে। এ কথা কাব্যের আস্বাদ যার আছে সেই জানে। যদিও একে প্রমাণ করে' দেখান কঠিন। কারণ,—

> "করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
> সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥" (সাহিত্যদর্পণ।)

'করুণা প্রভৃতি রসে যে মনে অপূর্ব্ব সুখ জন্মে, তার একমাত্র প্রমাণ হৃদয়বান্ লোকের নিজের চিত্তের অনুভূতি'। তবু এ কথাও আলঙ্কারিকেরা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যে করুণ রস যদি দুঃখেরই কারণ হ'ত, তবে রামায়ণ প্রভৃতি করুণ রসের কাব্যের দিকেও কেউ যেত না।

"কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ।
তদা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা॥" (সাহিত্যদর্পণ।)

কিন্তু করুণ রসের আনন্দ কাব্য-রসিক মানুষকে নিয়তই সে দিকে টানছে। "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"। আলঙ্কারিকেরা বলবেন, "ঠিক কথা। কিন্তু মনে থাকে যেন, '*tell of* saddest thought'। যা মনে সোজা-সুজি sad thought আনে তা, sweet ও নয়, song ও নয়। কবি যখন কাব্যে saddest thought এর কথা বলেন, তখনি তা sweetest song হয়।"

ভাব ও রসের, বস্তুজগৎ ও কাব্য-জগতের এই ভেদকে সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য আলঙ্কারিকেরা বলেন, রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। ব্যবহারিক জগতের শোক, হর্ষ প্রভৃতির নানা লৌকিক কারণ মানুষের মনে শোক, হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক ভাবের জন্ম দেয়। এর কোনটি সুখের, কোনটি দুঃখময়। কিন্তু ঐ সব লৌকিক ভাব, ও তাদের লৌকিক কারণ, কাব্যের জগতে এক অলৌকিক রূপ প্রাপ্ত হয়ে, পাঠকের মনে ঐ সব লৌকিক ভাবের যে বৃত্তি বা 'বাসনা' আছে তাদের এক অলৌকিক বস্তু—'রসে'—পরিণত করে। 'রসের মানসিক উপাদান যে 'ভাব' তা দুঃখময় হলেও, তার পরিণাম যে 'রস' তা নিত্য আনন্দের হেতু। কারণ লৌকিক দুঃখের অলৌকিক পরিণতি আনন্দময় হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

"হেতুত্বং শোকহর্ষাদে
র্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।

শোকহর্ষাদয়ো লোকে
জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ ॥
অলৌকিক বিভাবত্বং
প্রাপ্তেভঃ কাব্য সংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ
সর্ব্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ ॥" (সাহিত্য দর্পণ।)

(২)

কবি যে কাব্যের মায়াজগৎ সৃষ্টি করেন তার কৌশলটি কি? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অবশ্য অসম্ভব। কারণ, এ প্রশ্ন হচ্ছে নিখিল কবি—প্রতিভার নিঃশেষ পরিচয় দাবী করা। কিন্তু প্রতি কবির প্রত্যেক কাব্যের নির্ম্মাণ কৌশল অন্য সকল কাব্য থেকে অল্প বিস্তর স্বতন্ত্র। কারণ প্রত্যেক কাব্য একটি বিশেষ সৃষ্টি, কলের তৈরী জিনিষ নয়। সুতরাং কাব্যতত্ব সে কৌশলের যে পরিচয় দিতে পারে, সে পরিচয় সকল—কাব্য-সাধারণ কাব্য—কৌশলের কঙ্কাল মাত্রের পরিচয়। এ কাজ সম্ভব, কারণ দেহের রূপের ভেদ সত্বেও, কঙ্কালের রূপ প্রায় এক।

আলঙ্কারিকেরা বলেন কাব্য—নির্ম্মাণ কৌশলের তিন ভাগ। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী।

'বিভাব' কি?

"রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে
বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।" (সাহিত্য দর্পণ)

'লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক, কাব্যে বা নাটকে তাকেই 'বিভাব' বলে'। যেমন,—

"যে হি লোকে রামাদিগত—রতি—হাসাদীনামুদ্বোধকারণানি সীতাদয়স্ত এব কাব্যে নাট্যে চ নিবেশিতাঃ সন্তো 'বিভাব্যন্তে আস্বাদাঙ্কুরপ্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদি--ভাবাঃ' ইতি বিভাবাউচ্যন্তে।" (সাহিত্য দর্পণ।) লৌকিক জগতে যে সীতা, ও তার রূপ, গুণ, চেষ্টা রামের মনে রতি, হর্ষ প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধের কারণ, তাই যখন কাব্য ও নাট্যে নিবেশিত হয় তখন তাকে 'বিভাব' বলে। কারণ, তারা পাঠক ও সামাজিকের মনের রত্যাদি ভাবকে এমন পরিণতি দান করে, যে তা থেকে আস্বাদের অঙ্কুর নির্গত হয়।

'অনুভাব' বলে কাকে ?

"উদ্বুদ্ধং কারণৈ স্বৈঃ স্বৈ—
বর্হির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ সোঽ—
নুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ ॥" (সাহিত্য দর্পণ।)

'মনে ভাব উদ্বুদ্ধ হলে, যে সব স্বাভাবিক বিকার, ও উপায়ে তা বাইরে প্রকাশ হয়, ভাবরূপ কারণের সেই সব লৌকিক কার্য্য কাব্য ও নাটকের 'অনুভাব।'

"দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চলো সলজ্জিত বাসর শয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।"

"মিলন-মধুর লাজের" এই কাব্য ছবিটির উপাদান হচ্ছে কয়েকটি 'অনুভাব'।

(৩)

এইখানে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত যে এক দীর্ঘ সমাস বাক্যে কাব্য রসের সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বিনা ব্যাখ্যাতেই এখন তার অর্থবোধ হবে।

"শব্দসমর্প্যমানহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিত,——প্রাঙ্‌নিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমার,——স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপার,——রসনীয়রূপো রসঃ।" (১।৪।)

'রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিদের (consciousness) আস্বাদনরূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্ব্ব নিবিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েই সম্বিৎ আনন্দময় সৌকুমার্য্য প্রাপ্ত হয়। লৌকিক 'ভাবের' কারণ ও কার্য্য, কবির গ্রথিত শব্দে সমর্পিত হয়ে, সকল হৃদয়ে সম-বাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্য—পাঠকের অন্তর্নিবিষ্ট 'ভাব'গুলিকে উদ্বুদ্ধ করে।'

অভিনবগুপ্ত 'বিভাব' ও 'অনুভাব' কে বলেছেন—'সকল হৃদয়ে সমবাদী'। কারণ যে লৌকিক ভাবের তারা রসমূর্ত্তি, সে লৌকিক ভাব ব্যক্তির হৃদয়ে আবদ্ধ, তা সামাজিক নয়।

"পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ—
সান্তরায়তয়া তথা।
অনু কার্য্যস্য রত্যাদে—
রুদ্‌বোধো ন রসো ভবেৎ॥" (সাহিত্য দর্পণ)

'প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্বোধ, তা রস নয়। কারণ, তা প্রেমিকের নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ, সুতরাং পরিমিত; তা লৌকিক;

সুতরাং প্রেমের রস—বোধের অন্তরায়।' কবি তাঁর প্রতিভার মায়ায় এই পরিমিত, লৌকিক ভাবকে "সকলসহৃদয়হৃদয়সংবাদী," অলৌকিক রসমূর্ত্তিতে রূপান্তর করেন। কাব্যের 'বিভাব' ও 'অনুভাবের' মধ্যে এমন একটি ব্যাপার আছে, যাতে কাব্য-চিত্রিত চরিত্র বা ভাব এবং পাঠকের মধ্যে একটি সাধারণ সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়,—

"ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণী কৃতিঃ।"

(সাহিত্য দর্পণ।)

যার ফলে,—

"পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ
পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"

(সাহিত্য দর্পণ।)

'কাব্য পাঠকের মনে হয় কাব্যের চরিত্র ও ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়; আমার নিজের, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমনি করেই কাব্যের আস্বাদ কোনও ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন থাকে না।'

কাব্যের সৃষ্টি যে সকল হৃদয়ে সম-বাদী তার অর্থ এ নয় যে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের মত, তা একটি abstract জিনিষ। কবি যে ভাব বা চরিত্র আঁকেন তা বর্ণ রূপহীন outline নয়, সম্পূর্ণ concrete ভাব বা চরিত্র। কিন্তু তার মধ্যেই নিখিল সহৃদয়জন নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। অর্থাৎ কাব্যের সৃষ্টি concrete universal-এর সৃষ্টি।

এই জন্যই কবি যখন কাব্যে ভাবকে রসের মুর্ত্তিতে রূপান্তর করেন, তখন তিনি ভাবের লৌকিক পরিমিতত্বকে ছাড়িয়ে উঠেন। লৌকিক ভাবের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ও অভিভূত থাকলে, যেমন কাব্যরসের আস্বাদ হয় না, তেমনি কাব্যরসের সৃষ্টিও হয় না। 'ধ্বন্যালোকের' একটী কারিকা আছে,—

> "কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
> ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥" (১।৫।)

'সেই রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। যেমন, পুরাতনী কথায় বলে, আদিকবির ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব—বিয়োগজনিত শোকই শ্লোকরূপে পরিণত হয়েছিল।' এই কারিকার প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত লিখেছেন,—'এ কথা মানতেই হবে যে, এ শোক মুনির নিজের শোক নয়। যদি তা হ'ত তবে, ক্রৌঞ্চের শোকে মুনি দুঃখিত হয়েই থাকতেন, করুণ রসের শ্লোক রচনার তাঁর অবকাশ হ'ত না। কারণ কেবল দুঃখ সন্তপ্তের কাব্য রচনা কখনও দেখা যায় না।' ("ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্। এবং হি সতি তদ্দুঃখেন সোঽপি দুঃখিত ইতি কৃত্বা রসস্যাত্মতেতি নিরবকাশং ভবেৎ। ন তু দুঃখসংতপ্তস্যৈষা দশেতি।")
অভিনবগুপ্ত বলেন, এখানে যা ঘটেছে তা এই;—

সহচরী—বিয়োগ—কাতর ক্রৌঞ্চের শোক মুনির মনে, লৌকিক শোক থেকে বিভিন্ন, নিজের চিত্তবৃত্তির আস্বাদন স্বরূপ করুণ রসের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এবং যেমন পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে জল উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, তেমনি করে' ঐ রস মুনির মন থেকে ছন্দোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত শ্লোকরূপে নির্গত হয়েছে। ("সহচরীহননোদ্ভূতেন সাহচর্য্যধ্বং-

সনেনোত্থিতো যঃ শোকঃ…স এব…আস্বাদ্যমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণ-রসরূপতাংলৌকিকশোকব্যতিরিক্তাং স্বচিত্তবৃত্তিসমাস্বাদ্যসারাং প্রতি-পন্নো রসঃ পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবৎ…সমুচিতছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিত শ্লোক-রূপতাং প্রাপ্তঃ।")

আলঙ্কারিকদের আবিষ্কৃত, লৌকিক 'ভাবকে' কাব্যের 'রসে' রূপান্তরের এই তত্ত্বটি, ইতালীয়ান দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোচ অনেকটা ধরেছেন। তাঁর "কাব্য ও অকাব্য" নামক গ্রন্থে ক্রোচ লিখ্ছেন,—

"What should we call the blindness of a poet? The incapacity of seeing particulcar passions in the light of human passion, aspirations in the fundamental and total aspiration, partial and discordant ideals in the ideal which shall compose them in harmony : what at one time was called incapacity of "idealizing." For poetic idealization is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself, whatever may be his efforts." (৪)

(৪) European Litrature in the Nineteenth Century নামে ইংরেজী অনুবাদ : ৫২ পৃষ্ঠা।

ক্রোচের "poetic idealization" আলঙ্কারিকদের 'ভাব' ও তার কারণ কার্যের, "সকল হৃদয়সংবাদী" 'বিভাব', 'অনুভাবে' পরিণতি। ক্রোচের 'passage from troublous emotion to the serenity of contemplation', আলঙ্কারিকদের লৌকিক 'ভাবকে' আস্বাদ্যমান 'রসে' রূপান্তর। "Serenity of contemplation" হচ্ছে দার্শনিক সুলভ 'মনন' বৃত্তির উপর ঝোঁক দিয়ে কথা বলা। আলঙ্কারিকদের "রস চর্ব্বণ" কথাটি মূল সত্যকে অনেক বেশী ফুটিয়ে তুলেছে।

কবি Wordsworth যে কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, poetry "takes its origin from emotion recollected in tranquility", সেটি আলঙ্কারিকদের এই 'রূপান্তর বাদের' ই অস্পষ্ট অনুভূতি, ও অস্ফুট বিবৃতি।

আজকের দিনের 'লিরিক' কাব্যের যুগে, যখন কবির নিজের মনের 'ভাবই' কাব্যের উপাদান, তখন এ ভ্রম সহজেই হয় যে, কবির হৃদয়ের ভাবকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করাই বুঝি কাব্যের লক্ষ্য। এবং যে কবির হৃদয়ের ভাব যত তীব্র ও যত আবেগময় তাঁর কাব্য-রচনাও তত সার্থক। কিন্তু 'লিরিক' কিছু আলঙ্কারিকদের কাব্য-বিশ্লেষণের বাইরে নয়। 'ভাব' যদি না কবির মনে রসের মুর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তবে কবি কখনও তাকে সে 'বিভাব' ও 'অনুভাবে' প্রকাশ করতে পারেন না, যা পাঠকের মনেও সেই রসের রূপ ফুটিয়ে তোলে। মনে যাতে 'ভাব' উদ্বুদ্ধ হয় তাই যদি কাব্য হ'ত, তবে আজ বাঙ্গলাদেশে যে সব হিন্দুমুসলমান খবরের কাগজ মুসলমানের উপর হিন্দুর, ও হিন্দুর উপর মুসলমানের ক্রোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, তারা প্রথম শ্রেণীর কাব্য হ'ত। কারণ অনেক হিন্দু-

মুসলমানের ক্রোধই তাতে জাগ্রত হচ্ছে। অভিনবগুপ্ত উদাহরণ দিয়েছেন, "তোমার পুত্র জন্মেছে", এই কথা শুনে পিতার যে হর্ষ তা রস নয়, এবং ও বাক্যটিও কাব্য নয়। ('পুত্রস্তে জাতঃ' ইত্যতো যথা হর্ষো জায়তে তথা নাপি লক্ষণয়া।" ১।৪) 'অপি তু সহৃদয়স্য হৃদয়সংবাদবলাদ্বিভাবানুভাবপ্রতীতৌ সিদ্ধস্বভাবসুখাদিবিলক্ষণঃ পরিস্ফুরতি।" 'কিন্তু কবি সমুচিত বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা, সহৃদয় পাঠকের সম বাদী তন্ময়ত্বপ্রাপ্ত মনে, ঐ হর্ষকেই, স্বভাবসিদ্ধ সুখ থেকে বিভিন্ন লক্ষণ, আস্বাদ্যমান রসের রূপে পরিণত করতে পারেন।' যেমন কালিদাস রঘুর জন্ম শ্রবণে দিলীপের 'হর্ষকে' করেছেন ;—

"জনায় শুদ্ধান্তচরায় শংসতে, কুমারজন্মামৃতসম্মিতাক্ষরম্।
অদেয়মাসীৎ এয়মেব ভূপতেঃ, শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে॥
নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা, নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদ্ গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মানি॥"

তবুও যে ভাবোদ্বেল কবির আবেগময় কাব্য কাব্য-রস থেকে বঞ্চিত নয়, তার কারণ 'ভাব' "শব্দে সমর্পিত" হ'লেই ব্যক্তিগত লৌকিকত্বের গণ্ডী থেকে কতকটা মুক্ত হয়। কেন না ভাষা জিনিষটিই সামাজিক। কিন্তু 'লিরিক' যত 'ভাব'—ঘ্যাসা হয় ততই যে শ্রেষ্ঠ হয় না, তা যে কোনও শ্রেষ্ঠ কাব্যের উদাহরণ নিলেই দেখা যায়। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'অনন্তপ্রেম'।

"তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি শতরূপে শতবার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!

* * * * * *

আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হ'তে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে,
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।"

এর সঙ্গে যদি হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে", কি নবীনচন্দ্রের "কেন দেখিলাম", তুলনা করা যায়, তবেই কাব্যের রস ও ভাবের উচ্ছাসের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম হবে।

(৪)

আলঙ্কারিকেরা 'বিভাব' ও 'অনুভাব' ছাড়া "সঞ্চারী" নামে কাব্য-কৌশলের যে তৃতীয় কলার উল্লেখ করেছেন, তার পরিচয় দিতে হ'লে, 'ভাবের' যে মনোবিজ্ঞানের উপর আলঙ্কারিকেরা তাঁদের রসতত্ত্বের ভিত্তি গড়েছেন তার একটু বিবরণ দিতে হয়।

মানুষের মনের 'ভাব' বা 'ইমোশন' অনন্ত। কারণ 'ইমোশন' শুদ্ধ feeling বা সুখদুঃখানুভূতি নয়। আধুনিক মনোবিদ্যাবিদ্‌দের ভাষায় 'ইমোশন' হচ্ছে একটি complete psychosis, সর্ব্বাবয়ব মানসিক অবস্থা। অর্থাৎ 'ইমোশন' বা 'ভাবের' সুখদুঃখানুভূতি কতকগুলি idea বা 'বিজ্ঞানকে' অবলম্বন করে' বিদ্যমান থাকে। এই 'আইডিয়া' পুঞ্জের কোনও অংশের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটলেই, 'ইমোশন'

বা 'ভাব' নামক মানসিক অবস্থাটিরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন ঘটে। 'আইডিয়ার' সংখ্যা অগণ্য এবং তাদের পরস্পর যোগ বিয়োগের প্রকারও অসংখ্য। সুতরাং 'ভাব' বা 'ইমোশন' সংখ্যাতীত। এবং কোনও 'ভাব' অন্য 'ভাবের' সম্পূর্ণ সদৃশ নয়। কিন্তু তবুও, যেমন মনোবিজ্ঞানবিদ্, তেমনি আলঙ্কারিক, কাজের সুবিধার জন্য, অগণ্য স্বলক্ষণ 'ভাবের' মধ্যে কয়েক প্রকারের 'ভাবকে,' সাদৃশ্য বশত কয়েকটি সাধারণ নামে নামাঙ্কিত করে', পৃথক করে' নিয়েছেন। আলঙ্কারিকেরা এই রকম নয়টি প্রধান 'ভাব' স্বীকার করেছেন,—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, ওশম।

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ ॥"

এই নয়টি ভাবকে তাঁরা বলেছেন "স্থায়ী ভাব"। কারণ, "বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ" (অভিনবগুপ্ত, ৩।২৪)। 'ভাবরূপ বহু চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব মনে বহুলরূপে প্রতীয়মান হয় সেইটি স্থায়ীভাব।' আলঙ্কারিকদের মতে এই নয়টি 'ভাব', কাব্যের 'বির্ভাব', 'অনুভাবের' সংস্পর্শে, যথাক্রমে নয়টি 'রসে' পরিণত হয়,—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, ও শান্ত।

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ ॥"

কিন্তু এই নয়টি ছাড়াও অবশ্য মানুষের মনে বহু 'ভাব' আছে, এবং তার মধ্যে অনেক 'ভাব', কাব্যের 'বিভাব ও অনুভাবে',

আলঙ্কারিকদের কথায়, "আস্বাদ্যমানতা" প্রাপ্ত হয়। আলঙ্কারিকেরা 'নির্ব্বেদ', 'লজ্জা', 'হর্ষ', 'অসূয়া', 'বিষাদ' প্রভৃতি এ রকম তেত্রিশটি ভাবের নাম করেছেন, এবং তা ছাড়াও যে আরও অনেক 'ভাব' আছে তা স্বীকার করেছেন। "ত্রয়স্ত্রিংশদিতি ন্যূনসংখ্যায়াঃ ব্যবচ্ছেদকং ন ত্বধিকসংখ্যায়াঃ।" এই সব 'ভাবকে' আলঙ্কারিকেরা বলেছেন 'সঞ্চারী' বা 'ব্যভিচারী' ভাব। তাঁদের 'থিওরী' হচ্ছে যে, এই সব ভাব মনে স্বতন্ত্র থাকে না; কোনও না কোনও 'স্থায়ীভাবের' সম্পর্কেই মনে যাতায়াত করে', সেই 'স্থায়ীভাবের' অভিমুখে মনকে চালিত করে। এইজন্য এদের নাম 'সঞ্চারী' বা 'ব্যভিচারী'। (৫) 'ভাবের' এই থিওরী থেকে স্বভাবতই 'রসের' থিওরী এসেছে যে, কাব্যে 'সঞ্চারী' ভাবের স্বতন্ত্র রস-মূর্ত্তি নেই; তাদের "আস্বাদ্যমানতা" স্থায়ীভাবের পরিণতি নয়টি রসকেই নানারকমে পরিপুষ্টি দান করে মাত্র। সুতরাং যদিও কাব্যের নব রসের রসত্ব অনেক পরিমাণে এই 'সঞ্চারীর' আস্বাদের উপর নির্ভর করে, তবুও অনেক আলঙ্কারিকই, স্বাতন্ত্র্যের অভাবে, 'সঞ্চারী' ভাবের পরিণতিকে 'রস' বল্‌তে রাজী নন। অভিনব গুপ্ত বলেছেন, "স চ রসো রসীকরণযোগ্যাঃ, শেষাস্তু সংচারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে। ন তু রসানাং স্থায়ি সংচারি ভাবেনাঙ্গাঙ্গিতা যুক্তা"। 'স্থায়ীভাবের পরিণতিই 'রস', বাকীগুলিকে বলে 'সঞ্চারী'। রসের ধ য আবার 'স্থায়ীরস' ও 'সঞ্চারী রস' এই ভাবে অঙ্গী ও অঙ্গের বিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়।' এবং তাঁর মতই অধিকাংশ আলঙ্কারিকের মত। কিন্তু 'স্থায়ী' ও 'সঞ্চারী'র এই প্রভেদ কিছু মূলগত

(৫) "স্থিরতয়া বর্ত্তমানে হি রত্যাদৌ নির্ব্বেদাদয়ঃ প্রাদুর্ভাবতিরোভাবাভ্যা-মভিমুখ্যেন চরণাদ্ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে।" (সাহিত্যদর্পণ।)

প্রভেদ নয় ; এবং 'সঞ্চারী' ভাবের স্বতন্ত্র 'রসে' পরিণতি সম্ভব নয়, এও একটু অতি সাহসের কথা। সেই জন্য আলঙ্কারিকদের মধ্যে এ মতও প্রচলিত ছিল যে, 'সঞ্চারী' ও 'রস', কেবল 'রসের' পরিপুষ্টি সাধক নয়। অভিনবগুপ্ত ভাগুরি নামে এক আলঙ্কারিকের মত তুলেছেন, "তথা চ ভাগুরিরপি কিং রসনামপি স্থায়িসংচারিতাস্তি ইত্যাক্ষিপ্যাভ্যুপগমেনৈবোত্তরমবোচৎ বাঢ়মস্তীতি"। 'রসেরও কি আবার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভেদ আছে। এর উত্তরে ভাগুরিও বলেছেন, অবশ্য আছে।' এবং সকল আলঙ্কারিককে স্বীকার করতে হয়েছে যে, কাব্যে 'স্থায়ী' ও 'সঞ্চারী' এই ভেদটি আপেক্ষিক। কারণ, এক কাব্য-প্রবন্ধে যখন নানা রস থাকে, তখন দেখা যায় যে তার মধ্যে একটি 'রস' প্রধান, এবং স্থায়ীভাবের পরিণতি অন্য 'রস' তার পরিপোষক হয়ে' 'সঞ্চারীর' কাজ করছে। "রসো রসান্তরস্য ব্যভিচারী ভবতি" (ধ্বন্যালোক, ৩।২৪)। 'এক 'রস' অন্য 'রসের' ব্যভিচারীর কাজ করে'।

"প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে।
একো রসোঽঙ্গীকর্ত্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা ॥" (ধ্বন্যালোক, ৩।২১)।

'এক কাব্য-প্রবন্ধে নানা রস একত্র থাক্‌লেও, দেখা যায় কবিরা কাব্যের উৎকর্ষের জন্য তার মধ্যে একটা রসকেই প্রধান করেন।' এবং বাকী 'রস'গুলি তার পরিপোষক বা 'সঞ্চারী'। এই 'সঞ্চারী' কাব্যের এতটা স্থান জুড়ে থাকে যে, আলঙ্কারিকদের মধ্যে এ মতও চল্‌তি হয়েছিল যে 'সঞ্চারী' দিয়ে পরিপুষ্ট না হলে 'রসের' রসত্বই হয় না। "পরিপোষরহিতস্য কথং রসত্বম্" (ধ্বন্যালোক, ৩।২৪, বৃত্তি।)।

কবিরাজ বিশ্বনাথ যে কারিকায় 'রসের' 'উৎপত্তির বর্ণনা দিয়েছেন, 'সাহিত্য-দর্শনের' সেই কারিকাটি এখন উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"বিভাবেনানুভাবেন
ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ
স্থায়ীভাবঃ সচেতসাম্ ॥"

'চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব, (কাব্যের) 'বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীর সংযোগে, রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে', রসে পরিণত হয়।' আশা করা যায় এর আর এখন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

(৫)

আলঙ্কারিকদের রসের তত্ত্ব একটা উদাহরণে বিশদ করা যাক। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে। সঞ্জয় এসে যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে কিছুই ছেড়ে দেবে না। মন্ত্রণা সভায় স্থির হ'ল শ্রীকৃষ্ণকে দূত করে' ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের কাছে পাঠান হোক। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে সকলেই মত দিলেন যুদ্ধ না করে' শান্তিতেই যাতে বিবাদ মীমাংসা হয় সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন, 'যাতে শান্তি স্থাপন হয় সেই চেষ্টা কোরো। দুর্য্যোধনকে উগ্র কথা না বলে, মিষ্ট কথায় বুঝিও'। শ্রীকৃষ্ণ হেসে বল্লেন, 'ভীমের এই অক্রোধ অভূতপূর্ব্ব। এ যেন ভারহীন পর্ব্বত, তাপহীন অগ্নি'। কেবল সহদেব ও সাত্যকি সোজাসুজি যুদ্ধের পক্ষে মত দিলেন। তখন, :—

রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মার্থ সহিতং হিতম।
কৃষ্ণা দাশার্হ মাসীনমব্রবীচ্ছোক কর্ষিতা ॥
সুতা দ্রুপদরাজস্য স্বসিতায়ত মূর্দ্ধজা।
সম্পূজ্য সহদেবঞ্চ সাত্যকিঞ্চ মহারথম্ ॥
ভীমসেনঞ্চ সংশান্তং দৃষ্ট্বা পরমদুর্ম্মনাঃ।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা বাক্য মুবাচেদং যশস্বিনী ॥

* * * * * *

কা নু সীমন্তিনী মাদৃক্ পৃথিব্যামস্তি কেশব ॥
সুতা দ্রুপদরাজস্য বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী তব কৃষ্ণ প্রিয়া সখী ॥
আজমীঢ়কুলং প্রাপ্তা স্নুষা পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
মহিষী পাণ্ডুপুত্রাণাং পঞ্চেন্দ্রসমবর্চ্চসাম্ ॥
সাহং কেশগ্রহং প্রাপ্তা পরিক্লিষ্টা সভাং গতা।
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং ত্বয়ি জীবতি কেশব ॥
জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু পাঞ্চালেম্বথ বৃষ্ণিষু।
দাসীভূতাস্মি পাপানাং সভামধ্যে ব্যবস্থিতা ॥

* * * * * *

ধিক্ পার্থস্য ধনুষ্মত্তাং ভীমসেনস্য ধিগ্‌বলম্।
যত্র দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যা যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি।
ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু বৈ কোপঃ সর্ব্বঃ কৃষ্ণ বিধীয়তাম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা মৃদুসংহারং বৃজিনাগ্রং সুদর্শনম্।
সুনীলমসিতাপাঙ্গী সর্ব্ব গন্ধা ধিবাসিতম্ ॥

সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগ বর্চ্চসম্।
কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা॥
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা কৃষ্ণা কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ॥
অয়ন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসন করোদ্ধৃতঃ।
স্মর্ত্তব্যঃ সর্ব্বকার্যেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা॥
যদি ভীমার্জ্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধিকামুকৌ।
পিতা মে'যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ॥
পঞ্চ চৈব মহাবীর্য্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন।
অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ॥
দুঃশাসনভুজং শ্যামং সংচ্ছিন্নং পাংশুগুণ্ঠিতম্।
যদ্যহন্তু ন পশ্যামি কা শান্তি হৃদয়স্য মে॥
ত্রয়োদশ হি বর্ষানি প্রতীক্ষন্ত্যা গতানি মে।
নিধায় হৃদয়ে মন্যুং প্রদীপ্তমিব পাবকম্॥
বিদীর্য্যতে মে হৃদয়ং ভীমবাক্‌শল্যপীড়িতম্।
যোহয়মদ্য মহাবাহুর্ধর্ম্মমেবানু পশ্যতি॥
ইত্যুক্ত্বা বাষ্পরুদ্ধেন কণ্ঠেনায়ত লোচনা।
রুরোদ কৃষ্ণা সোৎকম্পং সস্বরং বাষ্পগদ্‌গদম্॥

(মহাভারত; উদ্‌যোগ পর্ব্ব, ৮১।)

'ঘোরকৃষ্ণ আয়ত কেশা, যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যশ্রবণ ও ভীমসেনের প্রশান্তভাব অবলোকনে শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহদেব ও সাত্যকিকে পূজা করত অশ্রুপূর্ণলোচনে কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন,—"হে কেশব। এই ভূমণ্ডল মধ্যে

আমার তুল্য নারী আর কে আছে? আমি দ্রুপদরাজের যজ্ঞবেদীসমুত্থিতা কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, আজমীঢ়কুলসম্ভূত পাণ্ডুরাজের স্নুষা ও পঞ্চইন্দ্রের তুল্য পাণ্ডবগণের মহিষী। সেই আমি, তুমি এবং পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকিতেই পাণ্ডুনন্দনগণের সমক্ষে সভামধ্যে কেশাকর্ষণে পরিক্লিষ্টা হইয়াছি; পাপপরায়ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দাসী হইয়াছি। পার্থের ধনুর্বিদ্যা ও ভীমসেনের বলে ধিক! যে দুর্য্যোধন এখনও জীবিত আছে। হে কৃষ্ণ! যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ কর।”

‘অসিতাপাঙ্গী দ্রূপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া কুটিলাগ্র, সুদর্শন, ঘোরকৃষ্ণ, সর্ব্বগন্ধাধিবাসিত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগ সদৃশ বেণীবন্ধ কেশকলাপ বামহস্তে ধারণ করিয়া গজগমনে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “হে পুণ্ডরীকাক্ষ! যদি শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে দুঃশাসনকরোদ্ধৃত আমার এই কেশকলাপ স্মরণ করিও। হে কৃষ্ণ! যদি ভীমার্জ্জুন দীনের ন্যায় সন্ধিকামী হয়েন, তবে আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, পাংশুগুণ্ঠিত না দেখিলে আমার হৃদয়ে শান্তি কোথায়। আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধকে স্থাপন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আজ ধর্ম্মপথাবলম্বী বৃকোদরের

বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া বাষ্পগদ্‌গদস্বরে, কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।'

ব্যাসের এই মহাকাব্যখণ্ডের কাব্যত্ব সম্বন্ধে কোনও কাব্য-রসিককে সচেতন করতে হবে না। ওর কাব্যের দ্যুতি মধ্যাহ্নের সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ। এখন আলঙ্কারিকদের কাব্য বিশ্লেষণ ওতে প্রয়োগ করে' দেখা যাক্।

আলঙ্কারিকেরা বল্‌বেন, এ কাব্যের আত্মা হচ্ছে কয়েকটি রস। কিন্তু কাব্যটি "নানা রস নিবন্ধ" হলেও কবি একটি রসকেই প্রধান করেছেন। সে রস 'রৌদ্র' রস। রৌদ্ররসের লৌকিক 'ভাব'-উপাদান হচ্ছে 'ক্রোধ'। বাস্তব জীবনে 'ক্রোধ' মনোহারী জিনিষ নয়। কিন্তু মহাকবির প্রতিভার মায়া দ্রৌপদীর ক্রোধকে অপূর্ব্ব রস-মূর্ত্তিতে পরিণত করেছে। রৌদ্ররসের 'বিভাব' হচ্ছে লৌকিক জগতে যাতে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় তার শব্দে সমর্পিত হৃদয়-সংবাদী চিত্র। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও তাদের নিদারুণ অপমানের সেই চিত্র এখানে সামান্য কয়েকটি রেখায় ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। কারণ 'সভাপর্ব্বে' তার অত্যুগ্র, উজ্জ্বল ছবি সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে পূর্ব্ব থেকেই ক্রোধের রৌদ্র রাগে রক্তিম করে' রেখেছে।

কিন্তু রৌদ্র রসই যদি এ কাব্যের একমাত্র রস হ'ত তবে এর কাব্যত্বের শতাংশও অবশিষ্ট থাক্‌ত না। আলঙ্কারিকেরা বল্‌বেন, কয়েকটি 'সঞ্চারী' এর রৌদ্র রসকে আশ্চর্য্য সরসতা ও পরম উৎকর্ষ দিয়েছে। নবরসের দুইটি প্রধান রস, বীর ও করুণ, এবং কয়েকটি

ব্যভিচারী—বিষাদ, গর্ব্ব, দৈন্য,—রৌদ্রের রক্তরাগকে অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে' তুলেছে।

তেজস্বিনী দ্রৌপদীর শোককর্ষিত, অশ্রুলোচন, বিষাদ মূর্ত্তিতে কাব্যের আরম্ভ হ'ল। তার পর দ্রৌপদীর পিতৃকুল, পতিকুলও মিত্র-সৌভাগ্যের যে গর্ব্ব তা শোকের করুণ রসকেই গভীর করেছে। আর শোকের অন্তরে যে ক্রোধ তার রৌদ্রের রক্তিমদ্যুতি করুণ রসের অশ্রুজলে রক্তের রামধনু ছিটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আবার মুহূর্ত্তেই রৌদ্রের উদ্ধত রাগ দীনতার পাণ্ডুচ্ছায় মিলিয়ে গেছে।

মহাভারতকার যে দুটি শ্লোকে দ্রৌপদীর মহাভুজঙ্গের মত দীর্ঘ বেণীর ছবি এঁকেছেন, সেই বেণী যা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয়ের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করবে, আলঙ্কারিকেরা তাকেই বলেন কাব্যের 'বিভাব'। এ কাব্যের সমস্ত রসের অবলম্বন হচ্ছে দ্রৌপদী। সুতরাং সেই সব রসের অনুগত দ্রৌপদীর, ও তার চেষ্টার ছবি,

"কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা।
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী।"

এ কাব্যের 'বিভাব'। বলা বাহুল্য এর মত 'বিভাব' মহাকবিতেই সম্ভব। অন্য কবির হয় এ ছবি কল্পনায় আস্‌ত না, না হয় বেণীর বর্ণনায় শ্লোকের পর শ্লোক চল্‌তো।

এর পর দ্রৌপদীর বাক্য করুণ ও রৌদ্রের এক অপরূপ মিশ্রণ দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ, যদি কখনও সন্ধির কথা মনে হয়, দুঃশাসনকরোদ্ধৃত আমার এই বেণীর কথা মনে কোরো।' এবং এই মিশ্র রস বীর-পিতা, বীর-ভ্রাতা ও বীর-পুত্র ক্ষত্রিয় নারীর বীর রসের তাপে তপ্ত হ'য়ে, রৌদ্রের বহ্নিরাগে দপ্‌ করে জ্বলে' উঠেছে।

এবং অভিমান ও শোকের অশ্রুজলে কাব্য শেষ হ'লেও, সে করুণ রস মুখ্য রৌদ্ররসকে নির্ব্বাপিত না করে', তাকে পরিপুষ্ট ও স্থায়ী করেছে। যে শোকের ছবিতে কাব্য সমাপ্ত, সে ছবি কয়েকটি 'অনুভাব' দিকে আঁকা। লৌকিক শোক যা দিয়ে বাইরে প্রকাশ হয়, ও ছবি তারই কাব্যে সমর্পিত রস মূর্ত্তি।

এ কাব্যের রসের বিবরণ এখনও শেষ হয় নি। কারণ এর রৌদ্র, বীর, করুণ, সমস্ত রসের অন্তরালে আর একটি রসের মূর্ত্তি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এ কাব্যের ক্রোধ, বীরত্ব, শোক—সকলই যে তেজস্বিনী, সুন্দরী নারীর ক্রোধ, বীর্য্য ও শোক, কবি এ কথা বিস্মৃত হতে' দেন নি। সমস্ত কাব্যের মধ্যেই সে স্মৃতির উদ্বোধ ছড়িয়ে রেখেছেন। মধুর বা শৃঙ্গার রসের 'বিভাব' সুন্দরী নারীর সংস্পর্শ এর রৌদ্র, বীর, করুণ—সমস্ত রসের উপরেই একটা মাধুর্য্যের রশ্মিপাত করেছে।

এ কাব্যে রৌদ্র ও বীর-রস পাশাপাশি রয়েছে। একটু অবান্তর হ'লেও এদের প্রভেদটা একটু স্পষ্ট করা বোধ হয় নিরর্থক নয়। রৌদ্র রসের 'ভাবের' উপাদান হ'ল 'ক্রোধ', কিন্তু বীর রসের 'ভাবের' উপাদান হচ্ছে 'উৎসাহ'। যাত্রার বীররস যে হাস্যাস্পদ তার কারণ যাত্রাওয়ালা রৌদ্র রসকে বীররস বলে' ভুল করে। তার মনে ধারণা যে বীর রসের উপাদান 'ক্রোধ'। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে"—আলঙ্কারিকদের মতে বীর রসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।"—কবি বীর রসের কবিতা মনে করে'

লিখ্‌লেও, আলঙ্কারিকেরা ওকে কখনই বীর রস বল্‌তে রাজী হ'তেন না। কারণ ওটি 'উৎসাহের' রস-মূর্ত্তি নয়।

আলঙ্কারিকদের এই কাব্য-বিশ্লেষণ যে আধুনিক constructive criticism, 'গঠন মূলক' সমালোচনায় অভ্যস্থ পাঠকের মনে ধরবে না, তা' বেশ জানি। কিন্তু আলঙ্কারিকেরা কাব্য নিয়ে কবিত্ব করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ওর অর্থ ও সার্থকতা তাঁরা বুঝতেন না। কাব্যের গাঢ় রাগকে সমালোচনার ফিঁকে রঙ্গে এঁকে কার কি হিত হয় তা তাঁদের বুদ্ধির অতীত ছিল। অধিকাংশ constructive criticism যে হয় কাব্যের রসকে, রস-হীন বাক্যের জল মিশিয়ে, পাতলা করে' পাঠকদের সাম্‌নে ধরা; না হয়, কাব্যের 'ইমোশনকে' সমালোচনার sentimentalism-এর একটা উপলক্ষ করা—এ কথা "আধুনিকতার" ঠুলি, যা আজ বাদে কালই পুরাতন বলে' গণ্য হবে, তা একটু খুলে ফেল্‌লেই হৃদয়ঙ্গম হবে। আলঙ্কারিকেরা বুঝেছিলেন কাব্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বুদ্ধির ব্যাপার। কাব্যের রস, দরকার হ'লে পাত্‌লা করে', পাঠককে গিলেয়ে দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। কারণ ও কাজে কেউ কখনও সফলকাম হতে পার্‌বে না। আলঙ্কারিকেরা জান্‌তেন কাব্যের রস-আস্বাদন লোকে কাব্য পড়েই করবে। সমালোচকের 'কবিত্ব' পড়ে কাব্যের রসাস্বাদনের আধুনিক তত্ত্ব তাঁদের জানা ছিল না।

এই দীর্ঘ প্রস্তাবের এখানেই 'ইতি' করা যাক্। 'রসের' সঙ্গে কাব্যের আর সব উপাদান—তার বাচ্য-বাচক, তার ছন্দ ও অলঙ্কার—এদের সম্বন্ধ কি তা এখানেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু পাঠকের ধৈর্য্যের উপর আর জবরদস্তী করা অসম্ভব। আর একটি প্রস্তাবে

এর আলোচনা করা যাবে। Truth বা সত্যের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ কি তা এই বিচারেরই অন্তর্গত। এবং আলঙ্কারিকেরা সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধের কি মত পোষণ করতেন তৃতীয় প্রস্তাবে তারও পরিচয় দেবো।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

সাধুমা'র কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু মা'র অপর চিন্তার হাত থেকে নিস্তার ছিল না। তাঁর হয় একটি মেয়ে কি একটি ছেলে লিবার জ্বরে ভুগছে, নয় মারা গেছে,— এ সব একটা কিছু ঘটনা আছেই। নয়ত আমার পিতা, দিদিমা কর্ত্তামণির সঙ্গে কিছু বাদবিসম্বাদ করছেন। তার দরুণ মা'র সর্ব্বদা শঙ্কিতচিত্ত হয়ে থাকতে হত। আমার পিতা যে কিছু মন্দ লোক ছিলেন তা নয়, তবে তাঁর একটা দোষ ছিল, তিনি মাঝে মাঝে নেশার বশীভূত হয়ে কলহ গোলমাল করতেন। তাঁর সংসারে মন বস্‌ত না, কেননা তিনি বেশ বুঝতে পারতেন যে, এ সংসার কেবল পাঁচ জনের লুটের বাজার। যদি এ কথা বুঝিয়ে বল্‌তে যেতেন, কোন ফল হত না; দিদিমা ধমক দিতেন। কিন্তু বাবা বেশ বুঝতে পারতেন যে, তাঁর সন্তানগুলির ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। বাবাকে আমার কর্ত্তামণি খুব আদরযত্ন করতেন ও বাবুয়ানায় লালন পালন্ করেন। ছোটবেলায় বাড়িতে মেম রেখে ইংরাজি শেখান। সাহেবের ইস্কুলে পড়ান। শুনেছি যে বাবা যদি অন্য ঘরে দাঁড়িয়ে ইংরাজি বল্‌তেন, লোকে বল্‌ত এ ইংরাজে কথা কইছে। পরিষ্কার উচ্চারণ ছিল। আর তাঁর মন খুব খোলা, ও পরোপকারে রত ছিল। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে' বল্‌তেন যে, আমায় একটা বাবু করে' মানুষ করেছেন, একটু কষ্ট সইবার ক্ষমতা নেই; মখ্‌মল জরি মুড়ে, ক্ষীর সর ছানা খাইয়ে, আর আদর দিয়ে দিয়ে একটি

কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার বানিয়েছেন; আর আমার ছেলে মেয়েগুলিকেও সেইমত করেছেন; কিন্তু এ সকল বাবুয়ানা কিসে চিরকাল চল্‌বে, বিষয় বে-বন্দোবস্ত, প্রচুর ব্যয়, আর তেমনি দেনা; আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। এই সকল নানা কারণে বাবার মন বড় খারাপ হত; হলেই তিনি চিন্তারাক্ষসীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ঐ সুরাদেবীর আশ্রয় নিতেন। তিনি প্রায় নানা দেশভ্রমণেই জীবনাতিবাহিত করেছিলেন। শেষ তাঁর মৃত্যু হয় প্রয়াগধামে, ২৪ ঘণ্টার ভিতর, কলেরায়। আমার বাবা বাড়ীতে এলে বড় খুসি হতুম, কিন্তু যেদিন নেশা করতেন, আমি সেদিন বড় ভয় পেতুম। আমি দিদিমার কাছে আর ওবাড়ীতেই বেশী সময় অতিবাহিত করতুম। খেলা, আমোদআহ্লাদ—এইটী হলেই বড় আনন্দে থাকি। বাবা বৃন্দাবনে গিয়ে বনযাত্রা করেছিলেন, পরে অতি সুন্দর একখানি সচিত্র গোলকধাম এঁকেছিলেন। প্রথম আঁকেন সংসার-আশ্রম—তাতে চিত্রিত ছিল পুত্রকন্যা, স্ত্রী, পিতামাতা, দাসদাসী, গৃহপালিত পশুপক্ষীবেষ্টিত একটী ভবন। আবার তিন নং চিত্র বিশ্রাম-ঘাট—সেটী আমাদের নিজ বাড়ী; আর দশ নং ছিল নরককুণ্ড, একটী কঙ্কালবেষ্টিত কুপ। উচ্চস্থানে ছিল সুরলোক, তাতে ইন্দ্ররাজার যে প্রতিমূর্ত্তি, সেটী অঙ্কিত করেছিলেন তাঁর পিতার। তিনি বড় আদুরে ছেলে ছিলেন, তাঁকে কর্ত্তামণি বাবু বলে ডাকতেন, আর তিনি বাবা বলতেন। আমার পিতার চেহারা ঠিক ইংরাজদের মতই ছিল। আর তাঁর স্বভাব ছিল—এ না হলে চলে না, এটী না হলে আহার করা যাবে না, তা নয়; যেদিন যা হোক্ চুলে যেত। আর

খুব নকল করতে পারতেন। সব জাতীয় কথা কইতে পারতেন—বেহারা, বামুন, রজক, জলের ভারী, পরামাণিক, এদের সকলকার সঙ্গেই নকল আনন্দ করতেন।

আমি পূর্ব্বেই লিখেছি আমার নীচে দুটী ভগ্নী ছিল, তারা দুজনেই পীড়িত ছিল; তাদের বিস্তর চিকিৎসা হয়, কিন্তু পরমায়ু ছিল না। একটীর মৃত্যু হয় ৪ বৎসর বয়সে; তখন মা আমার পূর্ণগর্ভা ছিলেন। সেইদিন রাত ২টার সময় একটী পুত্রসন্তান হয়েছিল; তার পরদিন আর একটী কন্যা মারা যায়, তার বয়স ছ'বৎসর। এই রকম মা বিস্তর শোক পেয়েছিলেন।

আমার বিবাহের সম্বন্ধ হবার মধ্যে নানা কথা এসে পড়েছে। দুর্গাপূজা হয়ে গেল, পরে পূর্ব্বদর্শিত দেবতার মত লোকটী, যিনি ইডেন পার্কে দর্শন দিয়েছিলেন, তিনি পূজার পর দ্বাদশীর দিন পুনরায় আমাদের বাড়ীতে দর্শন দেন। দিদিমার কাছে এসে, প্রণাম করে' বসে, মিষ্টি মিষ্টি করে' কত কথা কইতে লাগলেন। আমিও দিদিমার কাছে বসেছিলুম। ক্রমে ক্রমে বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। দিদিমা আমায় বল্লেন—যাও দাদা, খেলা করগে। আমি চলে গেলুম, একেবারে পাশের বাড়ী। পরে বাড়ী এসে সকলেরি মুখে শুনতে লাগলুম যে, আমার বেশ ভাল জায়গায় বিয়ে হবার সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। যিনি এসেছিলেন, তিনি আমার শ্বশুর, খুব অমায়িক লোক। আর তিনি এটর্নি, তাঁর একটী ছেলে; ছেলেটীও নাকি খুব সুন্দর, ও ভালমানুষ। ঝিয়েরা সব আমায় খুব ক্ষেপায়,—এইবার আর গাড়ী চড়ে' বিবি হয়ে বেড়াতে পাবে না, ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে বসে থাকতে হবে।

আমিও শুনে শুনে যেন কিছু একটু বদ্‌লে গেলুম, একবার একবার একটু একটু চিন্তা করতে লাগলুম, মনে হতে লাগ্‌ল মা ও মেজমা যেমন বউ, সেইরকম আমিও বউ হব ত? আর বেড়াতে যেতে পারব না, ঠাকুরবাড়ী গিয়ে কীর্ত্তন শোনা হবে না। হোলির সময় দেউড়িতে বড় গামলায় আবীর গুলে একবার ঠাকুরবাড়ীতে, একবার রাস্তায়, একবার ও-বাড়ীর দিদিদের সঙ্গে আবীরখেলা আর হবে না। কিন্তু কি জানি আমার দেহটা পরমেশ্বর কি উপাদানে গঠিত করেছেন, চিন্তা আমায় বেশীক্ষণ চিন্তিত করতে সক্ষম হয় না, তখনি মন জোর করে নূতন আনন্দ এনে চিত্ত প্রফুল্ল করে। আমি অমনি একটা স্থির করে' গঠন করে নিলুম। বেশ ত ভালই, বরের বাড়ী যাব, কত গহনা পরব, ভাল ভাল জরির কাপড় পরব, আবার নতুন বাড়ী দেখব; শুনছি বাগান পুকুর আছে, ফুল তুল্‌ব, পুকুরে স্নান করব, বেশ কত মজা হবে। আমরা ত কাউকে শ্বশুরবাড়ী যেতে দেখিনি, ওবিষয় যে কি দুঃখ তা জানিনে। আমার যেমন খেলাধুলা, খাওয়াপরা চল্‌ছিল, সেই মতই চলেছে। নূতন ঘটনার মধ্যে একবার আমি, দাদা, খাজাঞ্চিদাদা আর কর্ত্তামণি, বামুন, চাকর, বেহারা নিয়ে, বজরায় ক'রে ফরাসডাঙ্গায় হীরালাল শীলের গঙ্গার উপর যে বাগান ছিল, তাতে গিয়ে মাসখানেক থাকি। আমার খুব আমোদ, বেলা ৭টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত জলের উপর থাকতুম। বাগানে নেমে স্নান আহারটা সেরে নিয়ে, আবার ওঠা হত। তার-পর রাত্রি ৮টার পরে নেমে বৈঠকখানায় শোওয়া হত। কর্ত্তামণির বায়ুর প্রকোপ হওয়াতে, সাহেব ডাক্তার ব্যবস্থা দেয় কিছুদিন জলে জলে বেড়ালে উপকার হবে। তবে কর্ত্তামণি বড়ই ভীতু

ছিলেন, তাঁর রাত্রে বোটে থাকতে সাহস হত না, সেইজন্য ঐ বাগানে নেমে থাকা হত। আর রান্না, ভাঁড়ার, লোকজনের থাকা, সবই বাগানেই ছিল। এক মাস থেকে কর্ত্তামণির একটু সুস্থ ভাব হয়, কিন্তু তাঁর আর ভাল লাগল না। দাদার পড়া কামাই, আমিও যাহোক টটা টিটি করি; তাও বন্ধ; এইসব নানা কথার আলোচনা করে, কর্ত্তামণি বল্লেন আর নয়, বাড়ী চল; পরদিনই আমরা বাড়ীর দিকে আসতে লাগলুম, দু'রাত বুঝি বজরায় ঘুমতে হয়, ভাঁটার টানে টানে ভবে তিন দিনে কলকাতায় পৌঁছলুম। তার দিনকয়েক বাদে একদিন সন্ধ্যাকালে, একটী আধবুড়ো লোক এল, তার কালো রং, নাকটী খুব মোটা, খাঁদা, আর ঠোঁট দুটীও খুব মোটা, মাথায় আধপাকা আধকাঁচা চুল, সেগুলি সব খোঁচা খোঁচা হয়ে ঊর্দ্ধমুখে আছে; চক্ষু দুটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তাও আবার কোটরে প্রবিষ্ট; আর তায় সাজ একখানি সরু লালপাড় ধুতি, আর গলায় একখানা কোঁচানো চাদর, পরে মনে পড়ে গেল গলায় দু'কণ্ঠী মালা, হাতে একটী ছাতা। তখন আমি বেড়িয়ে এসে প্রায় দিদিমার কাছেই সন্ধ্যার সময় শুয়ে থাকতুম; দিদিমা মহাভারত রামায়ণ পড়তেন, আবার কোনদিন পদ্মপুরাণ, কি যোগবাশিষ্ট রামায়ণ পড়তেন। আমার শুনতে খুব ভাল লাগত। আবার কোন দিন আমায় আস্তে আস্তে ভাল উপদেশ দিতেন,—এমনি করে' শ্বশুর বাড়ী যেয়ে ননদকে ভক্তি করবে, ননদের আর কেউ নেই, তিনি শ্বশুরবাড়ী থেকে এলে প্রণাম করবে; তোমার সব জায়েরা আছেন, তাঁদের কথা শুনবে, তাঁদের সব ছেলেমেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে ভাব করে খেলা করবে, যেন কখনও কাউকে মারামারি কোরনা। যদিও দিদিমা জানতেন যে, আমি কখনও কারও ছেলে

মেয়েকে মারিনি, তবু আমায় ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা দিতেন। সেই যে অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তিটীকে বসিয়ে রেখেছি, এখন তার কথা হোক্। সে বুড়ো বল্‌ছে—আজ্ঞা মা, বড় মা পাঠালেন, তাঁর ছোট ছেলের বউটী ও-মাসে মারা গেছেন, একটী ১ বছরের মেয়ে রেখে গেছেন। তাই মা তাঁর বিবাহের জন্যে একটী মেয়ে খুঁজছেন,—যদি আপনার পৌত্রীটীর সঙ্গে দেন, তাহলে এই শ্রাবণ মাসে বিবাহ হয়ে যায়। দিদিমা একটু ইতস্ততঃ করে বল্লেন যে, তোমাদের ছোট বাবুর ছেলেটী কেমন, তাঁর বিবাহ কবে হবে? দিদিমা একটু আশ্চর্য্য হয়েছেন, কেননা ছোট বাবু ছেলের সঙ্গে স্থির করে গেছেন, সে ছেলেকেও ঐ গিন্নিই মানুষ করেছেন; আবার নিজের ছেলের জন্যে বলে পাঠালেন,—এর ভাবটী কি বুঝতে হবে। তখন ঐ লোকটী বলছে যে, ঐ বড়মার ভাইঝি আছেন দুটী, তার বড়টী খুব সুন্দরী, তার সঙ্গে সে বাবুর বিয়ে দিতে মা'র খুব ইচ্ছা, তবে এখনও কিছু ঠিক নেই। তখন দিদিমা একটু ভাব পেলেন, বল্লেন আচ্ছা, তুমি কাল একবার এস, ও মেয়ে এখন ছোট, এই আট বৎসরে চলছে, আর ওর মা বাপকে বলি, আমি এখনি কি বল্‌ব। পরে বুড়ো আর একটী প্রণাম করে চলে গেল। দিদিমা সব কাণ্ড শুনে আর থাকতে পারলেন না, মাকে ডেকে বল্লেন—আবার বিয়ে টলমল, এখন কোন আশা নেই।

এইরকম কথাবার্ত্তা হয়ে প্রায় এক মাস কেটে গেল। আর এখন কোন ঘটনা নেই। আমার বোনগুলি যে মারা যায় তা' আগেই লিখেছি। এখন একটী খোকা ছিল, আমি আর দাদা। আমি দাদার সঙ্গে একদিন একদিন লুকিয়ে স্কুলের গাড়ীতে উঠে বসে থাকতুম, কেউ জানতে পারত না, পরে খোঁজ নিয়ে শুনতেন। আমার দাদা

তখন পড়তেন নর্ম্মাল স্কুলে, আমি একটু স্কুলে বেড়িয়ে চলে আসতুম। সেইবার পোষ মাসে সপ্তম এডওয়ার্ড আসেন, কলকাতায় খুব ধুম পড়ে' যায়, আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়; তবে এখনকার মত বৈদ্যুতিক আলো তখন আবিষ্কার হয় নি, ল্যাম্পে রং গুলে গুলে বাহারি করে সাজানো হয়েছিল, আর গ্যাস্। তবে বাজি নানাপ্রকার হয়েছিল। জগদানন্দের বাড়ী বরণ হয়েছিলেন, আমরা জাহাজ দেখতেও গিয়েছিলুম। জাহাজের নীচের গহ্বরে খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গরু ছিল, তাদের দুধ বাদ্সা খেতেন; তাদের গায়ের রং সাদা ধব্ধবে, তার ভিতর থেকে গোলাপী আভা বেরচ্ছে। তারপর দোতলায় খানার তদ্বির হচ্ছে, তেতলায় সব আফিস ঘর, পল্টনরা পাহারা দিচ্ছে, আর যুবরাজ চৌতলায় থাকেন। এক এক করে' সব ঘরগুলি দেখলুম, বড় চমৎকার; আয়নার দরজা আর রকম রকম মখ্মল-মোড়া কৌচ সোফা ছিল, বড় বড় আয়না টাঙ্গানো। এক ঘরে প্রকাণ্ড স্নানের টব, আল্না, আয়না, টয়েল করবার সব জিনিস; আর একটি ঘর লাইব্রেরি, তা'তে সব সোনালীমোড়া বাঁধানো বই আর টেবিলচেয়ার সাজানো ছিল; আবার তাস খেলবার একটা টেবিল ছিল, তার চারদিকে চেয়ার দেওয়া। শোবার ঘরটা অন্য ধরণের সাজানো, খাট মশারী আয়না ফুলদান, মোটা কারপেট মোড়া ছিল। আমার কর্ত্তামণি আমায় কিছু দেখাতে কি খাওয়াতে পরাতে বাকি রাখেন নি, যখন কলকতায় যা নতুন হবে, সারকাস্, ইংরাজি থিয়েটার, ফেন্সি-ফেয়ার—সব দেখাতেন; মিউজিয়মে প্রায় যেতুম, জুলজিকেলে মাসে একদিন যাওয়া হত; আমার বেড়াবার আমোদটা বড় ছিল।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে।

(সিংহল হতে নেপাল)

৩।

কবির আশপাশের জীবনযাত্রা।

[মাদাম লেভির ফরাসী হইতে পূর্ব্বানুবৃত্তি]

২২ নবেম্বর—আজ সকালে বেলা ৭টায়, কর্ত্তার জন্য দর্জ্জি হাজির। এই দর্জ্জিটির বেশ-বিন্যাস নেহাৎ মন্দ নয় বলতে হবে, যেহেতু তার পরণে পাজামাও নেই, জুতাও নেই; কিন্তু একটা ময়লাটে গামছাগোছ কাপড় বেশ জাঁকালোরকমে গায়ে জড়ানো রয়েছে। মুখটি কাঁলো, চোখ দুটি জ্বল্‌জ্বলে। সে গায়ের মাপজোখ এমনভাবে নিলে, যেন নিউটন তাঁর গণনা করছেন। * * * * * * * *

তারপর ক্ষি—বাবুর আগমন; ইনি আমাদের বিশেষ জগতের শক্তিমান পুরুষদের মধ্যে একজন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে গ্রাম্য সঙ্গীত, কিম্বদন্তি প্রভৃতি মস্ত এক লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন। জাতিতে বৈদ্য হওয়ার দরুণ চিকিৎসাবিদ্যা তাঁর জানা আছে এবং তাই নিয়েই গুছিয়ে বসেছিলেন, এমন সময় ঠাকুরমশায় তাঁকে আসতে লেখেন। তিনি উত্তরে লিখলেন: আপনার কাছে যাবার উপযুক্ত উঁচুদরের মানুষ আমি নই; প্রত্যুত্তরে আবার কবি লিখলেন "আমি নীচুদরের মানুষই চাই।" ফলে ক্ষি—বাবু পরাস্ত হয়ে আশ্রমে বাস করতে এলেন।

ঠাকুরমশায়ের আকর্ষণী শক্তি, তাঁর লোককে লওয়াবার ও চুম্বকবৎ টানবার ক্ষমতা বাস্তবিক অদ্ভুত। এই যে নিভৃত মনোরম বিদ্যাপীঠ, কতকটা আমাদের Port Royal-*এর মত, অথচ তার চেয়ে হাস্যোজ্জ্বল, কোমল, আনন্দময়,—এখানে বাসকালীন আমার কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ বন্ধুর কথা মনে পড়ে, যাঁরা থাকলে এই সরল অনাড়ম্বর জীবনের মর্য্যাদা বুঝতে পারতেন; যে-সব বাইরের ঠাট বজায় রাখবার উদ্বেগে আমরা কাতর, যে-সব প্রয়োজনের বোঝায় আমরা এমন ভারাক্রান্ত, প্রতিবেশীর নকল করা ও সমকক্ষ হবার যে আকাঙ্ক্ষা বা আবশ্যকতা আমরা অনুভব করি—তার থেকে মুক্ত এই জীবন; এই শান্তি তাঁদের কাছে কত না উপভোগ্য হত, তাই ভাবি।

এই বুধবার ২৩শে, ৭টার সময়, মন্দিরে উপাসনা; মন্দিরটি কাঁচ ও লোহা দিয়ে তৈরি একটি অতি কদাকার ইমারৎ; শুনতে পাই তার জন্যে নাকি কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় দায়ী। অনুষ্ঠানের মধ্যে জটিলতা কিছুই নেই; মন্দিরের ভিতরে ইস্কুলসুদ্ধ লোক,—শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ছাত্র,—সকলেই কবিকে ঘিরে বসে; বাইরে সিঁড়ির উপর স্ত্রীলোক ও ছোট মেয়েরা থাকে। উপনিষদের শ্লোকপাঠ ও বাঙ্গলায় তার ব্যাখ্যা পড়া হয়; পৌনে ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়।

পরদিন সকালে উঠে আমার শরীরটা কিছু খারাপ বোধ হল। বারান্দায় একটা লম্বা চৌকিতে আস্তানা গাড়লুম; পশ্চিমখোলা বলে' এখানে সারা সকালটি সুন্দর ঠাণ্ডা থাকে; দুপুর পর্য্যন্ত সেই

* বিখ্যাত ফরাসী খৃষ্টধর্ম্মসম্প্রদায়।

খানে কাটালুম, ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করলুম, পড়লুম, লিখলুম। কিন্তু যতই সূর্য্যের তেজে আকাশের আলো বাড়তে লাগল, আমারও তত বেশি অসুখ করতে লাগল ; এই আলোটাই আমার অস্বস্তির কারণ, সে বিষয় সন্দেহ নেই ; অথচ সকালে কেমন সাদা, নরম ও পরিষ্কার থাকে। শেষে কি এর সৌন্দর্য্যের মায়া কাটাতে হবে ? সেই কুৎসিৎ কালো চষমাগুলি ভিন্ন কি গতি নেই ? * * * সন্ধ্যাবেলা সেই ভিক্ষু (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) তাঁর বাচ্ছা ভিক্ষু এবং একটি সিংহলী যুবককে সঙ্গে করে' আমার খোঁজ নিতে এলেন ; তাঁরা ভদ্রোচিতভাবে জানতে চাইলেন আমি কোন ওষুধ খেয়েছি কি না ? আমি ওষুধপত্র সম্বন্ধে আমার অনাস্থা প্রকাশ করলুম। তারপর তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, প্রার্থনায় কি উপকার হওয়া সম্ভব নয় ?—আমি বল্লুম নিশ্চয়ই, কেন হবে না। তখন তাঁরা আমার সূতোর রীল থেকে লম্বা এক খেঁই সূতো টেনে বের করে' নিয়ে দড়ি পাকালেন, ভিক্ষুটি তার একদিক ধরলেন, আমি আর এক দিক ধরলুম, বাচ্ছা ভিক্ষু মাঝ-খানটা ধরলে (বোধহয় যাতে আমাকে না ছুঁয়েও যোগাযোগ স্থাপন হয়)—তারপর তাঁদের ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে সুদীর্ঘ বৌদ্ধ উপাসনামন্ত্র ধ্বনিত হতে লাগ্‌ল। প্রার্থনা শেষ হলে আমি স্বীকার করলুম যে, এরই মধ্যে আমার অনেকটা ভাল বোধ হচ্ছে। তাঁরা সূতোটা গুটিয়ে নিয়ে আমাকে বল্লেন রাত্রে বালিশের তলায় রেখে দিতে, তারপর কাল সকালে তাঁরা এসে আবার আরম্ভ করবেন। কিন্তু যখন তাঁরা এলেন, তখন আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে' আমার ভৌগলিকের সঙ্গে পড়াশুনা করছি। ওঁরা সম্প্রতি যে বৌদ্ধ-সম্মিলনীতে যোগ

দেবার জন্য কলকাতায় যাচ্ছেন, তা'তে এই সুন্দর গল্পটি বেশ বল্‌তে পারবেন।

* * * * * * * *

এখানকার ইস্কুলটি সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে অভিনব প্রতিষ্ঠান। কবি যখন অবসর গ্রহণ করে' তাঁর পিতার কাছে শান্তিনিকেতনে নির্জ্জনবাস করতে এলেন, তখন গুটিকতক ছেলেকে তাঁর মত এবং ইচ্ছানুযায়ী গড়ে' তোল্‌বার সঙ্কল্প করলেন। প্রথমে অল্প কয়েকজন এল। ধর্ম্ম এবং সামাজিক আচারব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদারতা অবলম্বন করাই ছিল প্রথম ও মূল নিয়ম। প্রথম প্রথম কোন কোন ছেলে নিম্নতর জাতের সঙ্গে একত্রে বসে' খেতে একটু অপ্রবৃত্তি বোধ করত; তাদের নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে চল্‌বার স্বাধীনতা দেওয়া হত। ক্রমশঃ হিন্দুর প্রাণে একান্ত গভীরভাবে বদ্ধমূল এই কুসংস্কার একটু শিথিল হল, এবং এখন অধিকাংশ ছেলেই ভ্রাতৃভাবে একত্রে বসবাস করে। কেবলমাত্র জনকতক গুজরাটী ও মারহাট্টী বেশী গোঁড়া ছেলে এখনো আলাদা খায়। * * * ছেলেরা খুব ছোট, ১২ বৎসর বয়েসের কম না হলে নেওয়া হয় না। এখানকার শিক্ষাসোপান তাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়; এবং এখন থেকে আশ্রমে অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত হতে পারবে, কারণ বিশ্বভারতী বা আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভোর ৫টায় ঘণ্টা বাজিয়ে ছোটবড় সকলকে ঘুম থেকে তোলা হয়। তারপর গান, উপাসনা, ধ্যানধারণা; গান দিয়েই আবার দিন শেষ হয়। খাওয়াদাওয়ার নিরামিষের ব্যবস্থা কড়াকড়; শোবার ঘর

ছেলেরা নিজেই সাফ করে। তাদের বিছানা?—এক তক্তা-পোষের উপর একটা কাপড় ঢাকা; ঘরকন্নার কাজে বিশেষ সময় লাগে না। তারা কিছুদিনের জন্যে এক একজনকে নেতা বা কাপ্তেন পদে বরণ করে, সে নিজের দলের তত্ত্বাবধান করে; দেখে শুনে ত মনে হয় বেশ নিখিঁকিচে সংসারযাত্রা চলে' যাচ্ছে।

২৬ নবেম্বর।—সকালেই কবির আগমন, তিনি শিষ্টতাপূর্ব্বক আমার খবর নিতে এসেছেন। দীর্ঘ কথোপকথন, আমি সানন্দে শুনতে লাগলুম। তিনি শ্রান্ত, তিনি সহরের হাঙ্গাম ও হুজ্জৎ এড়াবার জন্যে এখানে বাস করতে এলেন, আর তাঁর চারপাশে এখানেই এক সহর গড়ে' উঠছে। যেন এমন প্রাণপ্রতিষ্ঠাতার চতুর্দ্দিকে দূরতম বিজনতাও লোকালয়-হয়ে উঠতে বাধ্য নয়। কৃষি বিদ্যালয় গড়ে' তোলবার উদ্যোগ হচ্ছে, তাঁর সুরুলের জমিতে তার পত্তন করেছেন। সেটি আশ্রমের অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড বড় বাড়ী, তার বাগান এত মস্ত যে এখান থেকে মনে হয় যেন একটি ছোট বনবিশেষ। ভারতের জাতীয় কবি তাঁর দেশের তরুণদের রাজোচিত দানখয়রাৎ করছেন।

২৭ নবেম্বর।—বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্বন্ধে সি—এর বক্তৃতা। কলকাতা থেকে জন কুড়িক শ্রোতা এসেছিল, তার মধ্যে তিনজন বক্তৃতার পর আমাদের এখানে এসে অনেকক্ষণ রইল। প্রথমে লেখাপড়া পরীক্ষাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হবে পরে রাজনীতির কথা উঠ্‌ল,—যে রাজনীতিতে এদের সমস্ত জীবন এমন ওতঃপ্রোত, এবং লেখাপড়ার চর্চ্চা এমন ক্ষতিগ্রস্ত। তারা চলে' যেতে না যেতে অপর একটি যুবক এল, যার ভাইকে আমরা প্যারিসে চিনতুম। সেই একই প্রসঙ্গ প্রায় একই

ভাষায় উত্থাপিত হল। এই বৃহৎ দেশের মানসিক তিক্ততা, আর এই দুই বৃহৎ জাতির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভরা বিরুদ্ধতা দেখলে খারাপ লাগে। দিনশেষে আমরা শুতে যাব মনে করছি, এমন সময় জোসেফ তার হিসেব নিয়ে এল। আসছে হপ্তায় অবশ্য সে আমাদের সঙ্গে কলকাতায়, ও পরে নেপালে যাবে,—কিন্তু "সাহেব মেমসাহেবের কাশ্মীর যাওয়া উচিত নয়, সেখানে গোলমাল হবার সম্ভাবনা।" পরে এক রাজনৈতিক ব্যাখ্যান স্বরু হল,—এবারত ওর পালা,—তা'তে জর্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ানরা (কখনো কখনো তাদের বলছিল অষ্ট্রেলিয়ন) বোলশেভিকদের সঙ্গে মিলেমিশে একটা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের খেলা খেলতে লাগল। "আর আফ্‌গানিস্থান—এই কাবুলীরা কাশ্মীরীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে, তারাই কাশ্মীর নিয়ে নেবে! সত্যি, বাজারে অনেক জিনিষ শোনা যায়, যা' সাহেবরা জানেন না।" সেকন্দর শা এখনো জীবিত, অথচ এরই মধ্যে তাঁর রাজ্যভাগ হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন সন্ধ্যায়, খাবার আগে, কলাভবনে সম্মিলন। আমরা যখন এলুম, সবাই সেখানে জড় হয়েছে ও আসনপিঁড়ি হয়ে বসে' আছে—সেই স্তব্ধ নিশ্চল ভাবে যা' প্রাচ্যদেশের বিশেষত্ব, যদিও এ দেশের লোক চেঁচাতে ও হাত পা নাড়তে বিলক্ষণ পারে। একটি যুবক বক্তৃতা করলে, এ ভবনের সে একাধারে শিক্ষক ও ছাত্র, এবং তার উপরেই এঁদের আশাভরসা; তার বয়স বছর আঠারো, মুখ চোখ বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। সে হচ্ছে শ্রীযুক্ত প—সাহেব বলে' একজন ফরাসী ভারতবাসীর পোষ্যপুত্র। সে "দক্ষিণ-ভারতীয় হিন্দু আচারব্যবহার" সম্বন্ধে বল্লে। তার বক্তৃতা হয়ে গেলে পর—সব চুপ। ফরাসী

অধ্যাপক বল্লেন যে, এই সাধারণ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গবেষণার ক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ করে' আনলে ভাল হয়; যদি কোন যুবক, নিজের ঠাকুরদাদার আমল থেকে নিজের আমল পর্য্যন্ত তার আপন পরিবারের আচারব্যবহার তার চোখের সামনেই কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে, শুধু সরলভাবে তাই লিপিবদ্ধ করে, তাহলেও মহৎ উপকার সাধন হয়। একজন মারাঠী সেকালের আচারবিচার সম্বন্ধে একালের শৈথিল্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন। ঠাকুরমশায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ অথচ মহান ভাবে আলোচনাকে উচ্চতর স্তরে তুলে ক্রমোবিকাশের আবশ্যকতার কথা বল্লেন, যা' নইলে জীবনের অস্তিত্বই থাকে না।

(ক্রমশঃ)

